রথীন চক্রবর্তী

সম্পাদিত

রাজনৈতিক আন্দোলন, সংস্কৃতি, ও সাংস্কৃতিক ফ্রণ্ট

লোকমত প্রকাশনী : ৪৯ সি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ-১২

পরিবেশনাঃ পুস্তক বিপণি। বেনিয়াটোলা লেন-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৪ এপ্রিল ১৯৬৫
প্রকাশক : সত্য রাহা
লোকমত প্রকাশনী
৪৯ সি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলকাতা-১২

মুদ্রণ : শিবশঙ্কর প্রেস,
৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

রাজনৈতিক আন্দোলন
সংস্কৃতি
ও সাংস্কৃতিক ফ্রণ্ট

এই গ্রন্থের পরিবেশক

পুস্তক বিপণি

২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

রথীন চক্রবর্তীর অন্যান্য বই

.. ..

লাতিন আমেরিকার কবিতা

Swadeshi And Boycott (Ed).

কার্ল মার্ক্সের সাহিত্য সমগ্র

গণ-আন্দোলন ও সংবাদপত্র (স)

রম্যাঁ রলাঁর পিপলস থিয়েটার

ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম

বাংলা নাট্য-আন্দোলন : গণনট্য থেকে গ্রুপ থিয়েটার

সূচীপত্র

ভূমিকা

বিস্তৃততর সমাজ-জীবনের সঙ্গে শিল্প ও সংস্কৃতির সম্পর্ক কি, বা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় শিল্প-সংস্কৃতির ভূমিকা কতখানি, বা আদৌ আছে কি না তা নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘ দিনের, কয়েক শতাব্দীর। কেননা মিল্টন যখন লেখকের স্বাধীনতা এবং শিল্পীর দায়িত্বের প্রশ্নে আদালতে উপস্থিত হন তখন মানবতার অধিকার এবং জনগণের শিল্প—এই কথা দুটি উচ্চারণে তাঁর একবারও ঠোঁট কাঁপে না। অন্যদিকে বার্ণাড শ থেকে শুরু করে প্লেখানভ পর্যন্ত অনেকেই যখন শিল্প ও সমাজ-জীবন, বৃহত্তর অর্থে রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে কোনোরকম অসম্পৃক্ততাই খুঁজে পান না, তখনও কিছু শিল্পীর মধ্যে দ্বিধা থেকে যায়, এমন কি এদেশেও, যে শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতিকে জড়িয়ে ফেলা উচিত নয়। ত্রিশ-চল্লিশের দশক থেকে এই সঙ্কোচ, এই অজ্ঞতাজনিত উদাসীনতা একটু একটু করে কাটতে থাকে, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপেই। শিল্প ও সংস্কৃতির একই সঙ্গে শিল্পগত ও রাজনীতিগত কিছু দায় অবশ্যই থেকে যায়, এই প্রচ্ছন্ন-স্বীকৃতিতে এদেশের বুদ্ধিজীবী মহল ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় জড়িয়ে পড়লেও এবং রাজনৈতিক সচেতনতাকে শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় ও উপযোগী উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করলেও, পঞ্চাশের দশক থেকে ফের বিতর্ক ওঠে অন্য একটি প্রশ্ন নিয়ে এবং তা মূলত বাম মহলেই, যারা রাজনীতি-সচেতন শিল্পচর্চার পক্ষপাতী। তা হলো, রাজনৈতিক সচেতনতা-নির্ভর জনমুখী শিল্প-সংস্কৃতি চর্চাকে কিভাবে গতিশীল, দায়িত্বসম্পন্ন এবং আন্দোলনমুখী করে গড়ে তোলা যাবে? এবং সুসংহত প্রয়াস পরিচালিত হবে কার নেতৃত্বাধীনে? সেটা কি কোনো পার্টি, না-কি কোনো শিল্প সংগঠন? প্রশ্নটা আরও জোরালো হয়ে ওঠে যখন ষাটের দশকে বিভিন্ন কারণে রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার ওঠে এবং সংস্কৃতি মহলও তাতে ঢেউ তোলে। প্রশ্ন ওঠে, রাজনৈতিক আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক

আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্রটা কোথায় বা কি ধরনের।
যদি মনে করে নেওয়া যায় যে একান্ত পরিপূরক না হলেও সাংস্কৃতিক
আন্দোলন সহায়ক হয়ে উঠবে রাজনৈতিক আন্দোলনের, তাহলে
জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, এই সহায়ক সম্পর্কের ভিত্তি কি হবে।
রাজনৈতিক আন্দোলন কি নির্দিষ্ট করে দেবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের
কর্মসূচী? আরও স্পষ্টভাবে, সাংস্কৃতিক ফ্রণ্ট কি শুধুই রাজনৈতিক
শিবিরের নির্দেশে চলবে, না-কি তারও স্বতন্ত্র কোনো অধিকার
থেকে যায়? তাছাড়া, এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়াও অন্যায়
কিছু হবে না যে সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের দায়িত্ব যদি হয় সাংস্কৃতিক
আন্দোলন মারফৎ রাজনৈতিক আন্দোলনকে সাহায্য ও সহায়তা
করা, তাহলে রাজনৈতিক ফ্রণ্টেরও পাল্টা কিছু কর্তব্য থেকে যায়।
কি সেই কর্তব্য, এবং রাজনৈতিক ফ্রণ্ট পরিষ্কারভাবে সেই
কর্তব্যকে স্বীকার করে কি-না। বলা বাহুল্য, এ নিয়ে এখনও
মত, দ্বিমত এবং তর্ক বিতর্ক আছে। অথচ সমস্যাটা
গভীর এবং সমাধানটাও জরুরি। মূলতঃ এই অনুভব থেকেই এই
সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা। প্রথম পর্বে কিছু ধ্রুপদী
নিবন্ধ, দ্বিতীয় পর্বে মূল বিষয়ের ওপর নানা দিক
থেকে আলোচনা। শিল্পের উদ্দেশ্য থেকে শিল্পীর দায় পর্যন্ত।
বিস্তার পাণ্ডুলিপি থেকে দেওয়াল-লিখনে। বিতর্কিত এই
বিষয়টিকে নিয়ে এই বই করার উদ্দেশ্য একটাই। যেহেতু আমার
মনে হয়েছে যে নিছক বিতর্ক হয়তো কোনো সুগন্ধি-বুদ্ধিজীবীর
কাছে বুদ্ধিবিলাস হিসেবে সুগ্রহণীয় হতে পারে, কিন্তু হাজার
হাজার সংস্কৃতি-কর্মীর কাছে তা শুধু সর্বনাশা বিভ্রান্তির জাল,
তাই অবশ্যই এ ব্যাপারে তাদের উপযুক্ত অবতরণের প্রয়োজন। অন্ততঃ
পক্ষে আজ, যখন এদেশের ব্যক্তি ও সমাজজীবন এক
অনাগত পরিবর্তন সম্ভাবনায় প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে
কঠোরতর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে চলেছে। বিতর্কের
কুয়াশাকে সরিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সাংস্কৃতিক কর্মী,
উভয়েরই আজ পথ চিনে নেওয়া বোধহয় প্রয়োজন।

রথীন চক্রবর্তী

রাজনৈতিক আন্দোলন,
সংস্কৃতি,
ও সাংস্কৃতিক ফ্রণ্ট

প্রথম পর্ব

....

রাজনৈতিকআন্দোলন, সংস্কৃতি, ও সংস্কৃতিক ফ্রণ্ট

হাইনরিখ হাইনে

লুটেশিয়ার মুখবন্ধ

রিপাবলিকানরাই যেক্ষেত্রে আউগ্‌সবের্গের জেইটুং-এর সংবাদদাতার কাছে এমন একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেক্ষেত্রে ওই সংবাদপত্রটির পক্ষে সোশ্যালিস্টগুলোর তাল সামলানো যে আরো কতো ভয়ানক কঠিন, তা তো বোঝাই যায়। সোশ্যালিস্ট না বলে বরং ওই দানবগুলোকে, ওদের আসল যে নাম, সেই কমিউনিস্ট নামে অভিহিত করাই ভালো। কিন্তু তবু, বাস্তবিক পক্ষে, আমি এই পত্রিকাটিতে ওদের নিয়ে আলোচনা করার কাজে সত্যিই সফল হয়েছি। এর সম্পাদক মহাশয়গণ এই প্রাচীন নীতিবাক্যটি মনে রেখেছিলেন যে "দেয়ালের গায়ে ইবলিসের ছবি এঁকো না", আর এই নিদে'শ নামাটি মনে রেখে তাঁরা বহু চিঠিই চেপে গেছেন। কিন্তু আমি যা যা লিখেছিলাম তার সবটাই তাঁরা একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। এবং, আগেই যে-কথা বলেছি, তাঁদের সংবাদপত্রের অতীব বিচক্ষণ স্তম্ভগুলিতে এমন একটা বিষয়ের অবতারণা করার সুযোগ আমি খুঁজে নিয়েছি যেটার প্রচণ্ড জরুরী গুরুত্বটাকে সে সময়ে ঠিক মতো উপলব্ধি করা হয় নি।

আমার নিবন্ধটির দেয়ালের গায়ে আমি ওই ইবলিসের ছবিই এঁকেছি; কিংবা, একজন সুরসিক ব্যক্তির ভাষায় বলা যেতে পারে, আমি ওর হয়ে অতি চমৎকার প্রচারকার্য চালিয়েছি। এই কমিউনিস্টগুলো প্রত্যেকটি দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে, তাদের অভিন্ন লক্ষ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত খবরাখবর

জানার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত; 'আউগ্‌স্‌বের্গের জেইটুং' পড়েই ওরা প্রথম জানতে পারল যে ওদের সত্যিই অস্তিত্ব রয়েছে; জানতে পারল তাদের আসল নামটাও—যে নামটা পুরনো সমাজ কর্তৃক রাস্তার কোণে পরিত্যক্ত এই সব বেচারী অনাথ শিশুদের অনেকেই একেবারেই জানত না। 'আউগ্‌স্‌বের্গের জেইটুং-এর মারফতেই, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কমিউনিস্টদের ছোট ছোট দলগুলো এই নির্ভরযোগ্য খবরটুকু জানতে পারল যে তাদের আদর্শের অবিচলিত অগ্রগতি ঘটে চলেছে। অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে তারা জানতে পারল যে, ছোট্ট একটা গোষ্ঠী হওয়া তো দূরের কথা, তারাই বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত পার্টির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং তাদের দিন এখনও না এলেও, ভবিষ্যৎ তাদেরই হাতে, আর সেইজন্যেই কিছুকাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাটা তাদের পক্ষে সময়ের অপব্যয় হবে না।

ভবিষ্যৎ যে কমিউনিস্টদের হাতে—এই দৃঢ় বিশ্বাসটা আমি এক মহা-যন্ত্রণা-দায়ক দুশ্চিন্তার সুরে ব্যক্ত করেছি। এবং হায়! আমি মোটেই ভান করে এ কথা বলি নি। আমি সত্যিই মহা আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে ভবিষ্যতের সেই দিনটির দিক তাকিয়ে আছি যেদিন এই বদমাস কালাপাহাড়গুলো ক্ষমতা দখল করে বসবে। নির্মম হাতে অত্যন্ত হৃদয়হীনভাবে তারা আমার একান্ত প্রিয় এইসব অপূর্ব সুন্দর সুন্দর মর্মর মূর্তিগুলি ভেঙে চুরমার করবে। কবি যেসব জিনিস প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, শিল্পের সেই সমস্ত খেলনা আর নিতান্ত তুচ্ছ অতিলৌকিক কল্পনাকে পিষে মারবে। আমার লরেল গাছের কুঞ্জকে ধ্বংস করে দিয়ে তারা সেই ক্ষেতে আলু বুনবে। মাঠের ওই লিলি ফুলগুলি—যারা কোনো কাজও করে না, সুতোও কাটে না, অথচ রাজসিক মহিমায় সমুজ্জ্বল সম্রাট সলোমনের মতোই এক অপূর্ব গৌরবে ভূষিত—ওরা সব হাতে মাকু তুলে নিতে অনিচ্ছার ভাব দেখালেই ওদের সবাইকে সমাজের জমি থেকে উপড়ে তুলে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। গোলাপদের ভাগ্যেও এই একই ব্যাপার ঘটবে—ওই যারা নাইটিঙ্গেল পাখিগুলোর অকর্মা অবসরবিলাসী প্রিয় বন্ধু, আর নিতান্তই অকেজো গাইয়ের দল ওই নাইটিঙ্গেলগুলোকেও তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এবং, হায়! হায়! ওই মুদী কি-না আমার গানের বই, কাব্যগ্রন্থের পাতা ছিঁড়ে ঠোঙা বানাবে ভবিষ্যৎ দিনের বুড়ীগুলোকে কফি কিংবা তামাক দেবার জন্যে।

হায়! দেখতে পাচ্ছি, এই সবই আসন্ন; এবং, যখনই ভাবছি যে বিজয়ী প্রলেতারিয়েতের হাতে আমার কবিতার কী দুর্দশাই না হবে, তখনই আমার মনটা এক অবর্ণনীয় বিষণ্ণতায় ভরে উঠছে: পুরনো এই রোমান্টিক জগতের সব-কিছুর সঙ্গে সে-ও বিনষ্টি লাভ করবে।

কিন্তু তবু, খোলা মনেই স্বীকার করছি, আমার সমস্ত মানসিক প্রবণতা আর আগ্রহগুলির প্রতি এহেন শত্রুভাবাপন্ন কমিউনিজমের দিকে আমার হৃদয় এমন একটা গভীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে থাকে যে আমি কিছুতেই ব্যাপারটা সহ্য করতে পারিনে। আমার মনের মধ্যে দুটি কণ্ঠস্বর তার পক্ষ নিয়ে অনবরত বলে চলেছে—দুটি কণ্ঠস্বর—যে-কণ্ঠ দুটিকে আমি কিছুতেই রোধ করতে পারছিনে। বাস্তবিক পক্ষে তারা ওই ইবলিসের ফিসফিসানি হলেও হতে পারে ; কিন্তু সে যা-ই হোক-না কেন, আমাকে ওদের ভূতে ধরেছে এবং এমন কোনো ভূত ঝাড়ার মন্ত্র নেই যার শক্তি ওদের তাড়িয়ে দিতে পারে।

এই কণ্ঠ দুটির মধ্যে প্রথমটি হল : যুক্তিশাস্ত্রের কণ্ঠস্বর। দান্তে বলেছেন, ইবলিস যুক্তিতর্কে ভারী পটু। যুক্তিশাস্ত্রের ভয়ঙ্কর একটা অনুমানবাক্য আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে, এবং "প্রত্যেক মানুষেরই খাবার অধিকার আছে"—এই সূত্রমুখটিকে যদি আমি খণ্ডন করতে না পারি, তাহলে এর সমস্ত ফলশ্রুতিই আমি মেনে নিতে বাধ্য। কথাটা যখনই ভাবতে বসছি, তখনই আমাকে উন্মাদ হয়ে যাবার ঝুঁকি নিতে হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি, আমাকে ঘিরে সত্যের শয়তান-গুলো বিজয়োল্লাসে নৃত্য করছে, নিদারুণ এক হতাশায় আমার মনটা একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে আর আমি চিৎকার করে বলে উঠছি : এই পুরনো সমাজের বিচার আর শাস্তিবিধান বহুকাল আগেই হয়ে গেছে। ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হোক! ধসে পড়ুক এই পুরনো জগৎ—যে-জগতে সরলতা-পবিত্রতার বিলোপ ঘটেছে, অহংবাদেরই বাড়বাড়ন্ত—যে-জগতে মানুষই মানুষকে শোষণ করে। মিথ্যা আর দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ এইসব চুনকাম করা সমাধিস্তম্ভগুলো সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যাক। এবং, ধন্য হোক সেই মুদী যে-কিনা আমার কবিতার বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ঠোঙা তৈরি করে কফি বা তামাক ওজন করে দেবে গরীব মানুষগুলোর জন্যে, ভবিষ্যৎ দিনের সেই বুড়ী ভালোমানুষের মেয়েগুলোর জন্যে—যাদের হয়তো আমাদের কালের অন্যায়-অবিচারে ভরা এ-জগতের এই সব ছোটখাটো সামান্য সুখগুলি থেকে বঞ্চিত হতে হবে। কিন্তু তবু, বিশ্বসংসার বিলুপ্ত হয়ে গেলেও, ন্যায়-সুবিচার অধিষ্ঠিত হোক!

যে-উদ্ধত কণ্ঠস্বর দুটি আমাকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে, তার দ্বিতীয়টি আরো বেশি বাধ্যতামূলক, ঢের বেশি নারকীয়—কারণ, এটা ঘৃণার কণ্ঠস্বর—যে ঘৃণা আমি বোধ করি এমন একটা পার্টি'র বিরুদ্ধে যে-পার্টির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ হল কমিউনিজম এবং তারই ফলে যে-পার্টি আমাদের অভিন্ন শত্রু। আমি বলছি, জার্মানীতে জাতীয়তাবাদের তথাকথিত প্রতিনিধিদের পার্টির কথা সেই সব

সকল দেশাভিমানীদের কথা—যাদের নিজেদের দেশের প্রতি ভালোবাসা অ-জার্মানদের প্রতি আর প্রতিবেশী জাতিসমূহের প্রতি এক নিতান্ত নির্বোধ অনীহা ছাড়া আর কিছু নয় এবং বিশেষ করে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যারা প্রতিদিন তাদের ঘৃণা বমন করে চলেছে। হ্যাঁ, আমার সারা জীবন ধরে আমি ১৮৫০-এর ওইসব উগ্র টিউটন জাতীয়তাবাদে আচ্ছন্ন ব্যক্তিদের উত্তরাধিকারীদের, কিংবা ধ্বংসাবশিষ্টদের মনে প্রাণে ঘৃণা করে এসেছি এবং এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছি—যারা এখন শুধু তাদের অতি-টিউটনিক ভাঁড়ের ছেঁড়া পোশাকটাকে সেলাই-টেলাই করে নিয়ে একটা নূতন রূপ দিয়েছে আর তাদের কানগুলিকে লম্বায় আরেকটু ছোট করে নিয়েছে। এদের মুমূর্ষু হাতগুলো থেকে তরোয়াল-গুলো খসে পড়ছে দেখে আমি এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকে কিছুটা সান্ত্বনা পাচ্ছি যে, এই পার্টিটাই কমিউনিজমের পথে প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়ালেও, কমিউনিজম এর উপরে মরণ আঘাত হানবে, এবং, সেটা নিশ্চয়ই পদাঘাত হবে না। না, দৈত্যটা স্রেফ একে পোকামাকড়ের মতো পদদলিত করে মারবে। জাতীয়তাবাদের এই সব প্রবক্তাদের প্রতি আমার ঘৃণা থেকেই আমি এই কমিউনিস্টগুলোকে প্রায় ভালোবেসে ফেলেছি বলে মনে হচ্ছে। অন্তত এরা তাদের মতো ভণ্ড নয় যারা অনবরত ধর্ম আর খ্রীস্টধর্মের কথা বলে বেড়ায়। একথা ঠিক যে কমিউনিস্টরা ধর্ম মানে না (কোনো মানুষই নিখুঁত নয়)। এমন কি, কমিউনিস্টরা নাস্তিক (এটা নিশ্চয়ই মস্ত পাপ)। কিন্তু তারা সবচেয়ে ঐকান্তিক এক বিশ্ব নাগরিকতা, সর্ব জাতির মধ্যে সর্বজনীন প্রেমে। আর এই ভূগোলকের স্বাধীন নাগরিক সমস্ত মানুষের সমানাধিকার সহ ভ্রাতৃত্বকে তাদের প্রধান মত হিসেবে ঘোষণা করে। তাদের এই নীতি আর বাইবেলের 'নিউ টেস্টামেন্ট'-এ ঘোষিত নীতি একই। সুতরাং, আদর্শ আর সত্য, এই দুই দিক থেকেই আমাদের তথাকথিত জার্মানিক দেশপ্রেমিকদের চেয়ে—শুধু নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এক জাতীয়তা-বাদের ওই সব সংকীর্ণমনা প্রবক্তাদের চেয়ে—কমিউনিস্টরা ঢের বেশি খ্রীস্টান।

কিন্তু আমি বড়ো বেশি জোর গলায় বলছি ; অন্তত বিচক্ষণতা বশে আর ঠিক এই মুহূর্তে আমার গলার দুর্বলতার কথা মনে রেখে, যতোটা গলা চড়ানো উচিত তার চেয়ে। সুতরাং, উপসংহারে আমি আর দু-একটি কথা মাত্র যোগ করব। আমার মনে হয়, যে অবস্থায় আমি 'লুটেশিয়া' পত্রাবলী লিখেছিলাম, সেটা যে কতোখানি প্রতিকূল অবস্থা ছিল, তা আমি স্পষ্টই দেখিয়ে দিয়েছি। অবস্থাজনিত বাধা-অসুবিধাগুলি ছাড়াও, সময়ের বাধাও আমাকে কাটিয়ে উঠতে হয়েছে। যে-কালে আমি এই চিঠিগুলি লিখেছি সেই সমকালীন বাধা অসুবিধা-

গুলির কথা বলতে গেলে, যে-কোনো বুদ্ধিমান পাঠক সহজেই অবস্থাটা চোখের সামনে দেখতে পাবেন। তিনি শুধু এই চিঠিগুলির তারিখগুলির দিকে নজর করলেই স্মরণ করতে পারবেন যে সেই সময়ে জার্মানিতে জাতীয়তাবাদী, অথবা তথাকথিত দেশপ্রেমিক পার্টিগুলির খুব একটা আধিপত্য চলছিল। 'জুলাই বিপ্লব' তাদের রাজনৈতিক দৃশ্যপটের পিছন দিকে কোনো-এক জায়গায় ঠেলে সরিয়ে দিলেও, ১৮৪০ সালে ফরাসী সংবাদপত্র-পত্রিকাগুলি যে একটা মারমুখো হৈ-হল্লা সৃষ্টি করেছিল, সেটাই এইসব ফরাসীবিদ্বেষীদের নিজেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার সম্ভাব্য সবচেয়ে ভালো সুযোগ দিয়েছে। সেই সময়ে এর গাইছিল 'মুক্ত রাইন'-এর গান। 'ফেব্রুয়ারি বিপ্লব'-এর সময়ে আরো বিচক্ষণ কিছু কণ্ঠস্বর এই উচ্চকিত আওয়াজগুলিকে চাপা দিয়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু সারা ইওরোপ জুড়ে যখন সেই বিরাট প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তখন আবার অল্প-দিনের মধ্যেই সেই বিচক্ষণ কণ্ঠস্বরগুলিকে স্তব্ধ করে দেওয়া হল। ইদানিং ওই জাতীয়তাবাদীরা এবং ১৮১৫ সাল থেকে তাদের উচ্ছিষ্ট হিসেবে পড়ে থাকা যতোসব আপত্তিকর পরগাছা আরেকবার জার্মানিতে আধিপত্য বিস্তার করেছে, দেশের প্রশাসনিক অধিকর্তাদের আর অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিদের প্রশ্রয় পেয়ে তারা তারস্বরে চিৎকার করছে।

তা, চেঁচিয়ে মরো গে যাও! সেই দিনটি আসবেই যেদিন তোমরা নিয়তি-নির্দিষ্ট ওই পায়ের তলায় চাপা পড়ে গুঁড়িয়ে যাবে। এই সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আমি শান্তিতে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারি।

এর পর, প্রিয় পাঠক, আশা করি আমি যতো দূর সম্ভব এমন একটা ধারণা আপনাকে দিতে পেরেছি যার ফলে আপনি এই বইয়ের চিন্তা-পরম্পরার ঐক্য এবং আসল মর্ম বিচার করতে পারবেন। সেই সব সৎ লোকের হাতেই আমি আস্থার সঙ্গে এই বইটি তুলে দিচ্ছি।

অনুবাদ : রবীন্দ্র মজুমদার

ভি আই লেনিন

পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য

রাশিয়ায় সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক কাজের পক্ষে অক্টোবর বিপ্লবের পর উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতি পার্টি সাহিত্যের প্রশ্নটিকে সামনে তুলে ধরেছে। সামন্ততান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী রাশিয়ার বিষাদাচ্ছন্ন যুগের উত্তরাধিকার আইনসঙ্গত ও বে-আইনী সংবাদপত্রের মধ্যেকার পার্থক্য ঘুচে যেতে শুরু করেছে, কিন্তু এখনও তার একেবারে শেষ হওয়ার ঢের দেরি। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ভণ্ড সরকার এখনও উন্মাদের মতো আচরণ করছে, এতদূর গড়িয়েছে যে ইজভেস্তিয়া সোভেতা রাবোচিখ দেপুতাতোফ "বে-আইনীভাবে" ছাপা হচ্ছে। কিন্তু সরকারের যাকে বাধা দেবার শক্তি নেই, তাকে "নিষিদ্ধ" করার জন্য মূর্খের মতো প্রচেষ্টা সরকারের নিজের কলঙ্ক ডেকে আনা ছাড়া এবং সরকারের উপর আরও নৈতিক আঘাত হানা ছাড়া আর কিছুই আনতে পারে না।

যতদিন পর্যন্ত বে-আইনী ও আইনসঙ্গত সংবাদপত্রের মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল ততদিন পার্টি ও নির্দলীয় সংবাদপত্রের প্রশ্নটি খুবই সরলভাবে এবং অত্যন্ত ভুল ও অস্বাভাবিকভাবে স্থিরীকৃত হতো। পার্টি সংগঠনগুলির দ্বারা প্রকাশিত এবং সক্রিয় পার্টি কর্মীদের গ্রুপগুলির সঙ্গে কোন না কোনভাবে যুক্ত গ্রুপগুলির দ্বারা পরিচালিত সমস্ত বে-আইনী সংবাদপত্র ছিল পার্টি সংবাদপত্র। পার্টি বে-আইনী থাকার দরুন সমস্ত আইনসঙ্গত সংবাদপত্র ছিল

নির্দলীয় সংবাদপত্র। কিন্তু এই সংবাদপত্রগুলি কোনও না কোনও পার্টি'র দিকে 'ঝুঁকে' থাকত। অস্বাভাবিক মৈত্রী, অদ্ভুত 'মিলন' এবং ছদ্মাবরণ অবশ্যম্ভাবী ছিল। পার্টি'-সম্পর্কিত মতামত প্রকাশের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যাদের বাধ্যতামূলক সংযম পালন করতে হতো তাদের সেই সংযমের সঙ্গে ওই সব মতামতে যারা পৌঁছতে পারে নি তাদের ও যারা কার্যত পার্টি'র লোক নয় তাদের অপরিণত চিন্তা বা মানসিক কাপুরুষতা মিশে গিয়েছিল।

ইশপ-সুলভ ভাষা, সাহিত্যগত দাসত্ব, দাসসুলভ বক্তৃতা ও মতাদর্শগত ক্রীতদাসত্বের এক অভিশপ্ত পর্যায়! প্রলেতারিয়েত রাশিয়ায় জীবন্ত ও তাজা সব কিছুর শ্বাসরোধকারী নোংরা আবহাওয়ার অবসান ঘটিয়েছে। কিন্তু প্রলেতারিয়েত এখনও পর্যন্ত রাশিয়ার জন্য কেবল অর্ধেক স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে।

বিপ্লব এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। জারতন্ত্র যেমন বিপ্লবকে পরাজিত করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী আর নয় তেমনি বিপ্লবও এখন পর্যন্ত জারতন্ত্রকে পরাজিত করার মতো যথেষ্ট শক্তি অর্জন করে নি। আমরা এখন এমন একটি সময়ে বাস করছি যখন সর্বত্র ও সবকিছুতে প্রকাশ্য, সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও সুসঙ্গত পার্টি' চেতনার সঙ্গে একটি গুপ্ত, আবৃত 'কূটনৈতিক' ও এড়িয়ে-চলা 'বৈধতা'র এক অস্বাভাবিক মিলন ক্রিয়াশীল। এই অস্বাভাবিক মিলন এমনকি আমাদের সংবাদপত্রের মধ্যেও অনুভব করা যায়ঃ নরমপন্থী উদারনৈতিক বুর্জোয়া সংবাদ-পত্র নিষিদ্ধ করার জন্য সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক স্বৈরাচার সম্পর্কে মিস্টার গুচ্‌কফের সরস উক্তিসমূহ সত্ত্বেও বাস্তব হল এই যে, রাশিয়ান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি'র কেন্দ্রীয় মুখপত্র প্রোলেতারি স্বৈরতান্ত্রিক পুলিশী নির্যাতন-প্রধান রাশিয়ার রুদ্ধ দুয়ারের বাইরেই রয়েছে।

সে যাই হোক না কেন, এই আধা-খেঁচড়া বিপ্লব সমগ্র বিষয়টিকে নতুন লাইনের ভিত্তিতে সংগঠিত করার কাজে অবিলম্বে লেগে পড়তে আমাদের সকলকে বাধ্য করছে। বর্তমানে সাহিত্য যদি "আইনসঙ্গত" ভাবে প্রকাশিত হয়ও, তবু তা নয়-দশমাংশ পার্টি'-সাহিত্য হতে পারে। একে পুরো পার্টি'-সাহিত্য করতেই হবে। বুর্জোয়া রীতিনীতির মুনাফালোভী ব্যবসাভিত্তিক বুর্জোয়া পত্রপত্রিকার, সাহিত্যসংক্রান্ত ব্যক্তিগত উন্নতি লালসার ও ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার, 'অভিজাত নৈরাজ্যবাদের এবং মুনাফা লোলুপতার সম্পূর্ণ বিপরীতে সমাজতন্ত্রী প্রলেতারিয়েতকে পার্টি' সাহিত্যের মূলনীতি অবশ্যই উপস্থাপিত করতে হবে, বিকশিত করতে হবে এবং যতটা সম্ভব সম্পূর্ণভাবে ও নিখুঁতভাবে রূপায়িত করতে হবে।

পার্টি-সাহিত্যের এই মূলনীতিটি কি? ব্যাপারটা মাত্র এ রকম নয় যে, সমাজতন্ত্রী প্রলেতারিয়েতের ক্ষেত্রে সাহিত্য ব্যক্তি বা গ্রুপকে উন্নত করার একটি উপকরণ হতে পারে না। সাহিত্য কার্যত প্রলেতারিয়েতের অভিন্ন স্বার্থকে বাদ দিয়ে একটি ব্যক্তিগত উদ্যোগ হতে পারে না। পক্ষ অবলম্বনকারী নয় এমন লেখকরা ধ্বংস হোক। সাহিত্যিক অতিমানবরা উচ্ছন্নে যাক। সাহিত্যকে অবশ্যই প্রলেতারিয়েতের সাধারণ স্বার্থের অংশ হতে হবে; সাহিত্যকে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিকভাবে সচেতন সমগ্র অগ্রগামী বাহিনীর দ্বারা চালু একটি একক মহান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক প্রক্রিয়ার "স্ক্রু ও খাঁজ" হতে হবে। সাহিত্যকে অবশ্যই সংগঠিত, পরিকল্পিত ও সুসংহত সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'র কাজের অন্যতম অংশ হতে হবে।

একটি জার্মান প্রবাদে আছে "সমস্ত উপমাই অসম্পূর্ণ"। খাঁজের সঙ্গে সাহিত্যের, এবং প্রক্রিয়ার সঙ্গে সজীব আন্দোলনের মদীয় উপমাটিও তেমনই। অনুমান করতে পারি, এমন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী সব সময় থাকবে যারা এই উপমা সম্বন্ধে এই বলে সোরগোল তুলবে যে, এই ভাবধারা স্বাধীন লড়াই, সমালোচনার স্বাধীনতা, সাহিত্য সৃষ্টির স্বাধীনতা ইত্যাদি ইত্যাদিকে হতমান, নিষ্প্রাণ ও 'আমলাতান্ত্রিক' করে দেয়। আসল ব্যাপার হলো এই সব চিৎকার বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার এক অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিষয়ে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না যে, যান্ত্রিকভাবে সমন্বয় সাধন ও সমস্ত কিছু সমান করে দেওয়া এবং সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগুরুর কর্তৃত্ব স্থাপন সাহিত্যেই সবচেয়ে কম চলতে পারে। এ বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই যে, এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ব্যক্তিগত ঝোঁক, চিন্তা ও কল্পনা, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর ব্যাপারে আরও বেশি সুযোগ নিঃসন্দেহেই দিতে হবে। এ সবই অনস্বীকার্য; কিন্তু এসব শুধু এ কথাই প্রমাণ করে যে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি-আদর্শের সাহিত্যগত দিকটিকে তার অপরাপর দিকের সঙ্গে যান্ত্রিকভাবে একরূপ করে দেওয়া যায় না। যা হোক, এতে করে সাহিত্যকে সর্বতোভাবে ও অপরিহার্যভাবে অপরাপর উপাদানের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'র কাজের এক উপাদান হতে হবে—এই মর্মীয় প্রতিজ্ঞাটিকে, যা বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাছে বিজাতীয় ও অপরিচিত, তাকে কোনক্রমেই খণ্ডন করা যায় না। সংবাদপত্র-গুলিকে অবশ্যই বিভিন্ন পার্টি' সংগঠনের মুখপত্র হতে হবে এবং সংবাদপত্রের লেখকদের অবশ্যই এইসব সংগঠনের সদস্য হতে হবে। প্রকাশনা ও বিলির কেন্দ্র, পুস্তকালয়, পাঠাগার ও অপরাপর এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই পার্টি

নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। সংগঠিত সমাজতন্ত্রী প্রলেতারিয়েতদের এইসব কাজের উপর দৃষ্টি রাখতে হবে, সামগ্রিকভাবে এর তদারক করতে হবে ও কোনও ব্যতিক্রম ছাড়া শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবন্ত প্রলেতারিয়েতের আদর্শের জীবন প্রবাহকে এর মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে এবং এই উপায়ে 'লেখকরা লেখেন, পাঠকেরা পড়েন'—এই প্রাচীন, আধা-ওবলমভ (গন্‌চারোফ রচিত 'রুশ ভূস্বামী' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, গতানুগতিকতার প্রতীক) আধা-দোকানদারি রুশ নীতির তলা থেকে জমি সরিয়ে নিতে হবে।

অবশ্য আমরা এ কথা বলছি না যে, এশীয় সেন্সর ব্যবস্থা ও ইউরোপীয় বুর্জোয়ারা যে সাহিত্যকর্মের বিকৃতি সাধন করেছে তা রূপান্তর ঘটানোর কাজ হঠাৎ করে ফেলা যাবে। কোনও ধরনের ছকবাঁধা ব্যবস্থা অথবা কয়েকটি হুকুমনামা দ্বারা সমাধানের কথা বলা আদৌ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ছকবাঁধা পরিকল্পনা এক্ষেত্রে একেবারেই কার্যকরী নয়। যা প্রয়োজন তা হলো এই যে, আমাদের সমগ্র পার্টি'কে এবং সারা রাশিয়ার রাজনীতিগতভাবে সচেতন সমস্ত সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক প্রলেতারিয়েতকে এই নতুন সমস্যা সম্পর্কে সজাগ হতে হবে, একে পরিষ্কারভাবে সুনির্দিষ্ট করতে হবে এবং সর্বত্রই এই সমস্যার সমাধানের জন্য কাজ শুরু করতে হবে। সামন্ততান্ত্রিক সেন্সর ব্যবস্থার বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে বুর্জোয়া দোকানদারির সাহিত্যগত সম্পর্কের বন্দী হবার বাসনা আমাদের নেই,তা হবও না। আমরা চাই স্বাধীন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করতে এবং তা করব। এই স্বাধীন সংবাদপত্র, শুধু পুলিশের হাত থেকেই মুক্ত থাকবে না, পুঁজি, ব্যক্তিগত উন্নতিলোলুপতা এবং সর্বোপরি বুর্জোয়া নৈরাজ্যবাদী ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকেও মুক্ত থাকবে।

এই শেষের কথা ক'টিকে আপাতবিরোধী বলে মনে হতে পারে, অথবা পাঠকদের প্রতি প্রকাশ্য অপমান বলে মনে হতে পারে। স্বাধীনতার কোনও অত্যুৎসাহী সমর্থক বা কিছু বুদ্ধিজীবী চেঁচিয়ে উঠতে পারে, কি ! সাহিত্য-সৃষ্টির মতো সূক্ষ্ম ও ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর যৌথ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে চাও ! তোমরা চাও মজুরেরা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটাধিক্যের জোরে বিজ্ঞান, দর্শন, বা নন্দনতত্ত্বের বিষয়গুলিকে স্থির করুক ! তোমরা নিরঙ্কুশ ব্যক্তিগত মতাদর্শগত কাজের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাকে অস্বীকার করছ !

মহাশয়গণ, মাথা ঠাণ্ডা করুন ! প্রথমত, আমরা আলোচনা করছি পার্টি' সাহিত্য নিয়ে এবং সাহিত্যকে পার্টি' নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যাপার নিয়ে। কোনও বাধা ছাড়াই যে-কোনও লোক যা ইচ্ছা লিখতে পারেন, যা ইচ্ছা

বলতে পারেন। কিন্তু প্রত্যেকটি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানেরও (পার্টি সহ) যে সদস্যরা পার্টি নাম ব্যবহার করে পার্টিবিরোধী মতের পক্ষে ওকালতি করে তাদের বহিষ্কার করে দেবার পূর্ণ অধিকার আছে। বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে অবশ্যই পরিপূর্ণ হতে হবে। কিন্তু সমিতি গড়ার স্বাধীনতাকেও হতে হবে পরিপূর্ণ। বাক-স্বাধীনতার নামে আপনাদের চিৎকার করার, মিথ্যা কথা বলার, এবং মনের সুখে লেখার পূর্ণ অধিকার দিতে আমি বাধ্য। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সমিতি গডার স্বাধীনতার নামে এ-মত বা সে-মত প্রচারকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হবার বা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার অধিকারও আমাকে দিতে আপনারা বাধ্য। পার্টি হল একটি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান। তাই যারা পার্টিবিরোধী মতামত প্রচার করে পার্টি যদি তাদের সংগঠন থেকে বের করে না দিতে পারে, তাহলে প্রথমে মতাদর্শগতভাবে ও পরে সংগঠনগতভাবে তা নিশ্চিত ভেঙে পডবে। পার্টি ও পার্টিবিরোধীদের মধ্যে সীমারেখা নির্ধারণ করার জন্য রয়েছে পার্টির কর্মসূচী, কর্মকৌশল সম্পর্কে পার্টির প্রস্তাবাদি, পার্টির নিয়মাবলী এবং পরিশেষে আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসির সমগ্র অভিজ্ঞতা, প্রলেতারিয়েতের স্বেচ্ছামূলক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির অভিজ্ঞতা, যে প্রলেতারিয়েত প্রতিনিয়তই তাদের পার্টির মধ্যে এমন সব ব্যক্তি ও ঝোঁককে নিয়ে এসেছে যারা পুরোপুরি দৃঢ় নয়, পুরোপুরি মার্কসবাদী নয় ও সম্পূর্ণ নির্ভুলও নয়, এবং অপর দিকে আবার তারা তাদের বাহিনীগুলিকে প্রতিনিয়ত "জঞ্জাল মুক্তও" করেছে। সুতরাং আমাদের পার্টির মধ্যে বুর্জোয়া "সমালোচনার স্বাধীনতার" সমর্থকদের পক্ষেও একথা প্রযোজ্য। আমরা এখন হঠাৎ এক গণ-পার্টি হয়ে উঠছি, হঠাৎ প্রকাশ্য সংগঠনে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছি এবং এটা ঘটতে বাধ্য যে, যারা দৃঢ় নয় (মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে) এ রকম বহু লোক আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে, হয়তো কিছু ক্রিশ্চিয়ান এবং এমনকি অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসী কিছু লোকও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। আমাদের সুস্থ পাকস্থলী আছে, এবং আমরা শিলাসদৃশ কঠিন মার্কসবাদী। ওইসব লোক, যারা দৃঢ় নয়, তাদের আমরা হজম করে ফেলব। পার্টির ভিতরে চিন্তার স্বাধীনতা ও সমালোচনার স্বাধীনতা কখনই আমাদের পার্টি নামে পরিচিত স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে জনসাধারণকে সংগঠিত করার স্বাধীনতার কথা ভুলিয়ে দেবে না।

দ্বিতীয়ত,আপনাদের অর্থাৎ বুর্জোয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিকদের আমরা নিশ্চয়ই একথা বলব যে, অবাধ স্বাধীনতা সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্যটি ডাহা ভণ্ডামি। অর্থের ক্ষমতাভিত্তিক একটি সমাজে, যে সমাজে শ্রমজীবী জনসাধারণ দারিদ্র্যের মধ্যে

জীবনযাপন করেন এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনী লোক পরগাছার মত বাঁচেন, সেখানে কোনও প্রকৃত ও কার্যকরী 'স্বাধীনতা' থাকতে পারে না। লেখক মহাশয়, আপনি কি আপনার বুর্জোয়া প্রকাশকের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে স্বাধীন? সেই সমস্ত বুর্জোয়া জনসাধারণ যারা দাবি করে যে, তাদের জন্য আপনি ফ্রেমে ও আঁকা ছবিতে অশ্লীল বস্তু যোগাবেন ও বেশ্যাবৃত্তিকে 'পবিত্র' নাটকীয় কলার 'সম্পূরক' হিসাবে হাজির করবেন, তাদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে কি আপনি স্বাধীন? এই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা হলো একটি বুর্জোয়া বা নৈরাজ্যবাদী বুলি (কারণ একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে নৈরাজ্যবাদ হল উল্টে দেওয়া বুর্জোয়া দর্শন)। কোনও লোক সমাজের মধ্যে বাস করবে অথচ সমাজ থেকে মুক্তও থাকবে, তা হতে পারে না। বুর্জোয়া লেখক, শিল্পী অথবা অভিনেত্রীদের স্বাধীনতা হল কেবল টাকার থলি, দুর্নীতি ও বেশ্যাবৃত্তির উপর ছদ্মবেশে (অথবা ভণ্ডামি করে ছদ্মবেশ ধরে) নির্ভরতা।

আমরা সমাজতন্ত্রীরা এই ভণ্ডামীর মুখোস খুলে দিই এবং নকল লেবেলগুলো ছিঁড়ে ফেলি। এর কারণ এই নয় যে, আমরা শ্রেণী-বহির্ভূত সাহিত্যে ও কলায় পেঁছাতে চাই, (তা সম্ভব কেবল শ্রেণী-উত্তর সমাজতান্ত্রিক সমাজে)। আমরা এ কাজ করব এই ভণ্ডামিভরা স্বাধীন সাহিত্য যা বস্তুত বুর্জোয়াদের সঙ্গে সংযুক্ত; তার সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে সর্বহারার সঙ্গে যুক্ত এক সত্যিকার স্বাধীন সাহিত্যের বৈসাদৃশ্য প্রদর্শন করার জন্য।

এ হবে স্বাধীন সাহিত্য, কারণ লোভ বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, সমাজতন্ত্রের এবং শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতির ভাবধারা নতুন নতুন শক্তিকে নিজ বাহিনীতে নিয়ে আসবে। এ হবে স্বাধীন সাহিত্য, কারণ অতিরিক্ত পরিতৃপ্তি থেকে বিরাগে পেঁছনো কয়েকজন নায়িকাকে এবং মেদবাহুল্যের বিকৃতিতে ভোগা, এমঘেঁয়েমিতে আচ্ছন্ন 'উঁচুতলার দশ হাজারকে' এ সাহিত্য সেবা করবে না, সেবা করবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে যাঁরা হলেন দেশের পুষ্প-স্বরূপ দেশের শক্তি ও ভবিষ্যৎ। এটি হবে স্বাধীন সাহিত্য যা সমাজতন্ত্রী সর্বহারাদের অভিজ্ঞতা ও জীবন্ত কাজ দিয়ে মানবজাতির বিপ্লবী চিন্তাধারার চূড়ান্ত কথাটিকে সমৃদ্ধ করবে; অতীত অভিজ্ঞতা (বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, আদিম ও কাল্পনিক রূপ থেকে সমাজতন্ত্রকে বিকাশের সম্পূর্ণতা সাধন) ও বর্তমানের অভিজ্ঞতার (শ্রমিক কমরেডদের বর্তমান সংগ্রাম) মধ্যে স্থায়ী পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেবে।

তাহলে কমরেডগণ, কাজে লেগে পড়া যাক। আমরা একটি নতুন ও কঠিন

কর্তব্যের সম্মুখীন। কিন্তু এটি হল সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত একটি ব্যাপক, বহুরূপে ও বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি সংগঠিত করার এক মহান কর্তব্য। সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক সাহিত্যকে অবশ্যই পার্টিসাহিত্য হতে হবে। প্রত্যেকটি সংবাদপত্র, পত্রিকা, প্রকাশনী ইত্যাদিকে, তাদের কাজকর্মকে অবিলম্বে এমনভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে, যার ফলে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে এগুলি কোনও না কোনও পার্টি সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। একমাত্র তখনই "সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক" সাহিত্য তার নামের যোগ্য হয়ে উঠবে, কেবল তখনই এই সাহিত্য তার কর্তব্যসাধনে সক্ষম হবে এবং এমন কি বুর্জোয়া সমাজের কাঠামোর মধ্যে থেকেই বুর্জোয়া দাসত্ব ভেঙে বেরিয়ে এসে প্রকৃতই অগ্রসর, পুরোদস্তুর বিপ্লবী শ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে মিশে যেতে পারবে।

মাও ৎসে-তুং

রাজনৈতিক আন্দোলন ও শিল্প সাহিত্য

যেহেতু আমাদের শিল্প হল ব্যাপক জনগণের জন্য, তাই আমরা পার্টির আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের সমস্যাগুলি নিয়ে, যেমন পার্টির সামগ্রিক কাজের সঙ্গে পার্টির সাহিত্য ও শিল্প-বিষয়ক কাজের সম্পর্ক নিয়ে এবং তার সাথে সাথে পার্টির বাইরে যারা আছে, যেমন এই ক্ষেত্রে পার্টি-বহির্ভূত যেমন লোক রয়েছে তাদের সঙ্গে পার্টির সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রের কাজের সম্পর্কের অর্থাৎ সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে যুক্তফ্রণ্টের সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারি।

প্রথম সমস্যাটি নিয়ে বিবেচনা করা যাক। আজকের পৃথিবীতে সকল সংস্কৃতি, সকল সাহিত্য ও সকল শিল্পই বিশেষ শ্রেণীর সম্পত্তি এবং বিশেষ রাজনৈতিক লাইন প্রচার করাই তার কাজ। শিল্পের জন্য শিল্প, শ্রেণী-স্বার্থের উর্ধ্বে অবস্থিত বা রাজনীতির সাথে সম্পর্কহীন ও স্বাধীন শিল্প বলে আসলে কিছুই নেই। প্রলেতারীয় সাহিত্য ও শিল্প হচ্ছে সমগ্র প্রলেতারীয় বিপ্লবী লক্ষ্যেরই একটি অংশ; লেনিনের ভাষায় তা হচ্ছে সমগ্র বিপ্লবী যন্ত্রেরই দাঁত ও চাকা। সুতরাং পার্টির সমগ্র কাজকর্মের মধ্যে কোন একটি বিশেষ বিপ্লবী যুগে পার্টি কর্তৃক নিরূপিত বৈপ্লবিক কাজকর্মের আওতার মধ্যে সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে পার্টির কাজের একটি সুনির্দিষ্ট ও সুনিরূপিত অবস্থান রয়েছে। এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করলে তা সুনিশ্চিতভাবেই দ্বৈতবাদ ও বহুত্ববাদে নিয়ে

যাবে এবং মূলত তা ট্রট্স্কির মতো দাঁড়াবে 'রাজনীতি মার্কসবাদী, শিল্প বুর্জোয়া' এই অবস্থানে। সাহিত্য ও শিল্পের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান আমরা সমর্থন করি না, কিন্তু তাদের গুরুত্বকে খাটো করে দেখাও আমরা সমর্থন করি না। সাহিত্য ও শিল্প রাজনীতির অধীন, কিন্তু তারা তাদের দিক থেকে রাজনীতির ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্প সামগ্রিক বৈপ্লবিক লক্ষ্যেরই একটি অংশ, তারই দাঁত ও চাকা। এবং যদিও অন্যান্য কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশের তুলনায় তারা কম গুরুত্বপূর্ণ ও কম জরুরী এবং গৌণ একটা অবস্থানের অধিকারী হলেও তা সমগ্র যন্ত্রের অপরিহার্য দাঁত ও চাকা এবং সমগ্র বিপ্লবী লক্ষ্যেরই তা অপরিহার্য অঙ্গ। ব্যাপকতম ও একেবারে সাধারণ অর্থে সাহিত্য ও শিল্প বলতে যা বোঝায় তা যদি আমাদের না থাকত, তাহলে আমরা বিপ্লবী আন্দোলন চালিয়ে যেতে ও বিজয় অর্জন করতে পারতাম না। এটা বুঝতে না পারা ভুল হবে। তাছাড়া যখন আমরা বলি যে সাহিত্য ও শিল্প হচ্ছে রাজনীতির অধীন, আমরা তখন শ্রেণীর রাজনীতি, জনগণের রাজনীতিকেই বোঝাই, তথাকথিত মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের রাজনীতিকে বোঝাই না। বিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী যাই হোক না কেন, রাজনীতি হচ্ছে শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীর সংগ্রাম, তা মুষ্টিমেয় কজন ব্যক্তির কার্যকলাপ নয়। মতাদর্শ ও শিল্পগত ক্ষেত্রের সংগ্রামকে রাজনৈতিক সংগ্রামের অধীন থাকতে হয় এই জন্য যে একমাত্র রাজনীতির মধ্য দিয়েই শ্রেণী ও জনগণের প্রয়োজন কেন্দ্রীভূত আকারে প্রকাশ পায়। বিপ্লবী রাষ্ট্রনীতিবিদগণ অর্থাৎ সেই রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ যাঁরা বিপ্লবী রাজনীতির বিজ্ঞান ও প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন, সোজা কথায় তাঁরা হচ্ছেন লক্ষ কোটি রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের অর্থাৎ জনসাধারণের নেতা। তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে এই বিপুল সংখ্যক রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের অভিমত সংগ্রহ করা, সেগুলিকে বাছাই করা এবং সেগুলিকে পরিচ্ছন্ন আকারে জনসাধারণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া এবং জনসাধারণই তখন সেগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করবে। সুতরাং তাঁরা সেই অভিজাত 'রাষ্ট্রনীতিজ্ঞবৃন্দ' নন যাঁরা দ্বার বন্ধ ঘরে বসে কাজ করেন আর ভাবেন দুনিয়ার তাবৎ জ্ঞানের তাঁরাই একমাত্র একচেটিয়া অধিকারী। এখানেই হচ্ছে নীতিগত দিক থেকে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রনীতি ও ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া-রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদের মধ্যেকার পার্থক্য। ঠিক এই কারণেই আমাদের সাহিত্য ও শিল্পগত রচনার রাজনৈতিক চরিত্র ও তাদের সত্যনিষ্ঠ চরিত্রের মধ্যে পুরোপুরি ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর। এটা

বুঝতে না পারা এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি ও রাজনীতিজ্ঞদের হেয় প্রতিপন্ন করা ভুল হবে।

আসুন, এবার সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের পরবর্তী প্রশ্ন নিয়ে বিবেচনা করা যাক। যেহেতু সাহিত্য ও শিল্প রাজনীতির অধীন এবং যেহেতু আজকের চীনের রাজনীতির মূল সমস্যা হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, আমাদের পার্টির লেখক ও শিল্পীদের সর্বপ্রথম জাপানকে প্রতিরোধের এই প্রশ্নে সমস্ত পার্টি-বহির্ভূত লেখক ও শিল্পীদের সঙ্গে (পার্টির সমর্থক ও পেটি-বুর্জোয়া লেখক ও শিল্পীদের থেকে শুরু করে বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর সমস্ত লেখক ও শিল্পী যাঁরাই জাপানকে প্রতিরোধ করার পক্ষপাতী তাঁদের সঙ্গে) ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্রের প্রশ্নে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এ ব্যাপারে জাপ-বিরোধী লেখক ও শিল্পীদের একটা অংশ আমাদের সঙ্গে একমত নন, তাই অপরিহার্যভাবেই ঐক্যের পরিধি এখানে কিছু পরিমাণে সীমাবদ্ধই হবে। তৃতীয়তঃ, সাহিত্য ও শিল্প জগতের নিজস্ব বিশেষ সমস্যার ব্যাপারে, সাহিত্য ও শিল্পের পদ্ধতি ও রচনারীতির প্রশ্নে তাঁদের সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এখানেও যেহেতু আমরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের পক্ষপাতী অথচ কিছু লোক এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে একমত নন, তাই এক্ষেত্রেও আমাদের ঐক্যের পরিধি আরও সংকুচিত হবে। এই বিষয়ে একদিকে যেমন ঐক্য থাকছে, অন্যদিকে তেমনি থাকছে সংগ্রাম ও সমালোচনা। বিষয়গুলি একাধারে তাই পৃথক এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্তও বটে যার ফলে যেসব বিষয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হচ্ছে, যেমন জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রশ্নে, সেখানেও একই সময়ে সংগ্রাম ও সমালোচনার অবকাশ থেকে যাচ্ছে। একটি যুক্তফ্রন্ট 'শুধুই ঐক্য এবং কোন সংগ্রাম নয়' আর 'শুধুই সংগ্রাম এবং কোন ঐক্যই নয়', এই দুটোই হচ্ছে অতীতে কিছু কমরেডদের অনুসৃত ভুল নীতি —একটি হচ্ছে দক্ষিণপন্থী আত্মসমর্পণবাদ ও লেজুড়বৃত্তি এবং অন্যটি হচ্ছে 'বামপন্থী' বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সংকীর্ণতাবাদ। এটি শিল্প ও সাহিত্য এবং রাজনীতি এই উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে সত্য।

চীনের সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রের যুক্তফ্রন্টের শক্তিগুলির মধ্যে পেটি-বুর্জোয়া লেখক ও শিল্পীরা হচ্ছেন একটা গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। যদিও তাঁদের চিন্তাভাবনা ও রচনার মধ্যে বহু ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে তবু তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে তাঁরা বিপ্লবেরই অনুকূলে এবং শ্রমজীবী জনগণের নিকটবর্তী। সুতরাং আমাদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি যাতে তাঁরা কাটিয়ে উঠতে

পারেন তার জন্য তাঁদের সাহায্য করা এবং শ্রমজীবী জনগণের সেবায় নিয়োজিত যুক্তফ্রণ্টে তাঁদের নিয়ে আসা।

সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে সংগ্রামের প্রধানতম একটি পদ্ধতি হচ্ছে সাহিত্য ও শিল্প-সমালোচনা। কমরেডগণ সঠিকভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে তার বিকাশ-সাধন করা উচিত এবং এক্ষেত্রে আমাদের অতীতের কাজকর্ম যথেষ্ট নয়। সাহিত্য ও শিল্প-সমালোচনা একটি জটিল প্রশ্ন, তার জন্য বিশেষ ধরনের প্রচুর অধ্যয়নের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমি শুধু সমালোচনার মানদণ্ডের মূল সমস্যা সম্পর্কেই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। কিছু কমরেড যে-কটি বিশেষ সমস্যা উত্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে এবং কয়েকটি ভুল ধারণা সম্পর্কে সংক্ষেপে আমার মন্তব্য র খব।

সাহিত্য ও শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রে বিচারের দুটি মানদণ্ড রয়েছে—একটি রাজনৈতিক মানদণ্ড, অন্যটি হচ্ছে শিল্পগত মানদণ্ড। রাজনৈতিক মানদণ্ড অনুসারে যা কিছু ঐক্যের এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সহায়ক, যা জনগণকে একজন-একপ্রাণ হয়ে উঠতে উৎসাহিত করে। পিছিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা করে এবং প্রগতির সহায়তা করে তাকেই ভাল বলব; অন্যদিকে যা কিছুই ঐক্যের পক্ষে ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পক্ষে হানিকর, যা জনগণের মধ্যে বিবাদ ও বিরোধের সৃষ্টি করে, প্রগতির বিরোধিতা করে এবং জনগণকে পিছনে টেনে রাখে তা-ই খারাপ। কি করে আমরা ভাল ও মন্দ বিচার করব—উদ্দেশ্য (ব্যক্তির মনোগত ইচ্ছা) বা তার পরিণতি (সামাজিক ফল) দিয়ে? ভাববাদীরা মনোগত উদ্দেশ্যের ওপর জোর দেন এবং পরিণতিকে অবহেলা করেন, অন্যদিকে যান্ত্রিক বস্তুবাদীরা পরিণতির ওপর জোর দেন এবং মনোগত উদ্দেশ্যকে অবহেলা করেন। এই দুয়ের থেকেই স্বতন্ত্রভাবে আমরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদীরা মনোগত উদ্দেশ্য ও পরিণতি এই দুয়ের মধ্যে ঐক্যের ওপর জোর দিয়ে থাকি। জনগণকে সেবার মনোগত উদ্দেশ্য তাদের সম্মতি আদায়ের পরিণতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত; এই দুয়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা প্রয়োজন। একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে বা কোন ব্যক্তিকে সেবা করা ভাল নয়, আবার জনগণের সম্মতি অর্জনের ও তাদের হিতসাধনের দিকে না তাকিয়ে জনগণের সেবার মনোগত উদ্দেশ্যে কিছু করাও ভাল নয়। একজন লেখক বা শিল্পীর মনোগত অভিপ্রায় বিচার করার সময় অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্যটি সঠিক ও সৎ কিনা তা বিচার করার সময় আমরা তাঁর ঘোষণার ওপর নির্ভর করি না, সমাজে জনসাধারণের ওপর তাঁর কাজের (প্রধানত তাঁর রচনার) পরিণাম দিয়েই আমরা

তা বিচার করি। মনোগত অভিপ্রায়ের বা উদ্দেশ্যের বিচারের মানদণ্ড হচ্ছে সমাজিক ব্যবহার ও পরিণাম। সাহিত্য ও শিল্প সমালোচনায় আমরা কোন সংকীর্ণতাবাদ চাই না, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যাপারে সাধারণ নীতিগত ঐক্য থাকলে আমরা সাহিত্য ও শিল্পগত রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক মনোভাব সহ্য করব। কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের সমালোচনায় আমরা নীতির প্রতি দৃঢ় থাকব এবং যেসব সাহিত্য ও শিল্পগত রচনা জাতি, বিজ্ঞান, জনসাধারণ ও কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী অভিমত প্রকাশ করবে সেগুলির আমরা কঠোর সমালোচনা করব এবং কোনমতেই তা মেনে নেবো না। কারণ এই তথাকথিত সাহিত্য ও শিল্পগত রচনা এমন এক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও তা এমন এক পরিণতি সৃষ্টি করে যা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর। শিল্পগত মানদণ্ড অনুসারে উচ্চতর শিল্পগুণবিশিষ্ট সকল রচনাই ভাল বা তুলনামূলক-ভাবে ভাল, অন্যদিকে নিম্নতর শিল্পগুণ সম্পন্ন রচনাগুলি খারাপ বা তুলনামূলক-ভাবে খারাপ। এখানেও অবশ্য সমাজিক পরিণামকে হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে। এমন লেখক ও শিল্পী কমই আছেন যিনি তাঁর নিজের রচনাকে সুন্দর বলে মনে করেন না এবং আমাদের সমালোচনা বিভিন্ন ধরনের শিল্পগত রচনার মধ্যে স্বাধীন প্রতিযোগিতা অনুমোদন করা উচিত। কিন্তু সৌন্দর্যতত্ত্বের বিজ্ঞানের মানদণ্ড অনুসারে এই রচনাবলীকে সমালোচনা করাও একান্ত প্রয়োজনীয় যাতে করে নিম্নতর মানের শিল্পকে ধীরে ধীরে উন্নততর মানে সমুন্নত করা সম্ভব হয় এবং যে শিল্প ব্যাপক জনগণের সংগ্রামের চাহিদা পূরণ করে না তাকে এমনভাবে রূপান্তরিত করা যাতে তা সেই চাহিদা পূরণে সমর্থ হয়ে ওঠে।

একটি হল রাজনৈতিক মানদণ্ড, আরেকটি হচ্ছে শিল্পগত মানদণ্ড; এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটা কী? রাজনীতিকে শিল্পের সমার্থক করা চলে না এবং একটি সাধারণ বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিকে শিল্পগত সৃষ্টি ও সমালোচনার পদ্ধতির সমার্থক করে তোলা চলে না। আমরা যেমন বিমূর্ত ও একান্ত অপরিবর্তনীয় একটি রাজনৈতিক মানদণ্ড বলে কিছু আছে মনে করি না, তেমনি বিমূর্ত ও একান্ত অপরিবর্তনীয় একটি শিল্পগত মানদণ্ড আছে বলেও মানি না। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রতিটি শ্রেণীরই নিজস্ব রাজনৈতিক ও শিল্পগত মানদণ্ড রয়েছে। কিন্তু শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে সকল শ্রেণীই অপরিহার্যভাবে রাজনৈতিক মানদণ্ডকে সর্বাগ্রে স্থান দেয় আর তারপর স্থান দেয় শিল্পগত মানদণ্ডকে। বুর্জোয়াশ্রেণী সবসময়ই প্রলেতারীয় সাহিত্য ও শিল্পের শিল্পগত যত উৎকর্ষই থাক না কেন তাকে

দূরে সরিয়ে রাখে। শ্রমিকশ্রেণীকে একইভাবে অতীত যুগের সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে বাছাই করতে হবে এবং ঐতিহাসিকভাবে তাদের কোনো প্রগতিশীল তাৎপর্য আছে কিনা তা দেখবে এবং জনসাধারণের প্রতি তাদের মনোভাব বিচার করার পরই তারা তাদের প্রতি নিজেদের মনোভাব নির্ধারণ করবে। কিছু কিছু রচনা যা রাজনৈতিকভাবে সরাসরি প্রতিক্রিয়াশীল তাদের কিছু শিল্পগত উৎকর্ষ থাকতে পারে। বিষয়বস্তুতে বেশি বেশি প্রতিক্রিয়াশীল অথচ শিল্পগত উৎকর্ষের দিক থেকে উন্নত—এমন রচনা জনগণের পক্ষে অধিকতর বিষময় এবং সেগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা তত বেশি করে প্রয়োজন। সকল শোষকশ্রেণীর অবক্ষয়ের যুগের সাহিত্য ও শিল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়বস্তু ও তাদের শিল্পগত আঙ্গিকের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। আমরা চাই রাজনীতি ও শিল্পের মধ্যে ঐক্য, বিষয়বস্তু এবং সর্বোচ্চ সম্ভব নিখুঁত শিল্পগত আঙ্গিকের মধ্যেকার ঐক্য। যেসব শিল্পগত রচনায় শিল্পগুণের অভাব রয়েছে তা রাজনৈতিকভাবে যত প্রগতিশীলই হোক না কেন তা হয়ে পড়ে শক্তিহীন। সুতরাং ভুল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন শিল্প সৃষ্টির প্রবণতার আমরা যেমন বিরোধিতা করি, তেমনি 'পোস্টার ও শ্লোগানের কায়দায়' শিল্পসৃষ্টির প্রবণতা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সঠিক হওয়া সত্ত্বেও তাতে শিল্পগত শক্তির অভাব থাকলে আমরা তার বিরোধিতা করি। সাহিত্য ও শিল্পসংক্রান্ত প্রশ্নে আমাদের দুই ফ্রন্টেই সংগ্রাম চালাতে হবে।

বহু কমরেডের চিন্তাভাবনায় এই দুটো ঝোঁকই দেখা যায়। অনেক কমরেড শিল্পগত কলাকৌশলের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেন, তাই শিল্পগত মানের উন্নয়নের ব্যাপারে মনোযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। কিন্তু আমি দেখছি রাজনৈতিক দিকটিই এখন অধিকতর সমস্যা। কিছু কমরেডের প্রাথমিক রাজনৈতিক জ্ঞানেরই অভাব রয়েছে এবং তার ফলে নানারকমের ভ্রান্ত ধারণা এসে দেখা দিচ্ছে। ইয়েনানের কয়েকটি উদাহরণ আমি তুলে ধরছি।

'মানব-প্রকৃতি বিষয়ক তত্ত্ব।' মানব-প্রকৃতি বলে কিছু আছে কি? নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তা হচ্ছে একটি মূর্ত মানব-প্রকৃতি। বিমূর্ত মানব-প্রকৃতি বলে কিছু নেই। শ্রেণীসমাজে শ্রেণীচরিত্রসম্পন্ন, মানবচরিত্রসম্পন্ন মানব-প্রকৃতিই শুধু রয়েছে। শ্রেণীর উর্ধ্বে অবস্থিত কোন মানব-প্রকৃতি নেই। আমরা শ্রমিকশ্রেণীর ও ব্যাপক জনগণের মানব-প্রকৃতিই তুলে ধরি, অন্যদিকে জমিদার ও বুর্জোয়াশ্রেণীগুলি তাদের নিজস্ব শ্রেণীগুলির মানব প্রকৃতিকেই তুলে ধরে, শুধু তারা এ কথা কবুল করে না এই যা এবং তাকেই তারা একমাত্র সম্ভাব্য মানব-প্রকৃতি বলে জাহির করে। কিছু কিছু

পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী যে মানব-প্রকৃতি হাজির করে তাও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের বিরোধী। তারা যাকে মানব-প্রকৃতি বলে অভিহিত করে তা আসলে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তাই তাদের কাছে প্রলেতারীয় মানব-প্রকৃতি, তাদের কথিত মানব-প্রকৃতির পরিপন্থী। মানব-প্রকৃতি বিষয়ক যে তত্ত্বকে ইয়েনানের কিছু লোক তাদের সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ক তথাকথিত তত্ত্ব হিসেবে ঠিক এভাবেই হাজির করে, তা সম্পূর্ণভাবেই ভুল।

'সাহিত্য ও শিল্পের মূল উৎসই হচ্ছে প্রেম, মানবপ্রেম।' প্রেম তো অবশ্যই একটা উৎস হতে পারে কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু রয়েছে। একটা ধারণা হিসেবে প্রেম বা ভালবাসা হচ্ছে বাস্তব ব্যবহারেরই প্রকাশ। মূলগতভাবে আমরা ধারণা থেকে শুরু করি না, শুরু করি বাস্তব ব্যবহার থেকে। আমাদের যে লেখক ও শিল্পীরা বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে এসেছেন তাঁরাও শ্রমিক শ্রেণীকে ভালবাসেন কারণ সমাজ তাঁদের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করেছে যে তাঁরা ও শ্রমিক-শ্রেণী একই সাধারণ ভাগ্যের অংশীদার। আমরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করি। কারণ জাপানী সাম্রাজ্যবাদ আমাদের নিপীড়ন করে। কার্যকারণহীন প্রেম বা ঘৃণা বলে এই পৃথিবীতে একান্তভাবেই কিছু নেই। তথাকথিত মানবপ্রেম সম্পর্কে বলা যায়, মানব সমাজ যেদিন থেকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে সেদিন থেকে ঐ ধরনের সর্বব্যাপ্ত প্রেম বলে কিছুই নেই। অতীতের সকল শাসকশ্রেণীগুলিই ঐটির প্রচারের অনুরাগী এবং অনুরূপভাবে বহু তথাকথিত সাধু-সন্ন্যাসী ও জ্ঞানীরা মানবপ্রেমের প্রচার করেছেন। কিন্তু নিজেরা কেউই জীবনে কোনদিন সত্যিসত্যি তা আচরণ করেননি। কারণ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে তা করা অসম্ভব। সমগ্র পৃথিবীতে শ্রেণী-সমূহের বিলুপ্তির পরই যথার্থ মানবপ্রেম সম্ভব। শ্রেণীসমূহ সমাজকে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছে; 'শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তির পরই সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেম দেখা দেবে, কিন্তু *এখন নয়*। আমরা শত্রুকে ভালবাসতে পারি না, আমরা সামাজিক অন্যায়কে ভালবাসতে পারি না, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সেগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া। এ তো সাধারণ বুদ্ধির কথা, এটা কি করে হতে পারে যে আমাদের কিছু লেখক ও শিল্পীরা এখনো তা বুঝতে পারেন না ?

'সাহিত্যে ও শিল্পকর্মে সর্বদাই উজ্জ্বল ও অন্ধকার দিকের ওপর আধা-আধি-ভাবে সমান জোর দেওয়া হয়।' এই বক্তব্যের মধ্যে তালগোল পাকানো ধারণা রয়েছে। সাহিত্য ও শিল্প সবসময় তা করেছে এটা সত্য নয়। বহু পেটি-বুর্জোয়া লেখক কোনদিনই উজ্জ্বল দিকটা আবিষ্কার করতে পারেন নি। তাঁরা তাঁদের

রচনাতে শুধু অন্ধকার দিককেই উদ্ঘাটিত করেন এবং তাঁদের সাহিত্য 'স্বরূপ প্রকাশের সাহিত্য' বলেই পরিচিত। তাঁদের কিছু রচনা শুধু নৈরাশ্যই প্রচার করে এবং এই পৃথিবী সম্পর্কে ক্লান্তি প্রচারে তা বিশেষ পটু। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের যুগের সোভিয়েত সাহিত্য প্রধানতঃ উজ্জ্বল দিককেই চিত্রিত করে। তা কাজকর্মের ভুলভ্রান্তির বর্ণনাও করে এবং নেতিবাচক চরিত্রও অঙ্কিত করে, কিন্তু সমগ্র চিত্রের উজ্জ্বলতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য শুধু বিপরীত দিক হিসেবে ব্যবহারের জন্যই তা করা হয় এবং তা কোনক্রমেই তথাকথিত আধাভিত্তিতে নয়। অবক্ষয়ের যুগের বুর্জোয়া লেখক ও শিল্পীরা বিপ্লবী জনগণকে নিছক জনতা হিসেবে এবং নিজেদের সাধুসন্ত হিসেবে চিত্রিত করেন এবং এভাবে উজ্জ্বলতা ও অন্ধকারকে একেবারে উল্টে দিয়েছেন। একমাত্র যথার্থ বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীরাই কাকে উচ্চে তুলে ধরতে হবে, না তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হবে এই সমস্যার সঠিক সমাধান করতে পারেন। যেসব অন্ধকারের শক্তি ব্যাপক জনগণের ক্ষতিসাধন করে তাদের মুখোস খুলে দিতে হবে এবং ব্যাপক জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামকেই উচ্চে তুলে ধরতে হবে; এই হচ্ছে বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের মৌলিক কর্তব্য।

'সবসময়েই সাহিত্য ও শিল্পের কাজ হচ্ছে স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেওয়া।' আগেরটির মতো এই বক্তব্যও দেখা দিয়েছে ইতিহাস বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকে। আমরা দেখিয়েছি সাহিত্য ও শিল্প কোনকালেই একমাত্র স্বরূপ উদ্ঘাটনের কাজ করেনি। বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের কাছে জনগণ কোন সময়ই স্বরূপ প্রকাশের বিষয় হতে পারে না, হতে পারে শুধু আক্রমণকারীরা, শোষকেরা, নির্যাতনকারীরা এবং জনগণের ওপর তারা যে কুপ্রভাব সৃষ্টি করে শুধু সেইগুলি। জনগণের নিজেরও ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে যেগুলিকে জনগণের নিজেদের মধ্যেই সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে দূর করে দিতে হবে এবং এ ধরনের আলোচনা ও আত্মসমালোচনা সাহিত্য ও শিল্পের পক্ষেও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। কিন্তু কোনমতেই তাকে 'জনগণের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেওয়া' বলা চলে না। জনগণের দিক থেকে প্রশ্নটা হচ্ছে, মূলতঃ শিক্ষা ও মান উন্নয়নের। একমাত্র প্রতিবিপ্লবীরাই জনগণকে 'জাতবোকা' এবং বিপ্লবী জনগণকে 'অত্যাচারী জনতা' হিসেবে চিত্রিত করে।

'এখনো এটা বিদ্রূপাত্মক রচনার সময় এবং লু-সুন-এর রচনারীতির এখনো প্রয়োজন রয়েছে।' অন্ধকার শক্তিগুলির রাজত্বে বাস করে এবং বাক-স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়ে লু-সুন প্রবন্ধ আকারে জ্বলন্ত বিদ্রূপ ও হাড়-কাঁপানো ব্যঙ্গোক্তির

ব্যবহার করে তাঁর সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। এবং তিনি ঠিক কাজই করেছিলেন। আমরাও ফ্যাসিস্টদের, চীনা প্রতিক্রিয়াশীলদের ও জনগণের পক্ষে ক্ষতিকর সবকিছুকেই তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করে তুলব। কিন্তু শেনসি-কানসু নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে ও শত্রুর পশ্চাদ্‌ভাগের জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলসমূহে যেখানে বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে এবং প্রতিবিপ্লবীদের তা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে সেখানে প্রবন্ধ রচনা-রীতি নিছক লু-সুন-এর মতো হওয়া উচিত নয়। এখানে আমরা আমাদের বক্তব্য উচ্চকণ্ঠে হাজির করতে পারি এবং রেখে-ঢেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলার যেখানে কোনই প্রয়োজন নেই তখন জনগণের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হয় এমন-ভাবে লেখার কোনই প্রয়োজন থাকে না। তাঁর 'ব্যঙ্গ রচনার যুগেও' লু-সুন কোনমতেই বিপ্লবী জনগণ ও বিপ্লবী পার্টিকে উপহাস বা আক্রমণ করেন নি এবং এই নিবন্ধগুলি শত্রুর প্রতি লক্ষ্য করে লিখিত প্রবন্ধগুলির রচনাভঙ্গীর চেয়ে সম্পূর্ণ-ভাবে ভিন্ন ছিল। জনসাধারণের ত্রুটি বিচ্যুতির সমালোচনা দরকার একথা আমরা এর আগেই বলেছি। কিন্তু এটা করার সময় আমাদের যথার্থভাবে জন-গণের পক্ষই অবলম্বন করতে হবে এবং জনগণকে রক্ষা করার ও শিক্ষিত করে তোলার একান্ত আন্তরিক আগ্রহ থেকেই কথা বলতে হবে। কমরেডদের প্রতি শত্রুর মতো আচরণ করার অর্থ হল শত্রুর পক্ষ নেওয়া। আমরা কি তাহলে ব্যঙ্গ করা বন্ধ করে দেব? না, তা দেব না। ব্যঙ্গ সব সময়েই প্রয়োজন। কিন্তু ব্যঙ্গ রয়েছে নানা ধরনের, প্রতিটিতে ভিন্ন ভিন্ন মনোভাবের প্রকাশ ঘটে। ব্যঙ্গ রয়েছে আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগের মতো, ব্যঙ্গ আছে আমাদের মিত্রদের প্রতি ব্যবহারের মতো এবং ব্যঙ্গ আছে আমাদের নিজেদের লোকজনদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের মতো। সাধারণভাবে ব্যঙ্গের আমরা বিরোধী নই। আমরা ব্যঙ্গের অপব্যবহারই শুধু বন্ধ করে দিতে চাই।

প্রশংসা করতে হবে বা জয়গান গাইতে হবে এমন কোন কথা নেই, যাঁদের রচনা উজ্জ্বলতার দিকটিই তুলে ধরে তাই যে অতি অবশ্য মহৎ রচনা হবে এমন কোন কথা নেই এবং যাঁদের রচনা অন্ধকার দিকটি তুলে ধরে তাই যে অতি অবশ্য তুচ্ছ হবে এমনও কোন কথা নেই। আপনি যদি একজন বুর্জোয়া লেখক বা শিল্পী হন, আপনি তো আর শ্রমিকশ্রেণীর জয়গান গাইতে যাবেন না, গাইবেন বুর্জোয়াশ্রেণীর জয়গান। আবার আপনি যদি শ্রমিকশ্রেণীর লেখক বা শিল্পী হন, আপনি তো আর বুর্জোয়াশ্রেণীর জয়গান গাইতে যাবেন না, গাইবেন শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের জয়গান। হয় এইটি হবে, না হয় হবে

অন্যটি। বুর্জোয়াশ্রেণীর জয়গানকারীদের রচনা হলেই তা অতি অবশ্য মহৎ হবে এমন কোন কথা নেই, আবার যাঁরা দেখাতে চান বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্ধকার দিকটি তাদের রচনাই যে অতি অবশ্য তুচ্ছ বিবেচিত হবে এমনও কোন কথা নেই। শ্রমিকশ্রেণীর জয়গানকারীদের রচনা অতি অবশ্য মহৎ নাও হতে পারে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর তথাকথিত 'অন্ধকার দিকের' বর্ণনাকারীদের রচনা তুচ্ছ বলে গণ্য হতে বাধ্য—সাহিত্য ও শিল্পের দিক থেকে এগুলি কি ইতিহাসের বাস্তব সত্য নয়? মানব ইতিহাসের স্রষ্টা জনগণের জয়গান আমরা করব না কেন? কেন আমরা শ্রমিকশ্রেণী, কমিউনিস্ট পার্টি, নয়া গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জয়গান করব না? এক ধরনের লোক আছেন যাঁদের জনগণের লক্ষ্যের ব্যাপারে কোন উৎসাহ নেই এবং তাঁরা শ্রমিকশ্রেণী ও তার অগ্রবাহিনীর সংগ্রাম ও বিজয়কে এক পাশে দাঁড়িয়ে থেকে শীতল দৃষ্টিতে উদাসভাবে শুধু দেখেই যান, যাতে তাঁদের উৎসাহ এবং যাদের জয়গান করতে তাঁরা অক্লান্ত তাঁরা হলেন নিজেরা এবং সম্ভবতঃ তাঁদের ক্ষুদ্র গণ্ডির কয়েকজন লোকেরা। অবশ্যই এই ধরনের পেটি-বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বিপ্লবী জনগণের কার্যকলাপ ও গুণাবলীর জয়গান গাইতে বা সংগ্রামে তাঁদের সাহস ও জয় সম্পর্কে তাঁদের বিশ্বাসকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে অনিচ্ছুক। এই ধরনের লোকেরা বিপ্লবীদের মধ্যেকার ঘুন পোকার মতো; এবং বিপ্লবী জনগণের জন্য এই 'গায়কদের' কোনই প্রয়োজন নেই।

'এটা কোন অবস্থানের প্রশ্ন নয়; আমার শ্রেণীগত অবস্থানটি ঠিকই আছে, আমার উদ্দেশ্য ভাল এবং ঠিক ভাবেই সব বুঝতে পারছি, কিন্তু নিজেকে ভালভাবে প্রকাশ করতে পারছি না, তাই ফলটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে' আমি ইতিমধ্যেই উদ্দেশ্য ও পরিণাম সম্পর্কে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী অভিমতের ব্যাপারে বলেছি। আমি এখন জিজ্ঞেস করতে চাই, পরিণামের প্রশ্নটা কি দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন নয়? যে লোক শুধুমাত্র নিজের অভিপ্রায় দিয়েই পরিচালিত এবং তার কাজ কী পরিণতি সৃষ্টি করছে তার খোঁজই করে না, সে হচ্ছে সেই ডাক্তারের মতো যিনি শুধু ওষুধের ব্যবস্থাপত্র লিখেই খালাস, কিন্তু কজন রোগী মারা গেল তার কোন খোঁজ নেওয়ারই দরকার মনে করেন না। অথবা ধরুন একটা রাজনৈতিক পার্টির কথা যা শুধু ফরমান জারী করেই সন্তুষ্ট থাকে কিন্তু তা কার্যকর হল কিনা তার খোঁজ নেওয়ারই দরকার বোধ করে না, সে হচ্ছে তারই মতো। জিজ্ঞেস করা যেতে পারে -এটা কি একটা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি? উদ্দেশ্য কি এক্ষেত্রে ভাল বলা চলে? অবশ্য আগে থেকে পরিণামের কথা ভেবে নিলেও ভুলভ্রান্তি হতে পারে; কিন্তু বাস্তব ঘটনা থেকে যখন দেখা গেল পরিণাম খারাপ হচ্ছে

তখনো যদি কেউ সেই একই পুরনো পথ আঁকড়ে পড়ে থাকে তবে কি তার উদ্দেশ্য কে ভাল বলা চলে? একটি পার্টি বা একজন ডাক্তারকে বিচার করার সময় আমাদের তাকাতে হবে তাদের বাস্তব কাজকর্মের দিকে, তাদের কাজের পরিণতির দিকে। একজন লেখকের বিচারের বেলাতেও সেই একই কথা। যে ব্যক্তি যথার্থই সৎ অভিপ্রায় দ্বারা পরিচালিত তিনি তাঁর কাজের পরিণতিকে অবশ্যই বিচার করে দেখবেন, অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করবেন এবং অনুসৃত পদ্ধতি পর্যালোচনা করে দেখবেন অথবা সৃজনশীল রচনার ব্যাপারে প্রকাশভঙ্গিকে পর্যালোচনা করে দেখবেন। যে ব্যক্তি যথার্থই সৎ অভিপ্রায় দ্বারা পরিচালিত তাঁকে তাঁর কাজকর্মের ভুলত্রুটির ও বিচ্যুতির চূড়ান্ত প্রাণখোলা সমালোচনা করতে হবে এবং এই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে শুধরে নিতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। ঠিক এই কারণেই কমিউনিস্টরা আত্মসমালোচনার পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকেন। এটাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক পথ। একমাত্র এ ধরনের গুরুতর ও দায়িত্বশীল বাস্তব প্রয়োগের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই কোনটি সঠিক অবস্থান তা ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে এবং ক্রমে ক্রমে সেটিকে ভালভাবে আয়ত্ত করা যাবে। বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেউ যদি এই পথে অগ্রসর না হয়, আর যদি সেই সহজ আত্মপ্রসাদে মশগুল হয়ে শুধু বলতে থাকে যে সে 'সবকিছু ঠিকই বুঝেছে' তাহলে বুঝতে হবে আসলে সে কিছুই বুঝতে পারেনি।

'আমাদের মার্কসবাদ অধ্যয়নের জন্য আহ্বান জানানোর অর্থ হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী সৃজনশীল পদ্ধতির ভুলগুলিরই পুনরাবৃত্তি করা আর এতে করে আমাদের সৃজনশীল মেজাজেরই ক্ষতিসাধন করা হবে।' মার্কসবাদ অধ্যয়নের অর্থ হচ্ছে জগতের, সমাজের ও সাহিত্য এবং শিল্পের পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করা; এর অর্থ আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মের ব্যাপারে দার্শনিক বক্তৃতামালা রচনা করা নয়। সাহিত্য ও শিল্প-সৃষ্টির ব্যাপারে বাস্তবতাকে সরিয়ে দিয়ে মার্কসবাদ তার স্থান পূরণ করে নেয় না যদিও তা এই ব্যাপারেও নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রাখে, ঠিক যেমন পদার্থবিদ্যার পারমাণবিক ও ইলেকট্রনিক তত্ত্বগুলির স্থান দখল না করেও তা এই ব্যাপারে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রাখে। ফাঁকা, শুকনো, বিচারশূন্য গোঁড়া সূত্রগুলি সত্যিসত্যিই সৃজনশীল মেজাজকে ধ্বংস করে দেয়। শুধু তাই নয়; তা সবার আগে মার্কসবাদকেই ধ্বংস করে দেয়। বিচারশূন্য গোঁড়া 'মার্কসবাদ' মার্কসবাদ নয়, তা মার্কসবাদ-বিরোধী। তাহলে মার্কসবাদ সৃজনশীল মেজাজকে

ধ্বংস করে দেয় না কি ? হাঁ, করে। তা নিশ্চিতভাবেই সামন্তবাদী, বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া, উদারনীতিবাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, নৈরাজ্যবাদী, শিল্পের জন্য শিল্পবাদী, অভিজাত, অবক্ষয়ী ও নৈরাশ্যবাদী এবং অন্যান্য যেসব 'সৃজনশীল' মেজাজ ব্যাপক জনসাধারণ ও শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধাচারী সেগুলিকে ধ্বংস করে দেয়। প্রলেতারীয় লেখক ও শিল্পীদের দিক থেকে বলা যায়, এই ধরণের 'সৃজনশীল' মেজাজকে ধ্বংস করাই কি উচিত হবে না ? আমি মনে করি, সেগুলি ধ্বংস করাই উচিত, একেবারে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়াই উচিত এবং এগুলিকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়েই নতুন কিছু রচিত হতে পারবে।

আরউইন সিলবার

অবক্ষয়ী সংস্কৃতি ও বিপ্লবী শিল্পকলা

সাম্রাজ্যবাদ মৃত্যুমুখীন। অতীতের অন্য সকল শক্তিশালী ব্যবস্থার মতো, উন্নতির সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেও লয় হচ্ছে। অত্যন্ত জটিল এবং মানুষের এতাবৎ সৃষ্টির অবিশ্বাস্য যন্ত্রকৌশল, বিশাল সামরিক ব্যবস্থার দ্বারা সুরক্ষিত, এতাবৎ উদ্ভাবিত, মানুষের মন ও চিন্তাকে অতি সতর্ক, হিসাবী কলাকৌশলে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার দ্বারা পরিবৃত এবং তার উপর ভিত্তি করেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সুনিশ্চিতভাবে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে।

ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব আমাদের শিক্ষা দেয়, সমাজ ব্যবস্থা তার নেতির দিকটিকেও সৃষ্টি করে। ধনতন্ত্রই সৃষ্টি করে শ্রমিকশ্রেণী, ধনতন্ত্রের ধ্বংসের মধ্যেই যার চূড়ান্ত ঐতিহাসিক স্বার্থ ন্যস্ত। সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি করে উপনিবেশ এবং নয়া-ঔপনিবেশিক দুনিয়া, সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের মধ্যেই যার গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র ঐতিহাসিক কর্তব্য নিহিত। কিন্তু বিকাশের বর্তমান স্তরে, আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের স্বদেশী একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সাগরপারের লগ্নী এবং ঔপনিবেশিক শোষণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা একসূত্রে গ্রথিত। এবং এ কারণেই এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ক্রমবর্ধমান জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পতাকা এবং রাইফেল মানবজাতির সামনে আশা ও স্বপ্নের ছবিকে তুলে ধরতে পারছে।

বিপ্লবী তৃতীয় বিশ্ব, ক্ষুধার্ত শোষিতের বিশ্ব, কালো মানুষের জগত, "বিশ্বের নিগৃহীতদের" দুনিয়া—ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পথিকৃৎরূপে অবতীর্ণ শুধু আপন মুক্তির জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির বিপ্লবী ভবিষ্যতের জন্যও বটে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বুকের ওপর, দৈত্যটির দৃষ্টির সম্মুখে, অন্তঃস্থলে, বিপ্লবী চেতনা আজ সমগ্র বিশ্বকে মথিত করে, পত্রপুষ্পে শোভিত হয়ে উঠছে। এই নবচেতনা বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হচ্ছে—কোন কোন মানুষের কাছে এগুলো অতিপরিচিত, কারোর কাছে অপ্রত্যাশিত, সম্ভবত ভীতিপ্রদ হবে। ভয় পাবেন না। দৈত্যটি মরছে এবং তার ধ্বংসের অস্ত্রগুলি কখনো কখনো কুৎসিত দর্শন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে যন্ত্রণাদায়ক। আমরা—যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিপ্লবী চেতনাকে বাড়িয়ে তোলার জন্য, বিপ্লবী আন্দোলন সৃষ্টির জন্য কাজ করছি তারাও এই পাশব-শক্তি জাত।

আমরা মনের দিকে সৎ নই। আমাদের হাতও নোংরা। কিন্তু আমরা মৃত্যুর স্বাদ ও গন্ধকে চিনতে শিখেছি। আমরা জেনেছি মৃত্যু নানা বেশে আসে—তাদের রূপ কখনো মধুর, তৃপ্তিদায়ক। জেনেছি রেফ্রিজারেটরের হিমশীতল কক্ষেও মৃত্যু জন্ম নেয়। মৃত্যু "ক্যাডিল্যাক" চালিয়েও আসে। আমরা শিখেছি, দাস-মালিকরা, শোষকরা, বর্ণ বিদ্বেষীরা জীবন্ত মৃত্যু। এবং আমরা এই মৃত্যুকে এবং যে পদ্ধতি থেকে এর উদ্ভব হয়েছে—তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

আমরা? কে এই "আমরা"?

আমরা পথিকৃৎ। কয়েক হাজার ছাত্র, বিক্ষুব্ধ যুবা। (প্রথম দর্শনে আপনাদের মনে হতে পারে, যাকে বলা হয় "হিপি", কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক জীবনধারা, লম্বা চুল ইত্যাদির মত কতগুলো খেলো জিনিষ দেখেই বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের বিপ্লবী শক্তিকে বিপথগামী করে অর্থহীন বিকৃতির মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য—সমাজে সৃষ্ট অগণিত সূক্ষ্ম কৌশলের মধ্যে একটি হল এই 'হিপি" মতবাদ।) আমরা গেরিলা শিল্পী এবং উদার বুদ্ধিজীবীর দল। ক্রমবর্ধমান জঙ্গী বিপ্লবী কালো মানুষরা। আমরা ওয়াশিংটনে "পেন্টাগনের" দিকে মিছিল করেছি। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ভবন দখল করেছি। আমরা কালো মানুষের সমাজকে আত্মরক্ষায় প্রস্তুত করতে শুরু করেছি। আমরা চিকাগোর রাজপথে মার্কিন শাসকশ্রেণীর ভণ্ডামির মুখোশকে উন্মোচিত করেছি আমরা সমাজে প্রচলিত শিল্পকলার নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমগুলির বিকল্প ভাব প্রকাশ ও আদানপ্রদানের মাধ্যমগুলি গড়ে তুলতে শুরু করেছি।

আমরা একটি আন্দোলন—আজও অসংগঠিত, সময়ে সময়ে বিশৃঙ্খল, সততই পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত—অসংখ্য ভুল ও জটিলতা সৃষ্টি করে চলেছি—এবং অতি ধীরে, তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে অপ্রতিহত গতিতে বিকশিত হচ্ছি। যে ভাবেই হোক, মানুষের আত্যন্তিক প্রয়োজনের একান্ত অবসর মুহূর্তে, আমরা যে শক্তি এবং চেতনা লাভ করেছি তাই আমাদের আদর্শগতভাবে সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভে সক্ষম করে তুলবে। একদিন আমরা দুর্বার আন্দোলনে জেগে উঠবো, যা মানবজাতিকে তার অদ্বিতীয় নিপীড়ক, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করতে সক্ষম হবে।

অভিজ্ঞতা অর্জন একটি বেদনাদায়ক প্রক্রিয়া। আমাদের দেশের আত্মিক অবক্ষয় থেকে শুরু করে, কৌশলী মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি, যা আমাদের দেশের বিশাল জনসমষ্টিকে—একমাত্র সামাজিক কার্যকলাপ পণ্য-ভোগের মন্ত্রে রূপান্তরিত করেছে, শিক্ষা ব্যবস্থার বুদ্ধিগত দেউলিয়াপনা, কালো মানুষদের, মেকসিকান, পুয়েৰ্তো-রিকানদের শোষণের অবিচ্ছিন্ন ক্রমবর্ধমান ধারার মধ্যে দরিদ্র, ক্ষুধার্ত মানুষ—যারা প্রাচুর্যের ক্লিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে জীবনযাপন করে, গতানুগতিক জীবনধারার অপবিত্রতার মধ্যে, ঘৃণার কদর্যের মধ্যে, ভীতি এবং নিরাপত্তাহীনতা থেকে—একদা সুন্দর আমাদের এই মানুষগুলির মনে, মুখের চেহারায় যে ছাপ এঁকেছে—এ সবকিছু থেকেই আমরা শিক্ষা লাভ করেছি। আমরা প্রথমেই শিখেছি হতাশা, ঘৃণা ও বিকৃতি। শিখেছি এই অনুভূতিগুলি আমাদের মন এবং চেতনাকে পরিচ্ছন্ন রাখার আবশ্যকীয় বিশোধক।

যখন সাম্রাজ্যবাদ মৃত্যুমুখী—এবং তার গলিত শবের গন্ধ দেহমনকে আচ্ছন্ন করেছে—তখন দূরদিগন্তে শুনতে পাচ্ছি নতুন এক আওয়াজ। বিশ্বের তমসাচ্ছন্ন মহাদেশগুলির জাগরণ-ধ্বনি। আলজিরিয়া, কঙ্গো, অ্যাঙ্গোলার বাণী আমরা শুনেছি—শুনেছি দক্ষিণ আফ্রিকার সুতীব্র আর্তকণ্ঠ—যা একদিন অবিশ্রান্ত রুধির বর্ষণ আর্তনাদে ফেটে পড়বে। গুয়াতেমালা, সান্তো দোমিনগো, পুয়েৰ্তোরিকোর ডাক আমরা শুনেছি। কিউবার কণ্ঠে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। বলিভিয়া, ভেনেজুয়েলা, কলাম্বিয়া থেকে ভেসে আসছে রাইফেলের আওয়াজ। আমরা চীনের কথা শুনেছি এবং অনুভব করেছি অমিত শক্তির পরশ যা এশিয়ার আশি কোটি মানুষের মুক্তিকে সম্ভব করেছে। শুনেছি উত্তর আমেরিকার রাজপথে আমাদের কৃষ্ণকায় ভ্রাতাভগ্নীদের ক্ষুব্ধ কণ্ঠে এবং অনুভূত হয়েছে মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত নবশক্তির উন্মেষ। আমরা ভিয়েতনাম-এর কথা শুনেছি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধের হিংস্র, বেদনার্ত, মৃত্যুর সুতীব্র আর্তস্বর আমরা শুনেছি।

প্রথমে শঙ্কিত হয়েছি, পরে ভীতি সঞ্চার হয়েছে। আমরা প্রতিবাদ করেছি, সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র, প্রতিহিংসাপরায়ণ আক্রমণের বিরুদ্ধে মিছিল করেছি। কিন্তু আমরা শিখেছি—এবং আমরা শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিয়েছি। দূরে ভিয়েতনামের জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। দেখেছি সাম্রাজ্যবাদের প্রবল পরাক্রমশালী সামরিক আয়োজনকে দরিদ্র অনগ্রসর মানুষের দ্বারা প্রতিহত হতে। মুক্তি সেনাদের অমিত বিক্রমকে অনুভব করতে পারছি।

তৃতীয় বিশ্বের কাছে—জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিশ্ব থেকে, চীন, ভিয়েতনাম কিউবা এবং আলজিরিয়ার জগৎ থেকে, বীর গেরিলা যোদ্ধাদের জগৎ থেকে—শিখেছি আশার বাণী। এবং সে কারণেই আমরা মনে করি, সম্ভবতঃ সর্বকালের তুলনায়, আমরা বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছি। কেমন সে বিপ্লবী—স্বপ্ন দেখতে যার সাহস হয় না? অত্যাচারীর আপাত প্রতীয়মান অজেয় শক্তির সম্মুখে নৈতিক, বুদ্ধিগত অবক্ষয়ের শূন্য গিরিকন্দরে পরাজিতের পশ্চাদোপসরণ ঘটছে। কিন্তু একদিন যারা বিজয়ী হবে তারা সব ঝুঁকি নিতে পারে। তাঁদের আশা শুধু স্বপ্নভ্রম নয়। এই চেতনা-শক্তি ঐতিহাসিক প্রয়োজন-ভিত্তিক। কোন ব্যক্তির আত্মমুক্তি এবং সমগ্র মানবজাতির মুক্তির সম্পর্ককে অবিচ্ছেদ্যরূপে দেখার ক্ষেত্রে মানবজাতির চূড়ান্ত বিকাশের প্রশ্নে—বিশেষ ব্যক্তির আত্মনিয়োগের তাৎপর্যটি নির্ভরশীল। জীবন ও মৃত্যু, এ দুটি শক্তিই, আত্মবিকাশের পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্যু অতি নিকট সহচর, পরিমণ্ডলে সতত বর্তমান। রেডিও, টেলিভিসন, স্কুল, সুপার-মার্কেট, থিয়েটার, সিনেমা, আমাদের সম্পদ সঞ্চয়ের উন্মত্ত প্রবৃত্তিতে এবং ক্রমবর্দ্ধমান অমানবিক দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতিতে নিয়ত উপস্থিত। জীবন বাতাসে বাতাসে—বিশ্বব্যাপী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নতুন সমাজ ব্যবস্থায়, নবজাতকের ক্রন্দনে, সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংসের মধ্য দিয়ে জীবনের সব দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণের দৃঢ় সংকল্পে সংগ্রামের সাথে যুক্ত।

একটি সংক্ষিপ্ত যুগপরিসরে, বংশধরদের সামনে যে দৃষ্টিভঙ্গি যে জগৎ সৃষ্টি করেছি আমেরিকাতে তা অভূতপূর্ব। কোন কোন সময় এই উত্তরসূরীদের রাজনৈতিক কার্যকলাপকে "নব্যবামপন্থী" নামে অভিহিত করা হয়। (কৃষ্ণবর্ণের সমাজে কখনোও এদের বলা হয় প্যানথার—তাঁরা বেশী বেশী করে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন "কালোই সুন্দর"—তাঁদের মনে নতুন মর্যাদাবোধ স্থাপনে ব্ল্যাক প্যানথাররা সক্ষম হয়েছেন)। সঙ্গীত, শিল্পকলা, এবং কাব্যও অধুনা সৃষ্টি—এবং যে ভাবেই হোক, সম্ভবতঃ আদর্শ এবং ঘটনার সঠিক প্রতিফলনই উত্তরসূরীদের সঠিক মানসিকতা গড়ে তুলেছে।

আজকের যুক্তরাষ্ট্রে এক নতুন শিল্পরীতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। (পুরাতন শিল্পধারাও বর্তমান। শিল্প সৃষ্টির শতকরা নব্বই ভাগ হল এই পুরাতন শিল্পধারা যা বই, টেলিভিসন, চলচ্চিত্র, ফ্যাসান এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের অবক্ষয়ের চূড়ান্ত নিদর্শন—ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সুকৌশলে, সুশৃঙ্খলভাবে মানুষকে গলাধঃকরণে বাধ্য করা হচ্ছে।) নতুন শিল্পরীতি—অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমেরিকার বাস্তবজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। এই শিল্পরীতি স্ববিরোধী, ধ্বংসাত্মক, এবং কখনোও কুৎসিত। "আমেরিকার স্বপ্ন"—এই ভণ্ডামি সম্পর্কে এই শিল্পকলা সচেতন বংশধরদের সৃষ্টি। এ শিল্পকলা—সমগ্র যুগের প্রতিরোধক আবরণকে ছিন্ন করে পচনশীল সমাজের কুৎসিত নগ্নতাকে চিত্রিত করেছে। এই শিল্পকলা বিকৃত সমাজ ব্যবস্থার অসার ধমনীগুলিকে উন্মোচিত করে। এই শিল্পকলার ধ্বংসই সত্য এবং সত্যই ধ্বংস।

এই শিল্পরীতি কেমন? এ হল এ্যালিবির থিয়েটার, ববি ডিলানের সংগীত, এলান গিন্সবার্গের কাব্য, এণ্ডি ওয়ারহলের চিত্রকলা। এই শিল্পরীতি নিষিদ্ধ জগতের—অশ্লীলতার মত্ত-সংস্কৃতির দান। এই শিল্পকলা এমন এক বংশধরদের সৃষ্টি যারা তাদের শিক্ষক, দার্শনিক, নেতা, গুরুজনদের ভণ্ড বাক্‌চাতুরীতে প্রতারিত। এবং তাই এটা এমন এক শিল্পরীতি যা কাজকে বাদ দেয়, ভাবকে বিকৃত করে, এমন এক দেহজ কামনাময় সঙ্গীত সৃষ্টি করে, যার একমাত্র সত্য—যোনি এবং পশ্চাদ্দেশের পাশব সত্যকেই প্রকাশ করে। এই শিল্পরীতি এমন বংশধরদের সৃষ্টি যারা বর্ণ-বিদ্বেষ, হত্যা, মুনাফা, লুণ্ঠনের ব্যবস্থাকে সমর্থনের জন্য সেকেলে ন্যায়নীতির প্রচলিত রীতিগুলিকে পরিহার করতে বাধ্য হয়েছে। ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ওরা ঈশ্বর, সময়, কাজ, বুদ্ধিবৃত্তি সব কিছুকেই ধ্বংস করছে। সৃষ্টি করছে সঙ্গীত, কাব্য, থিয়েটার, শিল্পকলার বৈপরীত্য। আমেরিকার এই বিকাশমান, অবক্ষয়ী শিল্পকলার চেয়ে অন্য কোন সুনিশ্চিত নিদর্শন কি সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু প্রকাশে সক্ষম? এ সম্পর্কে ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নেই। বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র সৃষ্টিশীল শিল্পকলা এই ক্ষয়িষ্ণু শিল্পরীতি। এর চেয়ে কম কিছু বলা মিথ্যা, সত্যের অপলাপ ঘটানো, যা একজন আপোষহীন শিল্পী গ্রহণ করতে পারে না। তার সহজাত শিল্পবোধই তাকে বলে দেয়, ধ্বংস, মুখোশকে টেনে ছিঁড়ে ফেলা, বাস্তব সামাজিকতাকে অনাবৃত করাই শিল্পরীতিতে একমাত্র গ্রহণযোগ্য সত্য। এটা আমাদের যুগের যন্ত্রণা যা নকি আবার সুন্দর। আর যদি আমরা ধ্বংস করি—তবে তার পরিবর্তে আমরা কি গড়ে তুলব? এখন আমাদের নিশ্চয়ই বুঝতে হবে—সাম্রাজ্যবাদ কিছুই নয় যদি

সে সম্ভাবনা সৃষ্টি না করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে" বিরোধী শক্তিকে সরাসরি উৎপীড়নের শেষ বেপরোয়া প্রচেষ্টা শাসকশ্রেণী অন্য সকল পথে ব্যর্থ হয়েই গ্রহণ করে। আজকের আমেরিকান যুব সমাজের মেজাজে বিচ্ছিন্নতাবোধ, হতাশা প্রাধান্য লাভ করছে। ধনতন্ত্র এই মেজাজকে ধ্বংস করতে অক্ষম। যে সকল মৌলিক সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, যা এই সমাজ-ব্যবস্থা সমাধানে অক্ষম, তারই স্বাভাবিক প্রতিফলন এগুলো। সুতরাং এই মেজাজকে বোঝা, নিয়ন্ত্রিত করা, পরিচালনা করার নিশ্চয়ই তারা চেষ্টা করবে। এই বিচ্ছিন্নতা অবিশ্বাস যেন তার শক্তির উৎসকে বিপর্যস্ত করার অস্ত্রে পরিণত না হতে পারে সে-ব্যাপারে সে সুনিশ্চিত হতে চায়। তাদের প্রশমিত করা একান্ত প্রয়োজন।

কি ভাবে এটা তারা বুঝবে, তারপর নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত করবে? সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রচার অভিযানে, সিনেটর ম্যাকার্থি, প্রেসিডেন্ট পদ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের প্রাক্কালে, কারণ স্বরূপ কোনকিছুই অপ্রকাশিত রাখেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল "পথের বিক্ষোভ ধ্বনিকে সরিয়ে এনে" রাজনৈতিক ব্যবস্থার বর্তমান কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করা। এই হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী রাজনীতির ভণ্ডামী—আপনার দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক না কেন, যতক্ষণ আপনি এই ব্যবস্থার ক্রীড়নক হয়ে আছেন, এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকবেই। আমেরিকার গণ-প্রচার মাধ্যমগুলি, এই অবক্ষয়ী, স্ববিরোধী শিল্পকলাকে নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত করে—সঙ্গে সঙ্গে এই বিভ্রান্তিও সৃষ্টি করে যে তার পরিপূর্ণ, স্বাধীন বিকাশকে তারা সহায়তা দান করছে।

কি ভাবে এটা তারা করছে? এই সমাজ ব্যবস্থা প্রতিবাদ এবং ধ্বংসের সীমারেখাকে গড়ে তুলছে। এরা কখনোই বিপ্লবী পরিস্থিতিতে বিপ্লবী শিল্পকলা ছড়াতে দেবে না। প্রতিবাদের গান, নৈরাজ্যবাদী নাটক নতুন ধরণের স্বাধীনতার নামে যৌন ঘটিত সর্বপ্রকার প্রকাশ ঘটতে দিয়ে এরা বিদ্রোহীদের ক্ষমতাকে নিঃশেষিত করে দেয়। (আপনি কি বিপ্লবকে থিয়েটারের স্টেজের ওপর নগ্ন অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন?) অবক্ষয়ী শিল্পকলাকে এই সমাজব্যবস্থা তার অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ধারণ করে আছে। এই বিশেষ শিল্পকলাকে পণ্যে পরিণত করে—যা পুরনো মোহকে ধ্বংস করে, শিল্পকর্মে "স্বাধীনতা" সম্পর্কে নতুনভাবে মোহ সৃষ্টি করতে সহায়তা করে, এবং এসব শিল্পীদের রয়্যালটি বাবদ প্রভূত অর্থ, পারিশ্রমিক, এবং বৈষয়িক উৎসাহ যুগিয়ে এ সমাজ ব্যবস্থার বহিরঙ্গে তাদের সৃষ্টিকর্মগুলিকে আবদ্ধ রাখে। এই সমাজব্যবস্থা যেমন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রকে "ক্রয়" করার

জন্ম তার শক্তিকে ব্যবহার করে তেমনি বৈষয়িক উৎসাহ দানে শিল্পীদের তার উপযোগী করে তোলে। (প্রকৃতপক্ষে এই সমাজ ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্য বিরোধিতা এই পথে যতটা, স্বীকার করে, তার চেয়ে অধিক। তারা কয়েকটি সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে "বর্তমান বিরোধী" হয়ে উঠছে এবং যাতে তারা সচেতন না হতে পারে যে এই শিল্পকলা, প্রতিরোধক এবং আত্মশুদ্ধি উভয় দিক থেকে এই সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা আত্মস্থ, ব্যবহৃত হতে পারে।) কিন্তু শিল্পীরা মনবিহীন ধ্বংসকামী নয়। পুরাতনকে কিছু প্রতিস্থাপন করছে এ বিশ্বাস ছাড়া কোন কিছুকেই সে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে না। এবং এখানেই সবল, জীবন্ত অবক্ষয়ী শিল্পকলা, ধনতান্ত্রিক সমাজ জীবনের স্ববিরোধিতা-জাত, বিপরীত অবস্থায় পর্যবসিত হয়। অবক্ষয়ী শিল্পকলা খাঁটি বিপ্লবী বিকল্প ভিন্ন, আজ হোক কাল হোক, বাস্তবতার বিকৃতিতে আত্মহননের যন্ত্রে পরিণত হয়।

ধনতান্ত্রিক সমাজের অবক্ষয়ের মধ্যেই বিকল্প সত্তাগুলি জন্মলাভ করছে। যখন এই বিকল্প সত্তাগুলি কেবলমাত্র স্ববিরোধিতাজাত তখন তারা নিজেরাই নিজেদের কাছে বিদ্রূপের পাত্র হয়ে উঠছে। ধনতন্ত্র কি ঘৃণা সৃষ্টি করে? উত্তর হল প্রেম। ধনতন্ত্র কি যুদ্ধ চায়? উত্তর—অহিংসা। ধনতন্ত্র কি গোড়ামী চায়? উত্তর হল যৌনজীবনের স্বাধীনতা। ধনতন্ত্র কি শৃঙ্খলা, বশ্যতা দাবী করে? উত্তর—বিশৃঙ্খলা। ধনতন্ত্র কি "নেতা" এবং "স্বার্থান্বেষীদের" চায়? উত্তর হচ্ছে "কোন নেতা নয়।" ধনতন্ত্র কি হৃদয়হীন আমলাতন্ত্র চায়? উত্তর হবে "নৈরাজ্য।" ধনতন্ত্র কি কারিগরী সমাজে অমানবিকতা সৃষ্টি করতে উৎসুক? চায় "ফুল" এবং "আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবন।"

"শিল্পগুলি" হল স্ববিরোধী দর্শনের অংশমাত্র। ধনতান্ত্রিক শক্তি এই "শিল্পগুলিকে" উৎসাহিত করে। চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, থিয়েটার, কাব্য, সর্ব উপায়ে, যে ব্যবস্থা তার আদর্শ প্রচারের জন্য রয়েছে, ধনতন্ত্র "পুষ্পপ্রীতি" "প্রেম", "মনজগতের বিপ্লব", "আধুনিক মত্ত-সংস্কৃতি'—এই অমানবিক সমাজ-ব্যবস্থার যা কিছু গ্রহণযোগ্য বিকল্প তাকে অব্যাহত রাখে—কারণ এই "বিকল্পগুলির" কোনটাই ধনতান্ত্রিক শক্তির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে না।

কিন্তু আমরা তাদের এই খেলা চলতে দিতে পারি না। বিপ্লবী শিল্পীরা বিপ্লবী বিকল্পগুলি গড়ে তুলছেন। আমরা আপনাদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকে "বিকশিত" করে তুলবো না। আমরা আপনাদের চলচ্চিত্র আরও উন্নত করবো না। আমরা আপনাদের সঙ্গীত এবং শিল্পকলায় নতুন রকমের বাস্তবতা নিয়ে আসবো না। আমরা আমাদের চলচ্চিত্র, সংবাদপত্র, সঙ্গীত (এবং গানগুলির রেকর্ডিং

করার) শিল্পকলা, থিয়েটারের বিকাশ ঘটাবো। আমরা আমাদের বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির যৌক্তিকতাকে ব্যবহার করে আপনাদের সমাজব্যবস্থাকে আর একটুও দীর্ঘজীবী হতে দিতে প্রস্তুত নই। আমরা এই সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে এসেছি—আমরা চাই এই সমাজব্যবস্থার সুস্পষ্ট "বিকল্প" শক্তি। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধনতন্ত্র অর্থাৎ কালাসঙ্গতির সমূল বিনাশসাধনের জন্য। এই গ্রহের সমস্ত মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পারিপার্শ্বিক দৈনন্দিন জীবনের আবেগময় মূহূর্তগুলিতে, নগরে, স্বদেশে সকল কাজে পূর্ণ অংশগ্রহণের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে আমরা এসেছি।

এইখানেই "আমরা"—আমরা একটি আন্দোলনের উন্মেষ, যাদের সামনে ঐতিহাসিক মূহূর্ত উপস্থিত। আপনাদের কাছে—তৃতীয় বিশ্বের আমার ভ্রাতাভগ্নীদের কাছে, আমরা জানাচ্ছি : সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার আপাতমধুর প্রলোভনে বিভ্রান্ত হবেন না। এর যন্ত্র-কৌশল শক্তিশালী, প্রচারমাধ্যম সুকৌশলী। কিন্তু ওর কাঠামো আমূল পচে উঠেছে—এ মূহূর্তে, আপাত শক্তিমান মনে হলেও মৃত্যু যন্ত্রণার লক্ষণেই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত। আমরা জানি আমরা কি বলছি। আমরা দৈত্যের জঠরেই বাস করছি আমাদের সংগ্রামকে উপলব্ধি করুন -আমাদের কাছে সর্বদা আরও কিছু আশা করুন। আপনারাই এই জগতের প্রাণশক্তি। আমরা আপনাদের সমর্থন, উৎসাহ, কমরেডসুলভ সাহায্য চাই।

আমাদের উদ্বেগের অনুকরণ করবেন না। আমাদের সংগ্রাম ভয়ঙ্কর এবং আমরা আমাদের সাধারণ শত্রুকে খতম করার জন্য অনেক নতুন অস্ত্র সৃষ্টি করেছি। আমাদের বিধ্বংসী অস্ত্রগুলি একান্তভাবে আপনাদের সৃষ্টিকর্মের হাতিয়ার হতে পারে না।

আমরা—যুবসমাজ, কালো মানুষ, শিল্পীরা আমাদের বিপ্লবী কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত করেছি, আমাদের কাল এবং পরিবেশের প্রয়োজনে এবং শুরু করেছি এক দীর্ঘ কঠিন যাত্রা। আমাদের অনেকে নিহত হবেন। বিপ্লবী প্রতিশ্রুতি পালনের ক্ষেত্রে অনেকে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভে বাধ্য হবেন—অনেককে আমরা দেখবো হতাশাগ্রস্ত। আমাদের মধ্যে অনেকে নিজের গোপন আত্মশক্তি আবিষ্কার করবেন এবং ঐতিহাসিক কর্তব্যের আহ্বানে নবজন্ম লাভ করবেন।

কিন্তু আমরা শুরু করেছি। পিছু ফিরবার কোন অবকাশ নেই।

অনুবাদ : কিশলয় সেন

ট্রান্ দিন্হ ভন

বিপ্লব ও সাংস্কৃতিক জীবন

দক্ষিণ ভিয়েতনামের যে কোন জায়গায় যে কোন সময় মার্কিন বোমারু বিমানের অতর্কিতে গোলাগুলি বর্ষণের সম্ভাবনা সত্ত্বেও মুক্ত এলাকায় যখন যেখানেই কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক বা সিনেমা দেখানো হয়, সেখানেই বিশাল জনসমাবেশ হয়ে থাকে।

সায়গনের অনতিদূরে কুচি জেলার কথাই ধরা যাক। সেখানে শত্রু-নিকেষ করার অভিযানের সময় একমাসের মধ্যে মার্কিন সৈন্যরা সায়গনের ২০ কিলো-মিটার দূরে কয়েকটি গ্রামের উপর ১,৮০,০০০ গোলা নিক্ষেপ করে। এদের আয়তন ১০৫ মিলিমিটার থেকে ২০৩ মিলিমিটার পর্যন্ত এবং বি-৫২ বিমান সমেত শত শত বিমান ঐ অঞ্চলে নিবিড় বোমাবর্ষণ আরম্ভ করে। ফলে ঘর-বাড়ীর কথা ছেড়ে দিলেও একটা গাছও অক্ষত অবস্থায় ছিল না। কিন্তু জনগণ মাটির নীচে আশ্রয় নিয়ে মাটিকে জড়িয়ে থেকেও শত্রুদের আঘাত হেনেছে। অপরদিকে কিন্তু তারা শিল্পানুষ্ঠান চালিয়ে গেছে। মার্কিন বাহিনী আক্রমণ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এসে হাজির হলো প্রখ্যাত শিল্পীসংস্থা লিবারেশন আর্ট এনসেম্বল এবং হিউন্হ মিন্হ সেইং—মুক্ত শিল্প সংস্থার সভাপতি এবং গিয়াং নাম-এর মত কবি।

যেখানেই কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হোক লোকেরা অনেক আগে ভাগে এসে

দিনের বেলায় সেখানে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য খাল কাটে এবং সন্ধ্যের সময় সমস্ত পরিবার এসে সেখানে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে থেকে অনুষ্ঠান দেখে। কখন কখন দু'একটা বোমাও পড়ে এবং আহতও হয় দু'একজন। কিন্তু তারা অনুষ্ঠান শেষ না দেখে হাসপাতালে যেতে রাজি হয় না। অবশ্য প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সঙ্গেই প্রাথমিক চিকিৎসকরাও থাকেন।

তারপর নদীতীরবর্তী অঞ্চলগুলোর কথা ধরা যাক। ঐ নদীগুলো দিয়ে সমুদ্র থেকে জাহাজ সোজাসুজি সায়গনে পৌঁছতে পারে। মার্কিন পাহারাদাররা এবং তাদের বোমারু বিমানের ঘনঘন আক্রমণ কিন্তু মুক্তি ফৌজের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে না। ঐ নদীগুলির উভয় তীরে রয়েছে বিস্তীর্ণ জলাভূমি এবং ঐ অঞ্চলের লোকেরাও ঘন কাদার মধ্যদিয়ে মশার কামড সহ্য করে জল ভেঙে যাতায়াত করে। যে সমস্ত গেরিলা মার্কিন নৌকাগুলো আক্রমণ করার জন্য ওৎ পেতে থাকে তাদের সাহায্য করার জন্য কয়েকটি নৌকা একসঙ্গে বেঁধে মঞ্চ তৈরী ক'রে ঐ অঞ্চলের লোকেরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকে। দর্শকরা এমনই আগ্রহী যে ঘন্টার পর ঘন্টা মশার কামড় সহ্য করে জলে কাদায় দাঁড়িয়ে দাঁডিয়ে অনুষ্ঠান দেখে। খালি পায়ে মশার কামডের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য পায়ে ভাল করে কাদা মেখে নেয়।

মুক্ত এলাকায় লোকের এমনই শিল্পপ্রীতি। তারা এই শিল্পকে এত ভাল-বাসে যে তার জন্য যে কোন রকম কষ্ট সহ্য করতে, এমন কি মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত। শত্রু সৈন্যের বোমার আঘাতের আশঙ্কা সত্ত্বেও তারা দশ-পনের কিলোমিটার পথ হেঁটেও সপরিবারে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

১৯৬৬ সালের টেট্ উৎসবে লঙগাঙের শিল্পসংস্থা কুড়ি হাজার দর্শকের সামনে অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। জায়গাটা ছিল সায়গন থেকে পনের কিলোমিটার দূরে। অর্ধেক দর্শক এসেছিল সহর থেকে। তাদের মধ্যে ছিল অনেক সরকারী কর্মচারী—এমন কি পুতুল সরকারের সৈন্যরাও ছিল। সায়গনের পুতুল সরকার কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানেও এত লোক হত না। কারণ অধিকাংশ লোক মার্কিন সংস্কৃতির প্রভাবান্বিত এবং যুদ্ধের উপযুক্ত নাচ-গান-নাটকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

পাঁচ-সাত জন ক'রে শিল্পী বাদ্যযন্ত্র, টুকিটাকি জিনিসপত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে দলে দলে বিভক্ত হয়ে দেশের সমস্ত প্রান্তে হয় সৈন্য দলের পিছু পিছু, নয়ত গেরিলাদের লড়াই-এর স্থানে, অথবা জনগণের কর্মক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ায়। কখনও মাটির নীচে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়, যোগাযোগকারী ট্রেঞ্চের মধ্যে দিয়ে এক

স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে এবং এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যায় ; বন্দুকধারীদের লক্ষ্যভেদের সামনে গিয়ে অনুষ্ঠান করে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, তারা শুধু শিল্প-সংস্কৃতি নিয়েই থাকে না—দুটি অনুষ্ঠানের মধ্যের ফাঁকটুকুতে লড়াই করে, আশ্রয়ের জন্য ট্রেঞ্চ খোঁড়ে, যোদ্ধাদের জন্য খাবার তৈরী করে, কাপড়-চোপড় কেচে ঠিক করে দেয় এবং আহতদের সেবাও করে। অবস্থানুসারে পঞ্চাশ থেকে সত্তর জনের দল বয়েও নানারকম তথ্য ভাণ্ডার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। লেখক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, চলচ্চিত্রশিল্পী, গায়ক, নাচিয়ে, অভিনেতারা সকলেই যোদ্ধার জীবনযাপন করেন, সকলেই চেষ্টা করেন যতদূর সম্ভব নিজেদের শিল্পী-জীবনকে এই বৈচিত্র্যময় ভয়ঙ্কর জীবনের সঙ্গে বাস্তবানুগ করে তুলতে।

প্রায়ই দেখা যায়, তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রেই বেশি অনুপ্রাণিত হন কবিতা, গান, নাটক, স্কেচ প্রভৃতি লিখতে এবং আঁকতে। ঐ কুচিতেই হুয়েন্ মিন্হ সেইও "চল আমরা পথে নামি" কবিতাটি রচনা করেন ; নৃগুয়েন ভু আঁকেন তিনটি স্কেচ—'মাটি' (Land), 'জল' (water) এবং 'বসন্ত' (Spring)—যে-গুলোর মধ্যে ফুটে উঠেছে সমস্ত মানুষের লড়াই-এর এবং জয়লাভের অনমনীয় মনোভাব এবং দৃঢ় প্রত্যয়। সম্প্রতি নৃগুয়েন ভু তাঁর নাটক "গেরিলা মেয়ে" শেষ করেছেন। কুচির একটি মেয়ের বীরত্বপূর্ণ লড়াই-এর কাহিনী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ঐ নাটক লেখেন। মেয়েটি তার অঞ্চলের লোকজনের সহায়তায় একটি মার্কিন ব্রিগেডকে ঘিরে ফেলেছিল। মার্কিনীদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে এবং ঐ পাগলা মেয়েটির দ্বারা ভীত আমেরিকানদের চিত্র অঙ্কিত করে নাটকটির মধ্যে তীব্রতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন ভু।

সিনেমা কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েও যোদ্ধাদের খুব কাছে কাছে ঘুরে বেড়ান। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় রে নি, ভো থি মো, নৃগুয়েন থি গাও প্রমুখ যোদ্ধাদের ছবি তুলেছেন তাঁরা। এমন কি শত্রু অধিকৃত শহরে ঢুকে রাজনৈতিক ছবি তুলেছেন। একবার একজন ক্যামেরাম্যান শত্রুপক্ষের বিমান ঘাটিতে ঢুকে পড়েন বিমান ওঠানামার ছবি তুলতে। যে অবস্থায় ঐ রকম ছবি তোলা হয় শিল্পের দিক দিয়ে উচ্চস্তরের না হলেও এগুলোর তথ্যমূলক এবং ঐতিহাসিক মূল্য তুলনাহীন। আন্তর্জাতিক উৎসবে এদের কোনো কোনো ছবি পুরস্কৃতও হয়েছে। "ডন জোয়াই-এর যুদ্ধ" (The Battle of Dongxoai) নামক ছবিটি তো লাইপ্‌জিগের (Leipzig) উৎসবে স্বর্ণ পদক পেয়েছিল।

১৯৬৭ সালের জানুয়ারিতে যখন আমেরিকানরা দশ হাজার অধিবাসী

অধ্যুষিত বেন্‌সুক (Bensuc) শহরটাকে বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করার অভিযান চালায়, তখন মুক্তিফৌজ এবং জনগণ তীব্র লড়াই করে এবং তারপর গ্রামের অধিবাসীরা ফিরে আসে শহরটাকে পুনর্গঠন করতে। এবং সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত শিল্প-সংস্থাও এসে উপস্থিত হয় এবং "মাটি"(Land) নাটকটির অভিনয় জনগণের মধ্যে উদ্দীপনা জাগায় এবং শহরে থাকার মনোবল দৃঢ়তর করে।

জনগণ শুধুমাত্র অনুষ্ঠান দেখেই তৃপ্ত নয়। তারা নিজেরাও ছোট ছোট শিল্প ও সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে তোলে এবং নিজেরাই নাটক তৈরী ক'রে তা অভিনয় করে। মুক্ত এলাকার সাধারণ মানুষ তাদের অনুভূতি, ঘৃণা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার তীব্র প্রেরণায় এক বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়-তাও অনুভব করে থাকে। শিল্প-সংস্কৃতি তাদের কাছে একটা জরুরী প্রয়োজনীয় বস্তু। স্বাধীনতার সংগ্রামে শৈল্পিক অভিব্যক্তি যেন তাদের কাছে অবিচ্ছেদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লঙ আন্ প্রদেশের একটি গ্রামের কথাই ধরা যাক। ম্যাকনামারা সায়-গনের সংলগ্ন ঐ প্রদেশটিকে বেছে নিয়েছিল 'গ্রামগুলি ঠাণ্ডা করা'র প্রকল্পের প্রধান অঞ্চল হিসেবে। ফলে গ্রামটি বার বার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ে-ছিল। তবুও এর তিন তিনটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ছিল। একটি দল যুবকদের এবং অপর দুটি ছেলেদের নিয়ে; এরা যেখানে খুশী সে বাড়ির উঠোনেই হোক বা রাস্তার উপরেই হোক যখন তখন কেরোসিনের আলো জ্বেলে ছোট খাটো মঞ্চ তৈরী ক'রে অনুষ্ঠান করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকত। এমনকি যখন প্রদেশটির গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি শত্রুর নিয়ন্ত্রণে এবং সমস্ত অধিবাসী প্রায় বন্দী, ঐ সাংস্কৃতিক সংস্থা সেখানেই তাদের অনুষ্ঠান করত। তাদের ১৬৪টি দফার মধ্যে প্রায় ৭৬টি স্থায়ী শিল্পীদের রচনা।

লোকদের মধ্যে জয়ের সংবাদ দেওয়ার দরকার হলে, অথবা ফ্রন্টের নির্দেশ জানাবার প্রয়োজন হলে কিম্বা ক্রোধ বা উত্তেজনা সৃষ্টির দরকার হলে শিল্পীরা গান গেয়ে ছবি এঁকে, নেচে এবং উৎসাহিত দর্শকদের সামনে অভিনয় করে বেড়ায়। মহড়া দেওয়ার ব্যাপারে তারা মাত্র কয়েকদিন যে-কোন জায়গায় জড়ো হয়ে এক ঘন্টা সওয়া-এক ঘন্টার মধ্যে তা সেরে নেয়। একবার একদল শিল্পী একটা গ্রামে এসেছিলেন। আগের দিন রাত্রে সে গ্রামের উপর বোমা প'ড়ে একটি পরিবারের সাতজন মারা যায়। শিল্পীরা সেখানে এসে প্রথমে সে জায়গাটি দেখে আসেন এবং সেখানকার লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তারপরই প্রায় হাজার দর্শকের সামনে ছোট্ট নাটক "রক্তের ঋণ" অভিনয় করেন। দর্শকরা

অভিনয়ে উত্তেজিত হয়ে শত্রুর প্রতি ঘৃণায় কাঁপতে থাকে। যোদ্ধারা ক্রোধে চীৎকার করে ওঠে "স্বদেশবাসীদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ নাও, ইয়াংকিদের মৃত্যু দাও।" সজল চোখে সমস্ত জনগণ নাটকটি দেখে। উৎসবে এবং বিবাহ অনুষ্ঠানেও এই সব শিল্পীগোষ্ঠী সেবা করে থাকেন জনগণের।

শিল্প-সংস্কৃতির এই বিরাট আন্দোলনই শ্রেষ্ঠ লেখক ও শিল্পীদের জন্ম দিয়েছে। তাঁরা আজ সমগ্র দেশে প্রখ্যাত। এদের কারোর কারোর লেখা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং তাঁরা দেশের বাইরেও খ্যাতিমান হয়ে উঠেছেন।

যখন ফরাসী-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম আরম্ভ হয়, তখন আজকের বিখ্যাত সাহিত্যিক গিয়াংনামের বয়স মাত্র ষোল। তিনি প্রথম কাজ করেন থানওয়া প্রদেশের তথ্য সরবরাহ সংস্থায়। সেখানকার মাটি ছিল অনুর্বর এবং জীবন ছিল কঠোর, আর খাদ্য ঘাটতি ছিল চিরস্থায়ী ব্যাপার। তারপর এল আমেরিকার আধিপত্য। পুতুল সরকারের অন্তর্ভুক্ত শহরগুলোতে তিনি যথাক্রমে মোটর চালক, রাবার খেতের কর্মী, ব্যবসায়ী সংস্থার হিসাব রক্ষক প্রভৃতি হিসাবে কাজ করেন। তিনি গণযুদ্ধেও যোগ দেন আবার কবিতাও লেখেন। বড় লড়াই-এ যোগদানের সময় তাঁর স্ত্রী এবং পাঁচ বছরের শিশু জেলে আটক থাকেন। ১৯৬৫ সালে মার্কিনীরা কুচি অঞ্চলকে পরিষ্কার রাখার জন্য বিরাট অভিযান চালায়। গিয়াংনাম তখন সেখানে এসে "আগুনের দেশ" (Land of Fire) শীর্ষক প্রবন্ধটি লেখেন। তারপর তিনি কোয়াং-নামের যোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন। তারা তখন দানাঙের মার্কিন মেরিনকে ঘিরে রেখেছিল। সেই অবস্থায় তিনি অনেকগুলি কবিতা এবং গল্প লেখেন। পরে তিনি সায়গনের কাছাকাছি লোগান প্রদেশে ফিরে আসেন এবং স্থানীয় পত্রিকায় কাজ করেন। প্রাচীন কবিতা সংকলনই তাঁর কাজ ছিল। 'যুদ্ধক্ষেত্রে' (At the Front) নামক গল্পে তিনি লোগান-শিল্পীদের বীরত্বের কাহিনী তুলে ধরেছেন।

একবার আশ্রয়স্থল থেকে তিন কিলোমিটার দূরে একটা বোমা ফাটে, তার ঘণ্টাখানেক পরে যখন তিনি লোগানের শিল্পীদের সঙ্গে খাবার খাচ্ছিলেন সেই সময় আর একটি বোমা তাঁর বাড়ির উপর পড়ে এবং বাড়িটি ভেঙে পড়ে। জিনিসপত্র ভেঙে চুরমার হয় এবং কাপড়ে আগুন ধরে যায়। গিয়াং তাঁর বন্ধুর কাছে লেখা এক চিঠিতে লিখেছেন, "আমাদের সাথীরা কোন রকম উত্তেজনা দেখায় নি ; এমন কি মেয়েরা নিরাপদ আশ্রয়ও খোঁজে নি। আমরা তাদের অসাবধানতার জন্য সমালোচনা করেছিলাম। তুয়েত্ একজন অভিনেত্রী এবং

লেখক। তিনি আমাকে বললেন, "আমরা আশ্রয়ে যাব তখন, যখন বেশ ভাল ঘুমের দরকার। বোমা তো আর সব সময়ই পড়ছে না আমাদের উপর।" তুয়েত এবং তার এক সাংবাদিক বন্ধু একবার আশ্রয়ে ছিলেন। তখন সেখানে একটা নাপাম্ বোমা পড়ল। নহান্ বলল, 'পাঁচ দিন পরেও আমাদের মনে হয়েছিল বুকটা জ্বলে গেল এবং নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে পেট্রলের গন্ধ পাচ্ছিলাম।' এরপর কয়েক মাস ধরে তাদের দেখাশোনা করতে হয়েছিল।"

দক্ষিণ ভিয়েতনামের লেখক ও শিল্পীরা এইভাবেই তাঁদের জীবন যাপন করেন। অন্যান্য যোদ্ধাদের মতই তাঁরাও যোদ্ধা।

১৯৪৫ সাল থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণ মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে আসছেন। সাধারণ যোদ্ধা কিম্বা দলনেতা গেরিলা কিম্বা লেখক কেউই বেতন পান না সকলেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাস করেন এবং তাদের মতই মাঠে-ঘাটে খেত-খামারে কাজ করেন, ফসল ফলান, জনগণের সুখ-দুঃখের অংশীদার তাঁরা। অন্যান্য লোকের মতই শিল্পী-সাহিত্যিকরাও তাদের কাজের সময় মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করে নেন—প্রথম কাজ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ট্রেঞ্চ খোঁড়া, নিচের আশ্রয়গুলো বসবাসের জন্য এবং সভাসমিতি করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ট্রেঞ্চগুলোর জটিল ব্যবস্থা যোগাযোগ সম্পন্ন করে। যেখানেই যাওয়া যাক প্রথম কাজ হচ্ছে ট্রেঞ্চ খোঁড়া। দ্বিতীয় কাজ হল ধান, জোয়ার, সেনিয়াক, মাছ, আলু প্রভৃতি উৎপাদন করা এবং ফাঁদ পাতা। ঐ দুটো কাজ করার পর যদি সময় থাকে তবে এখানকার লেখকরা লেখেন। যে জায়গাগুলোর মাটি অনুর্বর অথবা যে অংশের অধিকাংশ স্থান শত্রুর দখলে, সেখানে খাদ্য সরবরাহ একটা সমস্যা।

'জানু বৃক্ষের বন' (The Xanu wood) গল্পের লেখক নগুয়েন ট্রাং থানৃহ, 'প্রত্যাবর্তন' (Coming Back) গল্পের লেখক ফন্ টু (Phon Tu), নগুয়েন চি ট্রাং যিনি 'মাক গ্রামের চিঠি' (A letter from Muc village) নামক গল্পটি লিখেছেন এঁদের প্রত্যেককে প্রায় ছয় মাস করে ধান চাষ এবং মিষ্টি আলু উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত থাকতে হতো। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত বিখ্যাত কবি ফন্ মিন্হ দাও (Phan Minh Dao) যিনি বেশ একটা কঠিন অঞ্চলে কাজ করেছিলেন তাঁকে দীর্ঘ কয়েকমাস গাছের পাতা এবং গাছের শিকড় খেয়ে কাটাতে হয়। ঐ রকম পরিস্থিতিতে যে সব সৃষ্টি তাঁরা করেছেন স্বভাবতই সেগুলি জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং উজ্জ্বল আশাবাদের প্রতিচ্ছবি। আর সেই কারণেই সেগুলো সাধারণ মানুষ এবং যোদ্ধাদের প্রাণে

অনুপ্রেরণা যোগাতে সক্ষম হয়ে উঠেছে এবং জীবনযুদ্ধে তাদেরকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পেরেছে।

উঁচু উপত্যকা এলাকায় লবণের অভাব। কিন্তু ন্‌গুয়েন চি ট্রাংকে 'মাক গ্রামের চিঠির' মতো গল্প লেখা থেকে বিরত করতে পারে নি। ঐ গল্পে তিনি দেখিয়েছেন, সামান্য একটা রাইফেলের সাহায্যে সেখানকার অধিবাসীরা কেমন করে শত্রু বিমান ভূপাতিত করেছিল এবং কেমন করে তারা বোমারু বিমানের ভীতিকে অতিক্রম করতে পেরেছিল। ১৯৬৫ সালে ঐ গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পর সমগ্র উপত্যকা এলাকার গ্রামগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল মাক গ্রামের সমকক্ষ হওয়ার জন্য।

জনগণের সঙ্গে উৎপাদনের কাজে, বিপদে-আপদে এবং লড়াই-এর আনন্দে অংশ গ্রহণ করে লেখকরা অনন্ত সম্পদে সমৃদ্ধ বাস্তব জগতের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আন্‌হ ডাক্ (Anh Duc)-এর লেখা হন্ দাত্ (Hon Dat) উপন্যাস সেদিক থেকে সার্থকতার দাবী রাখে। এই উপন্যাস লেখার আগে তিনি বহু বৎসর মেকং ব-দ্বীপের পশ্চিম এলাকায় সংগ্রামী জীবন যাপন করেন। সেই সময় তাঁর কাজ ছিল একটা স্থানীয় সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা, স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রবন্ধ রচনা, একটি ছাপাখানা পরিচালনা এবং কাগজ সরবরাহ করা। তাঁর ছাপাখানাটি এবং পত্রিকা অফিস ছিল ভ্রাম্যমাণ। কারণ বোমা পড়ার সম্ভাবনা থাকায় একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতে হতো। যখন অবসর পেতেন, তখনই উপন্যাস লিখতেন। দশ বছর বয়স থেকেই প্রায় কুড়ি বছরের বেশি সময় তাঁকে বোমা এবং গোলাগুলির মধ্যে বাস করতে হয়েছিল। তাঁর উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণ (প্রায় ১,০০,০০০ কপি) বিক্রি হয়ে যায়। হ্যানয়ে পুনর্মুদ্রণ হয় আরও হাজার হাজার কপি। এই উপন্যাসখানি আজকে বহু পরিচিত।

ন্‌গুয়েন ডাক্ পুয়ানের মত লেখককেও ছয় বছর সায়গনের জেলে কিম্বা তাঁবুতে কাটাতে হয়েছে আর সেখানে আমেরিকান উপদেষ্টারা বিপ্লবী যোদ্ধাদের মনোবলকে ভেঙে দেওয়ার জন্য এবং তাদের আদর্শকে অস্বীকার করানোর জন্য এমন কোন নির্যাতন নেই যা তাদের উপর চালায় নি। নির্যাতনকারীরা একদিকে ভয়ঙ্কর দৈহিক অত্যাচার চালিয়েছে, অপরদিকে তাদের উপর নৈতিক নির্যাতনও চালিয়েছে সূক্ষ্মভাবে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে শত শত স্ত্রী-পুরুষ এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬৩ সালের সায়গন এলাকার আন্দোলন থুয়ানকে সাহায্য করেছিল মুক্তি পেতে। তাঁর গল্প 'বিজয়ী'তে

(The victor) সহজ স্বচ্ছ ভাষায় তিনি বর্ণনা করেছেন সেইসব অত্যাচারের কাহিনী। তাতে তিনি একদিকে দেখিয়েছেন যে, মানুষ কেমন করে সমস্ত বিবেক হারিয়ে পশুতে পরিণত হয়েছে, অপরদিকে বিপ্লবীরা আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কেমন করে ঐসব নিষ্ঠুরতম অত্যাচার প্রতিরোধ করেছে। ঐ গল্পটি সেদিক থেকে অপূর্ব, অতুলনীয় বলেই মনে হয়।

চিত্রশিল্পও ঠিক ঐ ভাবে গড়ে উঠেছে সেখানে। অনেকে ভাবতে পারেন বোমা ও গোলাগুলি বর্ষণের মধ্যে বনে জঙ্গলে কিম্বা মাটির নিচের আশ্রয়ে কী করে চিত্রাঙ্কন সম্ভব। কিন্তু তবুও এটা বাস্তব সত্য, অন্তত দক্ষিণ ভিয়েতনামের সংগ্রামী শিল্পীদের পক্ষে যে, জনগণ ও যোদ্ধাদের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে চিত্রশিল্পীরা পিঠে ক্যাম্বিস বা চামড়ার ব্যাগ ঝুলিয়ে দলের সঙ্গে সঙ্গে চলেন এবং সুযোগ-সুবিধা পেলেই ঈজেল খাড়া করে আঁকতে আরম্ভ করেন। তা ছাড়া যোদ্ধারাও তাদের জিনিসপত্র বইতে সাহায্য করেন এবং তাঁদের আঁকবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মাটিতে খাল কেটে নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করে দেন। শিল্পীরাও প্রতিটি চলার পথে বিশ্রামের জন্য নির্ধারিত স্থানে তাঁদের আঁকা ছবিগুলি টাঙিয়ে দেন তাঁদের দেখানো এবং মতামত নেওয়ার জন্য। প্রত্যেক যোদ্ধা এবং ইউনিটের নিজস্ব প্রিয় শিল্পী থাকে। তাঁদের সাহায্যে যোদ্ধারা আঁকতে শেখেন। সম্প্রতি লিবারেশন পাবলিশিং হাউস ছয়জন শিল্পীর আঁকা ছবি ছাপিয়েছেন। তাঁরা হলেন কো টান লঙ চাও, লে তন্ চুয়াং, হিউয়েন কুয়াং ডং, থাই হা, লে হঙ হাই এবং নুগুয়েন তন কিন্হ। প্রত্যেকটি ছবিতে—তা সে স্কেচ, জলরঙ বা তৈলচিত্র যাই হোক না কেন—শিল্পীর ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট এবং এমন কি, তার মধ্যে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রামী মনোভাব আরো বেশি করে প্রোজ্জ্বল। যোদ্ধা, গেরিলা, নারী, শিশু যারাই লড়াই-এ অংশ গ্রহণ করেন তাদের মুখগুলি যেন এইসব ছবিতে জীবন্ত। দৃশ্যগুলি গভীর ভালবাসা নিয়ে চিত্রিত। যে কেউ দেখলেই অনুভব করবেন—এমনই একটি দেশ, একটি জাতি যাঁরা জীবনের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ।

এদেশের একজন লেখক বলেছেন, "বীর যোদ্ধাদের দেখা পেতে হলে কেবলমাত্র ঘরের বাইরে এলেই চলবে।" একথা খুবই সত্যি যে, মার্কিন আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণের যুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বীরত্ব—তা শুধু সশস্ত্র বাহিনীর দিক থেকেই নয়—সমগ্র জনগণের দিক থেকেও।

লেখকদের কাজ হচ্ছে সেই সমস্ত উপযুক্ত লোকদের খুঁজে বের করা যাঁরা সত্যি সত্যি প্রশংসার যোগ্য, যাঁদের দৈনন্দিন জীবন উল্লেখযোগ্য কাজে পরিপূর্ণ। ফলে কাহিনীর বিষয়বস্তুর অভাব হয় না। সাধারণ লোক দূরের পিতামাতা বা বন্ধুবান্ধবের কাছে যখন লিখে জানায় যে সে কী কী করেছে, তখন তাই হ'য়ে ওঠে 'দক্ষিণ ভিয়েতনামের চিঠি'-র মত চমৎকার পুস্তক। নগুয়েন ভান ত্রই-এর বিধবা স্ত্রী যে কাহিনী লিখেছেন তাঁর স্বামীর সঙ্গে শেষ কটা দিন কাটানোর সম্বন্ধে তাতেই হয়ে উঠেছে প্রকৃত সাহিত্য। [তাঁর লেখা 'As he was' বা 'The way he lived'—বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে]। লেখকদের একমাত্র কাজ ঐ সমস্ত বীরাঙ্গনাদের জীবনের দিকে সহৃদয় দৃষ্টিতে ফিরে চাওয়া। ছয় সন্তানের জননী এবং দক্ষ গেরিলা শ্রীমতী উতটিচ্ (Ut-Tich) কিম্বা তা থি খিউ নামে একটি যুবতী মেয়ে, যে অনেক গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিয়েছে—এদের জীবন যে কোন সময় সুন্দর গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। এখানে শিল্পের মূল জীবনের গভীরে, জীবন থেকেই এর বিকাশ, বিনিময়ে সে জন্ম দেয় প্রতিদিনের সংগ্রাম।

মুক্তিফৌজের একটি ইউনিটের কম্যাণ্ডার ক্যুয়াক হান্‌হ—যিনি এক ব্যাটেলিয়ান আমেরিকান সৈন্য ধ্বংস করেছিলেন—মৃহাডো বঙট্রাঙ যুদ্ধে—সৈন্য বিভাগের শিল্পী সংস্থাকে লিখেছেন, "এ জয় সম্ভব হয়েছে যোদ্ধাদের সাহসের জন্য। কিন্তু সৈনিক শিল্পী সংস্থার অবদানও এর পিছনে যথেষ্ট রয়েছে। কারণ তাঁরাই আমাদের মৃত ব্যক্তিদের প্রতিশোধ নেওয়া এবং দেশকে মুক্ত করার দৃঢ় মনোভাবকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছেন।"

কাউ চাও নামে একজন পদাতিক বাহিনীর যোদ্ধা—যার ইউনিট বহু যুদ্ধে জয়লাভ করেছে, যে-সমস্ত শিল্পী তার ইউনিটের সামনে অভিনয় করেন তাদেরকে এক চিঠিতে লেখেন: "আপনাদের সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর আমাদের ইউনিট ফু লোই (Phu Loi) বিমান ঘাঁটি আক্রমণের নির্দেশ পায়। তার পর আসে বাউবাঙ (Baubang) এবং দাতকুয়াক (Datcuoc) যুদ্ধ। আমাদের অধিকাংশ সাথী হাইকমাণ্ডের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছে, আবার মিলিটারী পদকও লাভ করে পুরস্কৃত হয়েছে। কিন্তু আমরা আপনাদের ভুলতে পারি নি। আমরা মনে করি আপনাদের গান এবং নাটক আমাদের যুদ্ধে তীব্রভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তার জন্য আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।"

লেখক ও শিল্পীদের কাছে সুন্দরতম পুরস্কার এই ধরনের চিঠিপত্র এবং তাঁরা

তা প্রায়ই পেয়ে থাকেন। মুক্তিফৌজের যোদ্ধারা এবং গেরিলারা এবং যারা সেনা বাহিনীতে যোগ দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং যারা পিছনে আসছেন—সকলেই এই সব লেখক-শিল্পীদের ঐ সব চিঠি লেখেন এবং তাঁদের মতামত জানান। যখন কোনো শত্রু ঘাঁটি তাঁরা আক্রমণ করেন তখন বিজয়চিহ্ন স্বরূপ নিয়ে আসেন গীটার অ্যাকর্ডিয়ান এবং হেলিকপ্টারের কিম্বা প্যারাসুটের অংশ বিশেষ যা দিয়ে শিল্পীরা তাদের সাজসরঞ্জাম তৈরী করতে পারেন এবং সেগুলো তাঁরা শিল্পীদের কাছে পাঠাতে ভোলেন না। সায়গনের যুবক-যুবতীরা রেডিও মারফত শুনেই বা হোক গোপনে গিয়াং নামের মত কবিদের রচনা পড়েই হোক, মুক্ত এলাকায় যোগ দিয়েছে এবং লেখকদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কিম্বাতাদেরকে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য তাদের উৎসুক হতে দেখা গেছে।

আমাদের এক সাথী বলেছেন, সেই ব্যক্তি লেখক বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য যিনি জানেন জনগণের দেশাত্মবোধক যুদ্ধকে শক্তিশালী করতে কী করে কলম ধরতে হয়। ঠিক এক শতাব্দী আগে যখন ফরাসী বাহিনী ভিয়েতনাম জয় করতে আরম্ভ করে দেশপ্রেমিক পণ্ডিতগণ, যাঁদের মধ্যে নৃগুয়েন দিনৃহ চিয়েন ছিলেন শ্রেষ্ঠ, মনে করতেন সাহিত্যের মহৎ লক্ষ্য হচ্ছে— সংগ্রামের আবেদন সৃষ্টি করা। আজকের লেখক এবং শিল্পীগণ সেই সুন্দর ও মহান ঐতিহ্যকে সমানে বহন করে নিয়ে আসছেন বর্তমানের বৈপ্লবিক বিষয়বস্তুকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলে। ডলারের লুণ্ঠন এবং প্রলোভনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভিয়েতনামের শিল্প-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ জনগণ স্বাধীনতা ও মুক্তির সুস্পষ্ট পথ বেছে নিয়েছে। সংগ্রামের মাধ্য দিয়ে যে সৃষ্টির আবির্ভাব তা উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ।

সরোজ মুখোপাধ্যায়

শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত একথা শিক্ষিত বিদগ্ধ সমাজের একটি শক্তিশালী অংশ কিছুতেই স্বীকার করতে চান না। শুধু স্বীকার করেন না, তাই নয়। তাঁরা এ বিষয়ে ব্যাপক বিস্তৃত প্রচারের মাধ্যমে জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকেন। তাঁদের মতে শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি এক একটি সম্পর্কহীন পৃথক সত্তা। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা এটা বিশ্বাস করেন না। ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে-শুনে এঁদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই বিষয়টি প্রচার করেন। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার সময় তাঁরা যে এই বিষয়গুলির পরস্পর সম্পর্ক বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত তা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। তা না হলে কি করে তাঁরা কোন্ যুক্তিতে বোঝাতে পারেন—একজন কংগ্রেস (আই) এম-এল-এ শিক্ষাব্রতী অথবা কংগ্রেস (আই)-এর একজন লোকসভা আসনের প্রার্থী কলেজের অধ্যক্ষ রাজনীতির উর্ধ্বে, অথচ বামফ্রন্টভুক্ত কোনো এম-এল-এ শিক্ষাব্রতী অথবা অধ্যাপক-অধ্যক্ষ হলেই তিনি বা তাঁরা রাজনীতি করছেন? এই সত্যের অপলাপের ভিত্তিতে এই বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ তাঁদের প্রচারকার্য চালিয়ে যান। এবং তা করতে পারেন অতিশয় নির্বিবাদে। কারণ অসত্যের বেসাতিকে সম্বল করেই বৃহৎ সংবাদপত্র, বড় বড় লেখক সাহিত্যিকগোষ্ঠীর একাংশ তাঁদের চিন্তাধারা প্রকাশ করেন।

শিক্ষা, সংস্কৃতি কখনও কোনো যুগে রাজনীতির উর্ধ্বে ছিল না। এখনও নেই। শিক্ষা-সংস্কৃতি তার জন্মলগ্ন থেকেই সমসাময়িক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই উদ্ভূত হয়েছে। সমাজের উপরি-কাঠামোগুলি সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমি থেকে উত্থিত হয়। আবার সেই উপরিকাঠামোগুলি সামাজিক ভিত্তিভূমিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। এই পারস্পরিক যোগসূত্র এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ ছাড়া এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আসতে পারে না। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সত্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে না।

মানুষের মনোভাব, আদর্শ, অভিমত এক কথায় মানুষের চেতনা তার বাস্তব অবস্থানের প্রতিটি পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। তার সামাজিক সম্পর্ক, তার সামাজিক জীবনের প্রতিটি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক ভাবের অভিব্যক্তি, তার মতামত ও আদর্শেরও পরিবর্তন হয়। মানবসমাজের মতামত, মতাদর্শগত অভিমতের ইতিহাস তো এটাই প্রমাণ করে। বাস্তব উৎপাদনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিগত ও মানসসঞ্জাত উৎপাদনেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। মানব সমাজের সমগ্র ইতিহাসটা এ ছাড়া আর কিসের প্রমাণ দেয়? এ কথাগুলি বলেছেন কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক্ এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইশতেহারে ১৩৭ বছর আগে।

শিক্ষা, সংস্কৃতি মনোজগতের সবকিছুই সামাজিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আবার এই সামাজিক বাস্তবভিত্তির উপর সমসাময়িক রাজনীতির প্রতিষ্ঠা। তাই এ সমস্তগুলির মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক অস্বীকার করাটা বাতুলতা মনে হতে পারে। কিন্তু শাসকশ্রেণী শ্রেণী-শোষণের তাগিদে, জনগণের উপর শাসন বজায় রাখার তাগিদে এই সত্যের বিরুদ্ধে প্রচার করতে বাধ্য হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রেই ধরা যাক, অতি সাম্প্রতিক ইতিহাস কি বলে? ইংরেজ শাসকরা তাদের নিজস্ব শোষণের রাজনীতির তাগিদেই ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। রাজনীতির উর্ধ্বে সে ব্যবস্থা ছিল না। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব শিক্ষিত সমাজ। আরও পরে জাতীয় আন্দোলনের সময় জাতীয় কলেজ জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয় শুধু বাংলাদেশেই নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তেও। বিংশ শতাব্দীর বিশ দশক থেকে শিক্ষা ব্যবস্থায় বৃটিশ শাসকদের রাজনীতির সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলতে থাকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার। ভারতের জাতীয় শিক্ষা জাতীয় সংস্কৃতি ধ্বংস করতে চেয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। ভারতের শিক্ষিত সমাজ, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ শিক্ষিত গোষ্ঠী পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির ঐশ্বর্য-

টুকু আহরণ করে নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতিকে রক্ষা করার প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়েছেন। এ সংগ্রাম বড় কঠিন ছিল। অতীতের যেগুলি অপ্রয়োজনীয় যেগুলি সামন্তবাদী কুসংস্কার সেগুলিকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন আধুনিক সমাজের সুস্থ প্রগতিশীল বিষয়গুলিকে গ্রহণ করার লড়াই চলেছে অর্ধশতাব্দী ধরে। এই লড়াই রাজনীতি বিবর্জিত? শিক্ষা ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক জগত, সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি—সব কিছুর প্রতিটি ক্ষেত্রে লড়াই চলেছিল দুটি পরস্পর-বিরোধী রাজনীতিক আদর্শের মধ্যে—সাম্রাজ্যবাদের শোষণ আর জাতীয় মুক্তির আদর্শ। শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই—একথা যাঁরা বলেন তাঁরা কি এই ইতিহাসের বাস্তবতাকে অস্বীকার করবেন? এ কথাও মনে রাখতে হবে—বৃটিশ শাসকরাও সব সময়ে বলে এসেছেন—শিক্ষার ব্যাপারটা রাজনীতির উর্ধ্বে,আমরা ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্যই সব কিছু করছি।

এখনও কি সেই কথাই শুনছি না? শাসক দল কংগ্রেস (আই)-এর প্রতিনিধিরা বলছেন—আমরা যা কিছু করছি তা দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য, আমরা শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজনীতি আনতে চাই না ইত্যাদি ইত্যাদি। কংগ্রেস (আই) তাদের শাসন বজায় রাখার জন্যেই শিক্ষা-সংস্কৃতি নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখতে চায়। তাদের আদর্শ ও মতামতই তারা সাধারণ মানুষের উপর শোষিত শ্রমজীবী জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তাই বলা হয়—একটা কালপর্যায়ে একটা সমাজের স্তরে একটা ভৌগলিক অবস্থানে শাসকশ্রেণীর মতামত ও আদর্শই তদানীন্তন সমাজকে প্রভাবিত করে। শাসকশ্রেণীর শিক্ষা-সংস্কৃতিই সাধারণ সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতি হিসাবে বিরাজ করে। তারই বিরুদ্ধে শোষিত-বঞ্চিত মানুষকে লড়াই করে যেমন শাসনের পরিবর্তন ঘটাতে হয়, তেমনই শিক্ষা সংস্কৃতিতেও পরিবর্তন ঘটাতে হয়। একটা হয় শাসকশ্রেণীর আদর্শমুখী, অপরটি হয় শ্রমজীবী মানুষের জীবনধর্মী গণমুখী। এই পার্থক্য মুছে দিয়ে মূলগতভাবে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা রাজনীতির উর্ধ্বে, শ্রেণীর উর্ধ্বে—একথা প্রচার করা অর্থহীন শুধুই নয়, সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে তা মারাত্মক। বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ মহামতি লেনিন শ্লেষাত্মক ভাষায় তাই বলেছিলেন—শাসকশ্রেণীর এসব কথা নিছক ভণ্ডামি মাত্র। তিনি শিক্ষা-সংস্কৃতির স্বাধীনতা, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, প্রচারের স্বাধীনতা প্রভৃতি সম্পর্কে শাসক-শ্রেণীর প্রচারের বিরুদ্ধে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই "চরম ভণ্ডামি" শব্দগুলি ব্যবহার করেছিলেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে বেশ কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী আছেন যাঁরা বলেন তাঁরা নিজেরা রাজনীতির উর্ধ্বে। কথাটা কি সত্য কথা? কোনো একজন শিক্ষিত

বুদ্ধিজীবী নিশ্চয়ই নির্বাচনে ভোট দেন। শিক্ষার প্রাথমিক চেতনাই তো নাগরিক অধিকার ব্যক্তিগত ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে শেখায়। প্রাথমিক নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে কোনো শিক্ষিত লোক উদাসীন থাকতে পারেন না এবং থাকেনও না। প্রত্যেকে নিশ্চয়ই ভোট দেন। হয় শাসক-শ্রেণীর প্রতিনিধিকে, আর নয় তো শোষিত বঞ্চিত জনগণের প্রতিনিধিকে। নির্বাচনে এই ভাবেই রাজনীতির লড়াই হয়। যিনি নিজেকে নির্বাচনে নিরপেক্ষ বলেন, ধরে নিতে হবে রাজনীতি বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জনের মতো শিক্ষা-দীক্ষাও তাঁর হয় নি। এ রকম মানুষ খুবই কম। স্বাভাবিক ভাবেই একজন মানুষ যে কোনো কারণেই হোক একটা রাজনীতির অনুকূলে থাকতে বাধ্য। সুতরাং "রাজনীতির উর্ধ্বে" শব্দ দুটির কোন বাস্তব অর্থ নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কি দেখা যাচ্ছে? যাঁরা কংগ্রেস (আই)-এর শিক্ষাব্রতী ও নেতা তাঁরা যখন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত কোনো প্রশ্নে মতামত দেন সেটা রাজনীতির উর্ধ্বে। আর বামফ্রন্টভুক্ত কোন শিক্ষা-ব্রতী ও নেতা যখন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন বা মতামত উত্থাপন করেন তখন তা হয় রাজনীতির ব্যাপার। আশ্চর্য মনে হয় না কি? অথচ এই সুস্পষ্ট অসত্যটি দিবারাত্র প্রচারিত হচ্ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল সমস্যাটি কি? মূল সমস্যা হল: বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাবলী গণতন্ত্রীকরণ করার প্রয়াস চলছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রসম্মত সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থার ফলে যেহেতু কোনো কোনো বিশেষ ব্যক্তি এবং শাসক কংগ্রেসের "যা ইচ্ছে তাই" করার স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে, সেই কারণে এখানে "রাজনীতি" করা হচ্ছে বলে অপপ্রচার চলছে। যে গণতন্ত্রে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ ও ইচ্ছা পূরণ হবে না, সে গণতন্ত্র শাসকদল মানে না। গণতন্ত্র যতক্ষণ এবং যে যে ক্ষেত্রে যে পর্যন্ত শাসক ও শোষক শ্রেণীগুলির স্বার্থে আঘাত না দেয় বরং তা সিদ্ধির সহায়ক হয় ততক্ষণই ও সেই সেই ক্ষেত্রে তারা গণতন্ত্র মানে, অন্যথায় তারা তা মানবে না। এবং এখানেই স্বৈরতন্ত্রের জন্ম হয়। সেই কারণেই লেনিন বলে-ছিলেন—এদের কাছে গণতন্ত্রের বুলি চরম ভণ্ডামি। আবার এটাও সত্য যে একটা সময় পর্যন্ত, একটা স্তর পর্যন্ত শাসকদল গণতন্ত্র রক্ষা করে চলে। তাদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই গণতন্ত্রেরও প্রয়োজন। তাদের পথের বাধা দূরীকরণের জন্যও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তাদেরই করতে হয়। অতীতের সামন্তবাদের কোনো কোনো বিশেষ বাধা তারা দূর করতে চায়, তাই গণতন্ত্র দিয়ে তা তারা করে। আবার সামন্তবাদের কোনো কোনো ব্যবস্থা তারা জীইয়ে রাখে শ্রমজীবী মানুষের অগ্রগতিকে ঠেকাবার জন্য। সেই সব ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে সঙ্কুচিত করতে হয়। পূর্ণ গণতন্ত্র, জনস্বার্থবাহী

গণতন্ত্রকে তারা ভীষণ ভয় পায়। নিজেদের মুষ্টির ভিতরে রেখে গণতন্ত্রকে তারা কণ্ট্রোল করতে চায়। শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয় আলোচনার সময়,শিক্ষাব্যবস্থা গণতন্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে শাসক কংগ্রেস (আই) দলের প্রতিনিধিরা গণতন্ত্রকে ভয় পায়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক-সংস্থায় বামফ্রন্ট সমর্থকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে অর্থাৎ গণতন্ত্রকে মেনে নিতে পারছেন না বলেই তাঁদের কাছে এটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ যে কোনো সৎ শিক্ষিত সুসভ্য মানুষের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত সংস্থার সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে চলায় কোন হীনমন্যতা থাকতে পারে না। আমি, আমার ব্যক্তিত্ব ও আমার দল কংগ্রেসের স্বার্থ যদি প্রাধান্য পায় তাহলে সমস্যার সমাধান হবে কি করে? গণতন্ত্রসম্মত সমষ্টিগত সিদ্ধান্তের কাছে নতিস্বীকার করার মধ্য দিয়েই তো মানবসভ্যতার অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়। শিক্ষা রাজনীতির উর্ধ্বে—একথা বলে জোর করে শাসক দলের রাজনীতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে যাওয়ার পরিণামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

গণতন্ত্রের নিয়ম কানুন মানতে পারলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যার একদিনেই সমাধান হয়ে যায়। গণতন্ত্র মানতে গেলে নিজেদের ক্ষুদ্র ও দলীয় স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে না, সুতরাং এ সমস্যা জীইয়ে রাখাই শাসকশ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে অনুকূল। কিন্তু জনস্বার্থে বামফ্রন্টের সমর্থকরা তা হতে দেবেন কেন?

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাই। সংস্কৃতি নাকি প্রচারধর্মী হতে পারবে না। রাজনীতির উর্ধ্বে থাকতে হবে সংস্কৃতিকেও! সংস্কৃতির সৃষ্টি, শিল্পের সৃষ্টি তো হয়েছিল জনমানসে কোনো কোনো বিষয় প্রচার করার জন্যই। আদিম যুগ থেকে সংস্কৃতির নাচ-গান যাত্রা প্রভৃতি শিল্প কলার সৃষ্টির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—কোনো একটা বিষয়ে জনমনে ধ্যানধারণা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেই শিল্পের সৃষ্টি। মার্কস-এঙ্গেলসের কথায় শিল্প হচ্ছে মতাদর্শগত সংগ্রামের একটা মস্তবড় হাতিয়ার। শাসকশ্রেণী তার স্বার্থে শিল্প সৃষ্টি করায়। আবার শোষিত শ্রেণী-তার স্বার্থে শিল্প সৃষ্টি করে। শিল্পের সামাজিক চরিত্র, শিল্প মানুষের শ্রমের প্রতিফলন। সমাজের গতির ছাপ রেখে যায় শিল্প—এসব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে গেছেন মার্কসবাদী মনীষীরা। কোনো ক্ষেত্রেই শিল্পকে সামাজিক শ্রেণী-স্বার্থের উর্ধ্বে, রাজনীতির উর্ধ্বে কেউই স্থান দেন নি। শাসকদল শোষকগোষ্ঠী চিরদিনই বিভিন্ন পর্যায়ে বলে এসেছে—শিল্প-সংস্কৃতি রাজনীতির উর্ধ্বে। এটা না বললে তাদের শোষণের স্বার্থে সৃষ্টি শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি শ্রমজীবী মানুষের ঘৃণা জন্মাবে। সূক্ষ্ম শিল্পের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষকে বিভ্রান্ত করা,

বর্তমান ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ এই ধারণা জনমনে গ্রথিত করা—এ সবই শাসকগোষ্ঠীর শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সূক্ষ্মভাবে প্রচার কার্য চালাবার জন্য নানা কৌশলে শ্রমজীবী মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত হেনে বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে জীইয়ে রাখার প্রচেষ্টাই শাসকদলের শিল্প-সংস্কৃতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য। শ্রেণীসংঘাতে জর্জরিত সমাজে বড় বড় লেখক শিল্পী এমন শিল্প সৃষ্টি করেছেন, এমন কাব্য রচনা করেছেন যার ভিতর দিয়ে শ্রেণী-চরিত্র ফুটে বেরিয়েছে। আবার বড় বড় শিল্পী-লেখকরা তাঁদের শিল্প সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তদানীন্তন সমাজের বাস্তব জীবনকেও ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। শাসক-শ্রেণীর চাপের কাছে তাঁরা বাধ্য হয়ে শাসক গোষ্ঠীর আদর্শকেই লেখার ও শিল্পের মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন। গেটে, শিলার, বালজাক প্রমুখ বিখ্যাত লেখকদের শিল্প সৃষ্টির প্রশংসা করার সময়ও কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস শিল্পের এই শ্রেণী চরিত্রের কথা বলেছেন। এই দ্বন্দ্ব লেখক বা শিল্পীদের নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। সমাজের ভিতরকার দ্বন্দ্বই, তদানীন্তন সমাজ জীবনের স্ববিরোধিতাই তাদের রচনায় পরিস্ফুট হয়েছে। শেক্সপীয়ার, ডিকেনস্, থ্যাকারে, গেটে, পুশকিন, বালজাক প্রমুখ প্রসিদ্ধ লেখকদের বিষয়ে উল্লেখ করে মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছেন—সমাজ জীবনের বাস্তব প্রতিফলন তাঁদের লেখায় পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়, জীবনের সমাজের ভিতরকার মানসচিত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জটিল সমস্যার ভিতরে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণমূলক সৃষ্টিই তাঁদের লেখার বৈশিষ্ট্য। একটা বিশেষ যুগের সমাজ জীবনের বিভিন্ন সমস্যার এক একটি দিকের আবার বহুমুখী চরিত্রের সৃষ্টি এঁদের বৈশিষ্ট্য। তদানীন্তন সমাজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছবি পাওয়া যায় এঁদের রচনায়। সেই রচনায় উপকৃত হয়েছেন বহু রাজনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী। বাস্তববাদী লেখক-শিল্পীদের প্রশংসা করলেও মার্কস-এঙ্গেলস বরাবর একটা কথা বলতেন—শিল্প-সাহিত্যকে রাজনীতির উর্ধ্বে স্থান দিও না এবং শিল্পের এইতত্ত্বে বিশ্বাস করো না। বাস্তববাদী লেখক ও শিল্পীদের কাছ থেকে প্রগতিবাদী সৃষ্টি ও বিশ্বমানবতার দৃষ্টিভঙ্গি আশা করা উচিত। এঙ্গেলস তো একজন জার্মান লেখককে একবার লিখেছিলেন—"আমি কোনমতেই প্রচারমুখী কবিতা লেখার বিরোধী নই। একটি উদ্দেশ্য নিয়েই তো লিখতে হবে।"

সাহিত্য ও শিল্পকর্মের মধ্যে সেই যুগের তদানীন্তন আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক জাতি ও দেশের সংস্কৃতির মধ্যে, প্রত্যেক জাতির শিল্প সৃষ্টির মধ্যে সেই জাতির ও দেশের অধিবাসীদের, শোষিত মানুষদের জীবন ও সংগ্রামের ছবি

থাকেই। সুতরাং এর মধ্যে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উপাদানও কিছু কিছু থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। যদিও সে যুগের শাসক ও শোষকবৃন্দের সংস্কৃতি ও শিল্পের ছাপটাই এই সব লেখার মধ্যে প্রাধান্য পেয়ে থাকে, তথাপি এর মধ্য থেকে ভবিষ্যতের উপাদানগুলো আমাদের বের করে নিতে হবে শ্রমজীবীদের শিল্প ও কৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যে।

শ্রমজীবীদের তথা শোষিত বঞ্চিত জনগণের নিজস্ব সংস্কৃতি-কৃষ্টি সৃষ্টির গুরুত্ব সব সময় উপলব্ধি করা প্রয়োজন। শাসকদলের অথবা বর্তমান প্রচলিত সংস্কৃতিতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিল্প-সংস্কৃতি গড়ে তোলা একটা বিরাট রাজনৈতিক সংগ্রাম। এ সংগ্রাম খুবই শক্ত। প্রচলিত শিল্প সংস্কৃতির গতি ধারা বেয়েই চলতে হবে নতুন সৃজনের বাহিনীকে। যে নতুন শিল্প-সংস্কৃতি গড়ে উঠবে বা উঠছে সে সম্পর্কে লেনিনের নির্দেশ হচ্ছে—নতুন আসছে তাকে ছেড়ো না, হোক না সে প্রথম দিকে দুর্বল, নন্দনতত্ত্ব বা রচনা কৌশল অথবা শৈলী ও ভঙ্গিমার বিচার দিয়ে একে দেখো না। কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে পুরাতন, অতীত ও পরিপক্ক শিল্প-সাহিত্য-সংগীত নতুনের গতিপথ রুদ্ধ করে দাঁড়াবে। তারা নতুনকে পিছনে টানবে। এই অতীত ধীরে ধীরে নিজেই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় পড়বে এবং নতুনের প্রতিযোগিতার কাছে তাকে শিখতে হবে। তাই নতুনকে বিরাট শক্তি নিয়ে দ্রুততালে তার পরিবর্তনে সাহায্য করতে হবে। শ্রমজীবী জনগণের রাজনীতি ও মতাদর্শগত প্রভাবের ফলে নতুন গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিল্প-সংস্কৃতি গড়ে উঠবে।

রাজনীতির সঙ্গে শিক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য বন্ধনের কথাটা শোষক বুর্জোয়ারা অস্বীকার করে। আর শ্রমজীবী জনগণের প্রতিনিধি মার্কসবাদীরা তা অকপটে সাচ্ছন্দ্যে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে। শাসকের দল সত্যকে প্রকাশ করতে ভয় পায়, তাই সে ক্ষয়িষ্ণু। আর শোষিতের দল সত্যের উপরেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, তাই সে বর্ধিষ্ণু।

রাজনৈতিক আন্দোলন,
সংস্কৃতি,
ও সাংস্কৃতিক ফ্রণ্ট

দ্বিতীয় পর্ব

....

ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ

মার্ক্সবাদ ও সাহিত্য

(ক)

সাহিত্য এবং রাজনীতি

স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ভারতীয় সাহিত্যের বিকাশলাভে এক প্রচণ্ড উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে, ভারতে প্রত্যেকটি ভাষা তার জাতীয় কবি, কাহিনীকার সাহিত্য সমালোচক ইত্যাদির জন্ম দিয়েছে।

এইসব লেখকের মধ্যে একদল স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় অংশীদার ছিলেন; বৃহত্তর আর একদল সক্রিয় অংশ না নিলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। যাই হোক না কেন এদের সকলের নৈতিক সমর্থন, নির্দেশ ও উপদেশের আশায় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যান্য প্রথম সারির সংগঠনগুলি তাদের সর্বভারতীয়, প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক অধিবেশনের সময় সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ অধিবেশন সংগঠিত করতেন।

সেই কারণে, স্বভাবতই বিশ থেকে ১৯৩০-এর যুগে স্বাধীনতা আন্দোলনে বাম এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদের অনুকূলে ঝোঁক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য জগতেও তার প্রতিফলন ঘটল। স্মরণ করা যেতে পারে যে তখন এমন এক সময় চলেছে যখন বিশ্ব রাজনৈতিক মঞ্চে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুদৃঢ় উপস্থিতি ক্রমশ অনুভূত হচ্ছে। এই ঘটনা ভারতের শত সহস্র দেশপ্রেমিকের চিন্তা ও

কামনাকে প্রভাবান্বিত করতে লাগল। সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রী ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলি যারা বিশ দশকের গোড়ার দিকে আবির্ভূত হয়েছিল, তারা ছাড়াও ভারতীয় কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দও যুগ-প্রবর্তনকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যদিও ব্যাপারটা তাদের কাছে ছিল নেহাৎই একটা 'পরীক্ষা'—'রুশীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা মাত্র !'

ধনতন্ত্রের ইতিহাসে যখন বৃহত্তম সঙ্কট চলছে ঠিক তখনই সোভিয়েত পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯২৮-১৯৩৩) অভূতপূর্ব সাফল্য সমাজতন্ত্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি করল। এই সময় ফ্যাসিবাদের আবির্ভাব শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষেই নয়, বিশ্বের সমস্ত শান্তিপ্রিয় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামরত দেশের কাছেও গুরুতর বিপদের কারণ হিসাবে দেখা দিল। এ' ঘটনা আমাদের দেশের দ্রুত বর্ধমান বাম ও সমাজতন্ত্রী আন্দোলনে তাগিদ সৃষ্টি করল।

রাজনীতির ক্ষেত্রে এই যে সব ক্রমবিকাশ, সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটল। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম যুগ থেকে এর পার্থক্য হলো, সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুন এই র‍্যাডিক্যাল এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ব্যক্তিবিশেষ কোন লেখকের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। এ যুগে এই-সব ক্রিয়াকাণ্ড সংগঠিত আকারে একটি নির্দিষ্ট সংগঠনের রূপ নিল—যার নাম প্রগতি লেখক সঙ্ঘ।

ফ্যাসিবাদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণের বিরুদ্ধে ম্যাকসিম গোর্কী, আঁরি বারবুস এবং অন্যান্য বিশ্ববিখ্যাত ফ্যাসিবিরোধী মনীষীবৃন্দের দৃঢ় প্রতিরোধ সংগ্রামের আহ্বান এই সংগঠন গড়ে তুলতে এবং তার কর্মকাণ্ড পরিচালনায় প্রেরণা যুগিয়েছিল। এই সংগঠন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুন্সী প্রেমচাঁদ এবং সরোজিনী নাইডুর মতো বিখ্যাত সাহিত্যসেবীদের আশীর্বাদ লাভ করেছিল। এই সঙ্ঘের সবচেয়ে সক্রিয় কর্মীরা অবশ্য ছিলেন কমিউনিস্ট, কংগ্রেসী, সমাজ-তন্ত্রী এবং অন্যান্য র‍্যাডিক্যাল রাজনৈতিক দলের জঙ্গী কর্মীরা। আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ এবং ভারতের উপর প্রভুত্বকারী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে (ভারতীয় সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট সামন্তবাদ এবং অন্যান্য খুঁটি সহ) সাহিত্যকে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের ঘোষিত লক্ষ্য সামনে রেখে তাঁরা গঠন করলেন এই সঙ্ঘ এবং তার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁরা লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে সাহিত্য সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হলেন।

সেই কারণে বলা যায় যে এই লেখকগোষ্ঠী গান্ধীযুগীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন সেই অব্যবহিত পূর্বসূরীদের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন। পূর্ববর্তীদের মতোই এরা ভারতীয় সকল ভাষা ও সাহিত্যের পুনঃসৃজন, আধুনিকীকরণ এবং বিকাশের প্রক্রিয়াকে সাহায্য করেছেন। অবশ্য পূর্বসূরীদের থেকে যে পার্থক্য তাদের ছিল তা হলো, সাহিত্য ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে কোন পথে পরিচালিত করতে হবে সে সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট পরিপ্রেক্ষিত তাদের সামনে ছিল। তাঁরা এমন এক দর্শনে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন বিদেশী উচ্ছেদের সূত্রপাত ঘটিয়েই যার অবসান হবে না, পরন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষের বুকে এক নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের ইতিবাচক চিত্র রচনা করে আরো অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নব ভারতের এই মানসচিত্রটি স্বাভাবিকভাবেই সেদিন সোভিয়েতে যে ঘটনা ঘটেছিল সেই ঐতিহাসিক সমাজ, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতিগত বিকাশের আদর্শেই গঠিত হয়েছিল।

খুবই স্বাভাবিক, যাঁরা পুরনো রাজনৈতিক ধারায় বিশ্বাসী, যাঁরা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রাচীন ধ্যানধারণাকে আশ্রয় করে ছিলেন, সাহিত্যের এই নতুন ভাবধারাকে তাদের অধিকাংশই সুনজরে দেখেন নি। 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই শ্লোগান তুলে তাঁরা প্রগতিবাদী লেখকদের এই বলে অভিযুক্ত করলেন যে তাঁরা সাহিত্যকে রাজনীতির অবাঞ্ছিত পরিবেশে বিপথগামী করছে। প্রগতি লেখক সঙ্ঘকেও সেই কারণে 'সমাজের জন্য শিল্প' এই শ্লোগানের সপক্ষে তীব্র লড়াইয়ে নামতে হল। সাহিত্য জগতের একাধিক প্রখ্যাত ব্যক্তির আশীর্বাদ ও নৈতিক সমর্থন প্রগতি লেখক সঙ্ঘকে সাহিত্যের রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দের ক্রোধের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি। রাজনৈতিক সংগ্রামে সাহিত্যকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার দৃষ্টিভঙ্গি এইসব রক্ষণশীলদের অধৈর্য করে তুলেছিল।

যাই হোক এই প্রগতিবাদী আদর্শ ক্রমশ ব্যাপকতর সমর্থন পেতে লাগল। প্রগতি লেখক সঙ্ঘ (ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় গঠিত সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের অনুরূপ) সাহিত্যের তথাকথিত রুচিসম্পন্ন নর-নারীর মধ্যেই শুধু নয়, বৃহত্তর জনসমাজে প্রভাব বিস্তারের উপযোগী একটি শক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত হলো।

বলতে গেলে এই ধারা খুব অল্প সময়ই অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। প্রগতি লেখক সঙ্ঘ গঠিত হবার একদশক কালের মধ্যে এদেশের রাজনীতিতে

বিপুল অগ্রগতি ঘটে। ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনাকেই আমরা এখানে উল্লেখ করছি। স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতি লেখকদের মধ্যে এতাবৎ যে ঐক্য বর্তমান ছিল, এই পরিবর্তনে তা প্রচণ্ড আঘাত পেল। ক্ষমতা হস্তান্তরের অর্থ সম্পর্কে, ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের বাস্তবতা নির্ণয়ে এবং কোন পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ এগিয়ে যাবে —এসব নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যান্য সব শরিকদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন কমিউনিস্টরা এই নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটি বিষয়ে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করলেন। সেই কারণেই তাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলন এবং প্রগতি লেখক আন্দোলনে সহগামী বন্ধুদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতে লাগলেন।

এই ঘটনা অনুসরণ করে যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিল তাতে প্রগতি লেখক সঙ্ঘ অল্পবিস্তর দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল—একদিকে কমিউনিস্ট মতাবলম্বীরা, অন্যদিকে বাদবাকী সবাই। 'যৌথ আন্দোলন ভেঙে ফেলছে', 'অন্যের উপর নিজেদের মত চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে' 'মস্কোর নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে' এইসব অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলো কমিউনিস্টদের। পাল্টা অভিযোগ তুলে জবাব দেওয়া হলো এইসব অভিযোগের, 'ওরা ভারতের নতুন শাসক গোষ্ঠীর কাছে ভূলুণ্ঠিত হয়ে মাথা নোয়াচ্ছে', 'সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করছে' ইত্যাদি। ফলে, ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের কয়েক বছরের মধ্যেই প্রগতি লেখক সঙ্ঘ (ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ এবং অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম সাংস্কৃতিক সংগঠন সহ) খণ্ড-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং স্বাভাবিক অবলুপ্তি ঘটল।

বর্তমান লেখক সারা ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সঙ্গে না হলেও কেরলের ইউনিটে এইসব বিতর্কের সক্রিয় অংশীদার ছিল। কমিউনিস্ট বনাম অন্যান্যদের এই লড়াইয়ে তিনি বিতর্কের গ্রহণযোগ্য অংশগুলি স্বীকার করছিলেন আবার প্রতি আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, এই দুই প্রান্তে ছিল তার অবস্থান। কেরলে যে সব যুক্তি এবং পাল্টা যুক্তি, অভিযোগ এবং প্রতি অভিযোগ চলছিল, ঠিক সেরকমই যে দেশের সর্বত্র চলেছে তা নাও হতে পারে। কিন্তু বিতর্কের বিষয় এবং সংগ্রামের ধারা কেরলে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে নিঃসন্দেহে সর্বভারতীয় তাৎপর্য তার মধ্যে রয়েছে। সেই কারণে এই নিবন্ধে বিতর্কের প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কে সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনামূলক পরীক্ষার দ্বারা বিতর্কের প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে পক্ষপাতহীন বস্তুবাদী সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্যে এই আলোচনার সূত্রপাত করা হলো।

রাজনৈতিক আন্দোলন, সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট

অবশ্য আলোচনা শুরু করার আগে সাধারণভাবে একথা বলা যেতে পারে যে বর্তমান লেখক, তাদের (সংশোধনবাদীদের) এই চিন্তার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন না, যে প্রগতি লেখক সঙ্ঘ ভেঙে যাবার জন্য কমিউনিস্টরাই দায়ী, শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে সুপরিচিত ঝদানভ তত্ত্বের অংশমাত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁরা অকমিউনিস্ট লেখকদের সম্পর্কে 'অতি সংকীর্ণবাদী' দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন অভিযোগ আনা হয়। কমিউনিস্টরা যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন তার সবটাই সঠিক ছিলনা। নিঃসন্দেহে তাঁরা ভুল করেছিলেন (পরে এ বিষয়ে আলোচিত হবে) কিন্তু সে ভুল করা হয়েছিল সংগ্রামের গতিপথেই, আর তা ছিল অপরিহার্য।

প্রকৃতপক্ষে, অন্যান্য ক্ষেত্রে অকমিউনিস্টরা ১৯৪৭ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের মর্মবস্তুটির যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক মূল্যায়ণ করেছিলেন, অকমিউনিস্ট লেখকরা তারই পদাঙ্কই অনুসরণ করেছিলেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, ১৯৪৭ সালে অর্জিত স্বাধীনতার প্রকৃত শ্রেণী চরিত্রের তাৎপর্যটি উপলব্ধি করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। কাজে কাজেই তাঁদের মনোভাব এমন জায়গায় দাঁড়ালো যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাঁরা অতীতের কমিউনিস্টদের সঙ্গে একযোগে প্রগতি লেখক সঙ্ঘ গঠনকালীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যে মৌল গণতান্ত্রিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাও তাঁরা পরিত্যাগ করেন।

সুতরাং কমিউনিস্টদের সঙ্গে অন্যান্যদের চিন্তার সংঘর্ষ অপরিহার্য ছিল। এই লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করা সঠিক ও যথার্থ হয়েছিল; সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সর্বহারা সমাজতন্ত্রের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে কমিউনিস্টরা ঠিক কাজই করেছিলেন। মতবাদের এই অপরিহার্য সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় নিঃসন্দেহে তারা সংকীর্ণতাবাদী ভুলও কিছু করেছিলেন।

এইরকম এক সাধারণ অভিমত থেকেই কেরলে সাম্প্রতিককালে লেখকদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে—সমাজ বিকাশে সাহিত্যের ভূমিকা কি, রাজনীতির সঙ্গে এর কি সম্পর্ক। কমিউনিস্টরা, অর্থাৎ যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী তাঁরা কোন আদর্শগত এবং তত্ত্বগত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণীসংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সাহিত্যকে বুঝতে এবং বিকশিত করতে চেষ্টা করবে, ইত্যাদি। এই অধ্যায়ে বর্তমান লেখক একজন সক্রিয় অংশীদার। এই সমস্ত আলোচনা থেকে যে সিদ্ধান্ত বেরিয়ে এসেছে এখানে তার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব।

(খ)

ভাবগত বনাম বস্তুগত

'শিল্পের জন্য শিল্প' বনাম 'সমাজের জন্য শিল্প' এই প্রাথমিক বিতর্কের বিচার দিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট উভয় দলই প্রথমটির বিরুদ্ধে দ্বিতীয়টিকে সমর্থন জানিয়েছিল। যাই হোক, প্রকৃত অর্থে এই শ্লোগানের তাৎপর্য কি তা পরিস্ফুট করা দরকার।

প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, নামের সংজ্ঞানুসারেই, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি যাঁরা আস্থাজ্ঞাপন করেছিলেন, তাদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল। এদের অধিকাংশই স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। যাঁরা সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করতেন না, এমনকি তাঁদের মধ্যেও অনেকেই রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। যারা সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করতেন না, এমনকি তাদের মধ্যে অনেকেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রাম, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আমূল পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন (অসবর্ণ বিবাহের মাধ্যমে, জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণ, যুক্তিবাদী চিন্তার প্রচার, ইত্যাদি)। অতএব সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির রূপরেখা অঙ্কিত করে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের নীতি নির্ধারিত হয়েছিল। এইসব বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই 'প্রগতি' কথাটা সংগঠনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই ঘটনা থেকেই প্রগতি লেখক সঙ্ঘের ভিতরে ও বাইরে কেউ কেউ এই ধারণা করে নিলেন যে প্রত্যেক প্রগতিবাদী লেখক মাত্রই সচেতন এবং ভাবগত-ভাবে প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের আদর্শ ও নীতির প্রতি আস্থাবান হতে হবে। প্রগতিশীল আন্দোলনে আস্থাহীন কোনো ব্যক্তি প্রগতিবাদী লেখক হতে পারেন না এমন কথাও তাঁরা ভেবে নিলেন। প্রগতি লেখক আন্দোলন সম্পর্কে এরকম এক দৃষ্টিভঙ্গিকে ভিত্তি করেই পক্ষে ও বিপক্ষে দুটি দল গড়ে উঠল।

সাহিত্যের সমস্যা বিচারে এটা কোনো সঠিক পদ্ধতি নয়। কারণ, অন্যান্য প্রগতিশীল ধ্যান ধারণার কথা বাদ দিলেও, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ছাড়া অন্যান্য ভাবাদর্শের কথা যদি ধরা যায়, যারা বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি সচেতন প্রতিশ্রুতি জানায় নি অথচ লেখক হিসাবে সচেতনভাবে না হলেও বিপ্লবী ভাবাদর্শের অভিব্যক্তি ঘটান। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সেইসব লেখকদের অস্তিত্ব স্বীকার করে। পক্ষান্তরে, এমন লেখকও আছেন যাঁরা ভাবগতভাবে বিপ্লবী আদর্শে আস্থা জানিয়েও লেখক হিসাবে সেই আদর্শ রূপায়ণে অসমর্থ হন। এই

কারণে কোনো লেখকের ভাবগতভাবে বিপ্লবী অথবা প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শে বিশ্বাসী হওয়া আর লেখক হিসাবে বাস্তবে তার প্রয়োগ ঘটানো, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন তাদের ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তত্ত্বের আলোকে শিল্প ও সাহিত্যের প্রশ্নে তাদের চিন্তাভাবনা বিশ্লেষণ করার খুব কম সময়ই পেয়েছেন। তথাপি কতিপয় লেখক ও তাঁদের সৃষ্টি সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত মতামত ব্যক্ত করে গেছেন তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁরা, লেখক এবং তাঁর রচনার মধ্যে ভাবগত ও বস্তুগত পার্থক্য নির্ধারণ করেছেন। দুটি উদাহরণই এ বিষয়ে যথেষ্ট: (১) মার্কস এবং এঙ্গেলস উভয়েই বালজাকের রচনার বৈপ্লবিক বিষয়বস্তুকে উচ্চমর্যাদা দিয়েছেন যদিও লেখক প্রতিবিপ্লবী ভাবধারার সমর্থক ছিলেন। (২) লেনিন রুশ লেখক লিও তলস্তয়কে প্রশংসা করে তাঁর রচনাকে 'রাশিয়ার বর্তমান বিপ্লবের দর্পণ' হিসাবে অভিহিত করেছেন, যদিও ভাবগতভাবে তলস্তয় প্রতিক্রিয়াশীলদের আদর্শের অনুগামী ছিলেন।

ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার লেখকদের সম্পর্কে যদি পরিমাপ করা যায় তাহলে এমন বহু উদাহরণ মিলবে যাদের লেখায় ভাবগত ও বস্তুগত দ্বন্দ্ব স্পষ্ট ও তীব্র-ভাবে বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ, কুমারণ আসান এবং ভাল্লাথল এই দুই মালয়ালম ভাষার কবির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

একটি বিষয়ে উভয়ের সাদৃশ্য দেখা যায়: তাঁদের প্রাথমিক শিক্ষালাভ ঘটেছিল প্রাচীন ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত ভাষায় এবং সেই কারণে তাঁরা প্রাচীনপন্থী কবিদের মতই কাব্য-জীবন শুরু করেছিলেন। তাছাড়া, তাঁরা উভয়েই এমন এক যুগে অবস্থান করছিলেন যখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রূপান্তরের ঝড় বয়ে যাচ্ছে গোটা দেশের বুকে।

অবশ্য ভাল্লাথলের বিপরীত—আসান কেরল রাজ্যের বাইরে গিয়ে আধুনিক সাহিত্যের ধারা এবং বাংলাদেশের র‍্যাডিকাল সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। যেহেতু তিনি সামাজিক নিপীড়িত অংশের লোক ছিলেন তাই তিনি তাঁর জাতের উন্নতি বিধায়ক আন্দোলন এবং জাতি বৈষম্য দূরীকরণ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণও করেছিলেন। তাঁর জাতের ধর্মগুরু শ্রীনারায়ণ গুরুর ব্যক্তিগত প্রভাবেও তিনি এসেছিলেন।

যে সময় তিনি তাঁর ধর্মগুরুর অনুগত শিষ্যরূপে কাজ করছেন, লক্ষণীয়, তখনই তার মাধ্যমে মালয়ালম ভাষায় আধুনিক গীতিকাব্য জন্মলাভ করেছে।

বস্তুত তাকেই মালয়ালম ভাষার গীতিকাব্যের জনক নামে অভিহিত করা হয়।

গীতিকাব্যের মধ্য দিয়ে যখন আসান সাহিত্যে নতুন জমি তৈরী করছেন তখন আদর্শগতভাবে তিনি ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যবাহিত সৌন্দর্যরীতির গভীর প্রভাবাধীন ছিলেন। এমন কি আধুনিককালে রচিত তাঁর কবিতাও সেই হেতু পুরনো ধাঁচে সৃষ্ট। শেষদিকের একটি কবিতাতে অবশ্য তাঁকে এই সনাতন রূপরীতি ভাঙতে হয়েছিল। তাঁর 'দুরবস্থা' কাব্যগ্রন্থে যে কবিতায় এক নাম্বুদিরিপাদ নায়িকা ১৯২১-এর 'মফ্‌লা' বিদ্রোহের সময় ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল এবং নায়ক ছিল একজন হরিজন, সেই কবিতায় স্বরচিত ভূমিকায় তিনি বলেছেন যে, তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির সঙ্গে তুলনায় এটি 'কতকটা ব্যতিক্রম'। তিনি আরো বলেছেন সমালোচকরা এই রচনায় সৌন্দর্য রীতির বিচারে এমন অনেক কিছু হয়তো খুঁজে পাবেন যা অনুমোদনযোগ্য নয়। তাঁর এই ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হয়েও, তিনি এই মত ব্যক্ত করছেন যে সামাজিক কর্তব্যবোধ থেকে তাঁকে এই কবিতা লিখতে হয়েছে। এই কারণে আসান সম্পর্কে অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে তিনিই প্রথম কবি যিনি তাঁর কবি প্রতিভাকে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা ও সংগঠনের লড়াই-এর অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন।

ভাল্লাথল কিন্তু প্রকাশ্যে এরকম কোন ঘোষণা করেননি। মৌলিক সমাজ সংস্কারের জন্য তিনি লড়াইও করেননি। (আসান যেমন করেছিলেন)। অবশ্য গান্ধীযুগে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ঘনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে ১৯২০ সালের যুগের কবি ভাল্লাথলের সহিত আগে ও পরের ভাল্লাথলের মধ্যে গুণগত পার্থক্য ছিল।

তিনিও আসানের মত সনাতনী ধাঁচে কবিতা রচনা দিয়ে কবি-জীবন শুরু করেন। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অসহযোগ অভ্যুত্থান পরবর্তীকালে তাঁর মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার ফলশ্রুতিরূপ এমন অনেক কবিতা তিনি রচনা করেছিলেন যা রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনে দ্রুত অগ্রগতি ঘটাতে সাহায্য করেছিল। অতএব বলা যায়, জীবনের এই অধ্যায়টিই কবি হিসাবে ভাল্লাথলের সবচেয়ে সার্থক সময়।

'সমাজের জন্য শিল্প' বলতে সাধারণত যা বোঝায় সেই বাঁধা ফ্রেমের মধ্যে এই দুই কবির জীবন ও রচনাকে খাপ খাওয়ানো যায় না। আসান ও ভাল্লাথল তাঁদের যে কাব্য সৃষ্টির জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন বা বলা যায় যে তাঁদের

প্রশংসিত কীর্তি যা অতীতের সৃষ্টি প্রয়াস থেকে তাঁদের পৃথক করেছিল (আর ভাল্লাথলের জনপ্রিয় রচনাও) তা কোনো সচেতন বা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি নয়।

কবি হিসাবে সনাতনী ছাঁচে তৈরী পূর্বেকার কাব্য এবং গীতিকাব্য, অথবা 'দুরবস্থার' সঙ্গে আসানের অন্যান্য রচনার সহজ সরল পার্থক্য টানা যায় না। এরকম ধারণা করা নিরর্থক যে আসান তার গোড়ার দিকের কবিতার ধরণ থেকে গীতিকাব্যে, কিম্বা গীতিকাব্য থেকে 'দুরবস্থা' কাব্যে খুব ভেবে-চিন্তে বিবেচনা করে কাব্যের ধরণ পাল্টেছিলেন।

ভাল্লাথলের বেলায়ও এ কথা বলা যায় যে ওরকম কোন বিশেষ চিন্তা করে তাঁর প্রথম পর্বের রামায়ণের অনুবাদ রচনা থেকে বিশের দশকের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কবিতায় অথবা সেখান থেকে ঋকবেদ অনুবাদে (যা তাঁর শেষ সাহিত্য কর্ম) উত্তরণ ঘটেনি।

বাস্তব ঘটনা হলো, পারিপার্শ্বিক জগতের প্রচণ্ড পরিবর্তনের প্রভাবে, আসান ও ভাল্লাথল উভয়েই তাঁদের প্রথম দিকের রচনা থেকে পরবর্তীকালের রচনা পরিবর্তন করেছিলেন—আসানের ক্ষেত্রে ছিল সমাজের বর্ণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সামাজিক বিদ্রোহ, আর ভাল্লাথলের ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন। উল্লেখ করা উচিত যে এই দুই আন্দোলনই ছিল বিকাশমান বুর্জোয়াশ্রেণীর দুটি স্তর। তাদের অগ্রগতির বাধাস্বরূপ ঔপনিবেশিক সামন্ত সমাজব্যবস্থার এইসব বাধা অতিক্রম করা অপরিহার্য ছিল। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এ এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম, যে সামাজিক শক্তিসমূহ বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায় তারা সবসময়ে বাস্তবে কি করছে সে সম্পর্কে সচেতন থাকে না। স্তালিন তাঁর সুপরিচিত দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ গ্রন্থে বলছেন, 'মানুষ যখন কোনো একটি উৎপাদনযন্ত্রের ও শক্তির কোনো একটি উপাদানের উন্নতি সাধন করে, তখন এই উন্নতির সামাজিক ফলাফল কি ঘটিবে সে চিন্তা করে না, ভাবিয়া দেখিবার ধৈর্য তাহার থাকে না, সে কেবল ভাবে তাহার দৈনন্দিন স্বার্থে কথা, ভাবে কেমন করিয়া শ্রমলাঘব করা যায়, কেমন করিয়া নিজেদের জন্য প্রত্যক্ষ ও বাস্তব সুবিধা পাওয়া যায়'।

উদাহরণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন, 'সামন্তবাদী ব্যবস্থার যুগে ইউরোপে নবীন বুর্জোয়া সমাজ যখন ছোট ছোট কারখানার পাশে বড় বড় উৎপাদন কেন্দ্র গড়িতে শুরু করে এবং সমাজের উৎপাদন শক্তির উন্নতিসাধন করে, তখন

অবশ্য তাহারা জানিত না এবং স্থির হইয়া ভাবে নাই যে এই প্রবর্তনের সামাজিক ফলাফল ও পরিণাম কি। তাহারা জানিত না ও বুঝিত না যে এই "সামান্য" নতুনত্ব সাধনের ফলে সমাজের শক্তিপুঞ্জকে নূতনভাবে সাজাইয়া যে বিপ্লব হইবে, তাহাতে যে রাজার অনুগ্রহ তাহাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান ছিল এবং যে অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য ইহাদের প্রধান প্রতিনিধিরা প্রায়ই কামনা করিত, তাহাদের উভয়েরই শক্তি বিপন্ন হইবে। ইহারা শুধু চাহিত দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয়সঙ্কোচ করিতে, ইহারা চাহিত এশিয়ার ও নব আবিষ্কৃত আমেরিকার বাজারে বহুল পরিমাণে পণ্য পাঠাইতে, এবং ক্রমাগত বেশী লাভ করিতে। ইহাদের সচেতন কার্যক্রম এই তুচ্ছ সাধারণ উদ্দেশ্যের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।'

কুমারণ আসান এবং ভাল্লাথল যখন নতুন সাহিত্য জগতের জন্য ভেঙে নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন তখন তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি যে তাঁরা সমাজ রিবর্তনে বুর্জোয়াদের কাজকেই এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বস্তুত সমাজ রিবর্তনের বিকাশেই তাঁদের কবিতা সাহায্য করেছে। বুর্জোয়া বিকাশের এই প্রভাবই তাঁদের প্রথমদিকের ক্লাসিকাল সনাতন পদ্ধতি ভেঙে পরবর্তী সাহিত্য সৃষ্টির পথে নিয়ে গিয়েছিল।

তাছাড়া ভাল্লাথলের ক্ষেত্রে, গান্ধীযুগের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে যে বিশৃঙ্খলা এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল তাতে তার কাব্য জগত আঘাত প্রাপ্ত হয়। ফলে তিরিশ দশকের মধ্যবর্তী কাল থেকে তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তু উৎকর্ষতা হারালো। চল্লিশের দশকের সোভিয়েত নেতৃত্বে সংগঠিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং শান্তি আন্দোলনে তিনি নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তাতেও বিশের দশকের সেই স্পন্দিত আবেগ পুনরুজ্জীবিত হয়নি। তাঁর কাজের বিষয় বস্তুর গুণ, এই সমগ্র উত্থান-পতনে তাঁর সাহিত্যকৃতির আঙ্গিক অল্পবিস্তর অপরিবর্তিত রয়ে যায়।

স্বতঃই প্রশ্ন জাগতে পারে : একথা কি বলা যায় যে আসান এবং ভাল্লাথল 'সমাজের জন্য' লিখে গেছেন? স্পষ্ট উত্তর হল 'না'। ঠিক যেমন তাঁদের সাহিত্য প্রচেষ্টার প্রথম পর্বে (প্রাচীন ক্ল্যাসিকাল সনাতনী ধাঁচ) তেমনি পরবর্তী কালের রচনায় তাঁরা লেখক হিসাবে তাঁদের প্রতিভার সাহায্যে সেই ভাবধারাকেই ভাষা দিতে সচেষ্ট হয়েছেন যা তাঁদের নিজস্ব সমাজ থেকে মনোমধ্যে আহৃত হয়েছিল। মৌলিক পরিবর্তনকামী যে আদর্শ তাঁরা ভাষায়

রূপ দিয়েছিলেন তা তাঁদের ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক ভাবাদর্শ। সমাজ উদ্ভূত ভাবাদর্শ প্রকাশের তাঁরা মাধ্যম ছিলেন মাত্র।

আসান এবং ভাল্লাথল থেকে বালজাক এবং তলস্তয়ের অবশ্য পার্থক্য ছিল। বালজাক বা তলস্তয়ের মতো তাঁরা সমাজের যে আদর্শের বাহক ছিলেন তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন না। ভাল্লাথল গান্ধীযুগের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের একজন ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত সমর্থক ছিলেন, আর আসান ছিলেন বুর্জোয়া সমাজ গঠনের একজন সক্রিয় প্রচারক, অসবর্ণ বিবাহ পর্যন্ত যার অগ্রগতি ঘটেছিল, শেষ রচনা 'দুরবস্থা' কাব্যে যা প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কিন্তু বালজাক ও তলস্তয়ের সঙ্গে আসান এবং ভাল্লাথলের আরও যে পার্থক্য রয়েছে তা হলো, বস্তুগতভাবে যে আদর্শের পক্ষে তাঁরা শিল্পসৃষ্টি করেছেন সেই শিল্পের উৎকর্ষ কোন পূর্ব-চিন্তা বা বিবেচনার ফলশ্রুতি নয়। অতএব 'সমাজের জন্য শিল্প' এই মত তাদের উপর আরোপ করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। তাঁদের কাছে শিল্প ছিল 'শিল্পেরই জন্য'। তাঁদের রচনার প্রগতি-শীল বিষয়বস্তু তাঁদের নিজস্ব ছন্দমাফিক ছিল না, এই ফলশ্রুতি সম্ভব হয়েছিল তাঁদের উপর তদানীন্তন সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রভাবে।

তার অর্থ এই নয় যে 'সমাজের জন্য শিল্প' এই শ্লোগান ভুল। কারণ এক বালজাক বা তলস্তয়, কিম্বা একজন কুমারণ আসান অথবা ভাল্লাথলের পাশাপাশি এমন অসংখ্য প্রতিভাধর লেখকের পরিচয়ও আমরা পাই যাঁরা কিছু অপূর্ব সৃজনশীল রচনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, যদিও নির্দিষ্ট আদর্শ প্রচারের বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাঁরা এই কাজ করেছেন।

এরকম প্রচেষ্টা 'উদ্দেশ্য-প্রবণ সাহিত্য' হিসাবে সুপরিচিত। এঙ্গেলস মিনা কাউট্স্কিকে লেখা তাঁর বিখ্যাত পত্রে (যে সম্পর্কে আমাদের পরে পুনরুল্লেখ করতে হবে) ট্র্যাজেডির জনক এসকাইলাস এবং কমেডির জনক আরিস্টো-ফিনিসকে 'নিশ্চিতরূপে উদ্দেশ্যপ্রবণ কবি' বলে অভিহিত করে বলছেন, দান্তে এবং সারভানতিস্ এ ব্যাপারে কিছু কম ছিলেন না এবং শিলারের "Intrigue and Love" সম্পর্কে সবচেয়ে বড় গুণ এই যে এটিই প্রথম জার্মান রাজনৈতিক সমস্যামূলক নাটক। আধুনিক রুশ ও নরওয়েজিয়ান লেখকরাও অপূর্ব উপন্যাস রচনা করেছেন, এঁরাও সকলে উদ্দেশ্যপ্রবণ।

এঁরা এবং বিশ্বের সর্বদেশে শত সহস্র লেখক মানব ইতিহাসের প্রত্যেকটি যুগেই তাঁদের সৃজন প্রতিভাকে মত প্রচারের ও আদর্শ বহনের কাজেই নিয়োগ করেছেন। সেই কারণে এঁদের সবার কাছেই শিল্প 'সমাজের জন্য'।

খোলামনে স্বীকার করা যায় যে যখন আমরা 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই মত-বাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং 'সমাজের জন্য শিল্প' এই মত প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা চালিয়ে সঠিক কাজই করেছিলাম, তখন আমরা 'সমাজের জন্য শিল্প' এই মতটির সংকীর্ণ ব্যাখ্যা হাজির করে ভুলও করেছি। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যা কিছু বাহ্যত আদর্শ প্রচারের ভূমিকা বহন করে না তাকেই 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে বাতিল করে দেওয়া সম্ভবত ভুলই হবে। এইদিক থেকে আমাদের ধ্যান-ধারণা ত্রুটিপূর্ণ ছিল। অবশ্য একথাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমরা যে লড়াই চালিয়েছিলাম তাও প্রয়োজনীয় ছিল।

(গ)

লেখকের সামাজিক দায়িত্ব

গোড়ার যুগের গণতান্ত্রিক রূপান্তরকরণের প্রগতি লেখকদের সঙ্গে তিরিশ দশকে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের পার্থক্য ছিল এই যে এই সংগঠন ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া সংগ্রাম, ঔপনিবেশিক দেশগুলির মুক্তি সংগ্রাম, ফ্যাসিবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের প্রতিরোধ, আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের প্রত্যক্ষ ভীতি প্রদর্শনের হাত থেকে শান্তি রক্ষা এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম থেকে প্রেরণা নিয়েছিল এবং এইসব ঘটনার সঙ্গে একাত্মতা গড়ে তুলেছিল।

বিশ্বজোড়া এই সংগ্রামের অংশীদার হিসাবে ভারতের প্রগতি লেখক সঙ্ঘ প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট এবং র‍্যাডিকাল জাতিয়তাবাদীদের সঙ্গে সহ-যোগিতা করার শপথ ঘোষণা করেছিল। এরা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন সেইসব জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যাঁরা আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন শুধু নয়, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষেত্রে আপসকামী ছিলেন।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এরকম প্রকাশ্য পক্ষাবলম্বন স্বভাবতই সাহিত্যের কায়েমীগোষ্ঠীর মনে উষ্মা সৃষ্টি করত। উদাহরণ স্বরূপ, মালয়ালাম সাহিত্য সঙ্ঘ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন খ্যাতিমান কোনো লেখক কর্মীবৃন্দের মধ্যে ছিল না। এমন কি সম্ভাবনাপূর্ণ লেখক ও কবি হিসাবে যারা স্বীকৃতি পাচ্ছিলেন তাঁদেরও কায়েমী স্বার্থবাদীরা উদীয়মান লেখকরূপে গ্রহণ না করে উদীয়মান রাজনৈতিক কর্মী এই আখ্যা দিয়ে বাতিল করে দিত।

যাই হোক না কেন, অতি শীঘ্রই বেশ কিছু সংখ্যক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক আন্দো-

লনে যোগ দিলেন। ভাল্লাথল যখন স্বয়ং এই সংঘের কাজকর্মের উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন, শঙ্করা কুরুপের মত সুবিদিত কবি, থাকাঝি এবং কেশভ দেবের মতো ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্প লেখক মুন্দাশ্বরী ও এম. পি. পলের মতো সমালোচকবৃন্দ তখন এই সংগঠনের নেতৃত্বে সক্রিয় প্রতিনিধি এবং মুখপাত্র হিসাবে কাজ করছেন। প্রগতি লেখক সঙ্ঘে তাঁরা—কমিউনিস্ট সোশ্যালিস্ট এবং র‍্যাডিকাল জাতিয়তাবাদীদের সঙ্গে একযোগে প্রগতিশীল লেখকদের জন্য 'ইশতেহার' তৈরী করেছেন যার মধ্যে ঘোষিত হয় যে (ক) সকল সাহিত্যিক ক্রিয়াকর্ম 'উদ্দেশ্য-মূলক', এবং এইভাবে 'শিল্পের জন্য শিল্প' মতটিকে সম্পূর্ণ নাকচ করা হয় ; (খ) 'সমাজ প্রগতি'র জন্য লেখকরা জীবন উৎসর্গ করবেন, যা সমসাময়িক যুগ এবং ভারতবর্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্তি এবং মৌলিক সামাজিক অর্থনৈতিক মুক্তির অন্তর্ভুক্ত।

সমাজ-প্রগতির বিষয়ে অবশ্য কয়েক বছর পরেই কমিউনিস্ট এবং অন্যান্যদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধল, যার পরিণামে প্রগতি লেখক সঙ্ঘ নিদারুণভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। নানান বাস্তব কারণে সঙ্ঘকে গুটিয়ে নিতে হলো। তখন থেকে এই পরিণামের দায়িত্ব কার সেটি গুরুতর বিতর্কের বিষয় হয়ে আছে।

অকমিউনিস্টরা অভিযোগ করলেন, এবং শোধনবাদী কমিউনিস্টরা তাঁদের সমর্থন করলেন যে আন্দোলনে কমিউনিস্টদের 'সংকীর্ণতাবাদী' কার্যকলাপই এই ভাঙনের জন্য দায়ী। পক্ষান্তরে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এই অভিমত ব্যক্ত করলেন যে কৌশলগত প্রশ্নে কিছু ভুল নিঃসন্দেহে ঘটেছে। এ ছাড়াও তাদের মতে ভাঙনের মূল কারণ হলো, ১৯৪৭-এর আগে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক-যোগে লড়াই-এর অংশীদারদের মধ্যে বৃটিশ কর্তৃক ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনাটিকে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন। ভারতীয় সমাজে ক্রিয়াশীল শ্রেণী-শক্তিগুলি সম্পর্কে স্বচ্ছতর ধারণা লাভ করে, অকমিউনিস্টরা সেদিন যা পারেন নি, কিন্তু পরে বুঝেছেন, সেই সত্য কমিউনিস্টরা আগে ভাগেই উপলব্ধি করে ভারতের নতুন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাথে সমাজ অগ্র-গতির সংগ্রামকে যুক্ত করে নিলেন। স্পষ্টতই অকমিউনিস্টরা এই মূল্যায়নের সঙ্গে নিজেদের খাপখাওয়াতে পারলেন না। এই দুই রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে আদর্শগত বিরোধই নন্দনচর্চার ক্ষেত্রে দুই মতবাদের এক ধরনের সংগ্রামে পর্যবসিত হলো।

এই বিতর্ক থেকে সৃষ্টি হলো কায়েমী নন্দনতত্ত্ববিদদের রীতিনীতির সপক্ষে ও বিপক্ষে দু'দলের দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলো যে

সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রগতিশীল বিষয়বস্তু নিয়ে আসার আগ্রহাতিশয্যে তারা সাহিত্যকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনকে অস্বীকার করছে। পাল্টা অভিযোগ করা হলো যে সাহিত্যের আঙ্গিককে সুন্দর করার জন্য অকমিউনিস্টদের জিদটা আসলে প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে আপসের কৌশল মাত্র। প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে অকমিউনিস্টরা দাবি করলেন যে তাঁরা প্রগতিশীল বিষয়-বস্তুর প্রশ্নে কমিউনিস্টদের তুলনায় কোনো অংশে কম সচেতন নন। আর কমিউনিস্টরা দাবি করলেন যে সাহিত্যসৃষ্টিকে সৌন্দর্য-মণ্ডিত করতে তাঁরা প্রতিপক্ষের মতই সমান আগ্রহী।

বিতর্কের উত্তাপ যার পরিণামে পূর্বেকার ঐক্যবদ্ধ প্রগতি লেখক সঙ্ঘের মধ্যে দুই গোষ্ঠী গঠিত হয়, এবং সর্বোপরি কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরে সংশোধন-বাদী চিন্তার প্রচণ্ড প্রভাব বিতর্কের প্রকৃত বিষয়গুলিকে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল অত্যন্ত অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা চেষ্টা করব সমস্যার মূল বিষয়গুলিকে খুঁজে বার করতে যাতে যুক্তি-সঙ্গত আলোচনায় প্রবেশ করা সম্ভব হয়।

ইতিমধ্যে, অন্তত মালয়ালাম সাহিত্যে, আরেকটি প্রবণতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে —যে প্রবণতা 'আধুনিকতা' নামে পরিচিত। এই মতবাদের সমর্থকদের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি হল যে, লেখক দুনিয়ার কারো কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়; তার দায়দায়িত্ব শুধু নিজের কাছে। সে শিল্প সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছে সমাজের কোনো কর্তব্য পালনের তাগিদে নয়—এরকম ধারণাকেই তারা অস্বীকার করে—আত্ম-সন্তোষের জন্যই তার সাহিত্য প্রয়াস।

লক্ষণীয়, প্রগতি লেখক আন্দোলনের কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট উভয়েই যে 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই শ্লোগানের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, কায়েমী-স্বার্থবাদীরা সেই শ্লোগানের বিরোধিতা করত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের গোড়া-পত্তনের যুগ থেকে। বস্তুত কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট উভয়েই 'সমাজের জন্য শিল্প' এই মতটিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সেই কারণে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তাঁরা সমাজ অগ্রগতির বিষয়বস্তুর প্রশ্নে এবং কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে লেখকরা সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করবেন তাও মেনে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালের মত পার্থক্যের তখনই সূত্রপাত হলো যখন কমিউনিস্টরা এবং বাকী অংশ ১৯৪৭-এর পরিবর্তনকে পৃথকভাবে মূল্যায়ন করলেন এবং সাতচল্লিশ-পরবর্তী ভারতের পরিস্থিতিতে লেখকদের সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে ভিন্নমত গড়ে তুললেন।

স্বভাবতই সেই কারণে শুধু ভারতবর্ষে নয় বিদেশেও পরবর্তীকালে যে ঘটনার বিকাশ ঘটেছিল তা অকমিউনিস্টদের এক বড় অংশকে অনুধাবন করতে সাহায্য করল যে সময় এসেছে যখন কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাদের একযোগে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ৪৭ পূর্ববর্তী কালের থেকে ভিন্ন কায়দায় হলেও যৌথ সংগ্রাম পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কাজ করা দরকার। কমিউনিস্টরাও অতীতের কৌশলগত ত্রুটিগুলির সঙ্গে যুক্ত ১৯৪৭ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বাধাগুলি সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজন উপলব্ধি করলেন। এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের নতুন এক আন্দোলন জন্মলাভ করেছে। ১৯৬৯-৭০ সালে দেশাভিমানী পাঠচক্র কেরল রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে। এইসব পাঠচক্রে বহু কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট গান্ধীবাদী এবং আরও অনেকে সামাজিক অর্থনৈতিক আমূল পরিবর্তনকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে সাংস্কৃতিক পুনরভ্যুত্থানের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।

প্রণিধানযোগ্য যে, ঠিক যেমন পূর্বেকার প্রগতি লেখক সঙ্ঘকে তার গোড়া পত্তনের যুগে 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই শ্লোগানের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল, সেই-রকম বর্তমান আন্দোলনকেও 'আধুনিকবাদী'দের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে যারা প্রকাশ্যে লেখকদের আহ্বান জানাচ্ছেন সমাজের প্রতি কোনো কর্তব্যকে স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য। আপাতভাবে 'আধুনিক' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুরনো পৃথিবীর প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারারই বাহক এই সমাজ-বিরোধী চিন্তার মূল উপাদানটির বিরুদ্ধে দেশাভিমানী পাঠচক্রে সম্মিলিত নানান দার্শনিক এবং রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের কর্তব্য এদের তীব্র সমালোচনা করা এবং এদের মুখোশ খুলে দেওয়া। এই কারণে স্বভাবতই কেবলমাত্র পাঠচক্রের উদ্যোগেই নয়, কেরলের বিভিন্ন সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, আলোচনা সভা এবং বিতর্ক সভার প্রধান আলোচ্য বিষয়ই হলো, লেখকের কোনো সামাজিক কর্তব্য আছে কি নেই।

এরকম একটি প্রশ্ন যে আদৌ উত্থাপিত হতে পারে, সাধারণভাবে অনেকেই হয়তো তাতে বিস্ময় অনুভব করবেন। কারণ 'উদ্দেশ্যমূলক' রচনা আজ আর কোনো নতুন চিন্তা নয়। যেদিন থেকে লিখিত সাহিত্য শুরু হয়েছে, লেখক, সমালোচক, নন্দনতত্ত্বের সমালোচনা সাহিত্যকে সামাজিক বিধি নিষেধ প্রচারের মাধ্যম হিসাবে মেনে নিয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলা হয় 'যুগধর্ম'।

সংস্কৃতে একটি সুপরিচিত প্রবাদ আছে যে বেদ, শাস্ত্র এবং কাব্য মানুষকে দিয়ে ধর্ম প্রতিপালনের সম-উদ্দেশ্য সাধন করে। পার্থক্য শুধু কাজটি সম্পন্ন

করার পদ্ধতিতে। বেদ গুরুর মতো উপদেশ দেয়; শাস্ত্র রাজার মতো আদেশ দেয়; কাব্য প্রিয়তমা পত্নীর মতো প্রেরণা যোগায়। এক্ষেত্রে সংশয়ের আদৌ অবকাশ নেই যে সৃজনশীল লেখকরা তাদের সন্দেহাতীত প্রতিভাকে ধর্ম প্রসারের জন্য ব্যবহার করতেন। বেদও সেই প্রচারকার্যই করত এবং শাস্ত্র যার ব্যাখ্যা করত। বিশুদ্ধ আনন্দলাভের জন্য লেখকের সাহিত্যচর্চার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এটি সংস্কৃত ভাষার কোনও একজন রচয়িতার প্রক্ষিপ্ত উক্তি নয়। বাস্তবিক পক্ষে এই বক্তব্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিশ্বের সকল অংশের লেখক ও সমালোচকের মনোভাবকেই ব্যক্ত করছে। সাহিত্য সর্বোপরি ধর্মপ্রচারের অঙ্গ ছিল; প্রত্যেক দেশের এক বিপুল সংখ্যক মানুষ যারা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, তোয়া, জোরাস্ট্রিয়ান, খ্রীষ্ট, ইসলাম ইত্যাদি ধর্মপ্রচার করতে চেয়েছেন, লেখ্য সাহিত্যকে সেই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন।

তাঁদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সেই কারণে সামাজিক কর্তব্য পূরণের অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে সাহিত্য-চর্চা গণ্য হতো, যে কর্তব্য আবার ব্যাখ্যাত হতো দেশ-কালের পরিধিতে যৌথ সামাজিক নৈতিকতার সাহায্যে।

এই পরিস্থিতির পরিবর্তন সূচীত হলো তখনই যখন ইউরোপে বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটল। যে ঘটনা বিগত চার শতক ধরে কার্যকরী হয়ে আসছে—যে কথা সবাই জানে—মানব ইতিহাসে প্রথম এই তত্ত্ব হাজির হলো যে সামাজিক মঙ্গল কথাটার অর্থ সম্পদের মালিক ব্যক্তি-বিশেষের মঙ্গল। "ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্নতা" (The disintegration of Personality) এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধে ম্যাক্সিম গোর্কী ব্যাখ্যা করে বলছেন কেমন করে:

মানব ইতিহাসের শৈশব প্রত্যুষে আত্মরক্ষার সহজাত বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিরস্ত্র মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই-এ ভয়, আতঙ্ক এবং শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ের মুখোমুখি হয়ে ধর্ম সৃষ্টি করল। এই ধর্মই ছিল এদের কাব্য, যার মধ্যে প্রাকৃতিক শক্তিগুলি সম্পর্কে তাদের সামগ্রিক জ্ঞান এবং পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা রূপায়িত হতো। প্রকৃতির উপরে মানুষের প্রথম জয়লাভ মানুষের মনে স্থায়িত্বের চেতনা, আত্মগৌরব, আরো জয়ের বাসনা এনে দিল এবং তাদের বীরত্বপূর্ণ অলিখিত মহাকাব্য রচনায় প্রেরণা জোগালো, যা তাদের যাবতীয় আত্মজ্ঞান এবং নিজেদের কাছে নিজেদের সমস্ত দাবির ভাণ্ডারে পরিণত হলো। অতঃপর যখন মানুষ মহাকাব্যের নায়ককে তাদের সমবেত চিন্তার শক্তি দিয়ে বিভূষিত করল এবং তাকে ঈশ্বরের

বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদের শক্তি হিসাবে গড়ে তুলল অথবা তাকে ঈশ্বরের পর্যায়-ভুক্ত করল তখন থেকে মহাকাব্যের এবং পুরাণের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হল।

প্রমিথিউস, স্যাটান, হারকিউলিস ইত্যাদি সাহিত্য সৃষ্টির উদাহরণের সাহায্যে সমষ্টিগত সৃজন শক্তি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক পরিবর্তন কিভাবে মানুষের সমষ্টি শক্তির চেতনায় এবং প্রতীকে প্রতিফলিত হলো তা ব্যাখ্যা করে গোর্কী ব্যক্তির ভূমিকা নিরূপণ করে দেখালেন যে সে রক্ষণশীল ভূমিকাই পালন করেছে। যখন সে তার ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে দাবি তুলল এবং এই অধিকারের-স্বপক্ষে যুক্তি হাজির করল তখনই সে সমষ্টিগত সৃজনশীলতাকে সীমিত করল, কর্তব্যকে করল সঙ্কীর্ণ এবং তার দ্বারা বিকৃত করল সবকিছুকে। ...ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য যখন অন্যদের অধিকার দাবিয়ে রাখার জন্য নিজেকে সংহত করল শাসক সত্তায়, জনসাধারণের মধ্যে জন্ম নিল শাশ্বত ভগবানের, অহং-এর ঐশ্বরিক প্রকৃতিকে স্বীকার করে নিতে তাকে বাধ্য করল এবং তার স্ব-সৃজনীশক্তির প্রতি স্থির বিশ্বাস গড়ে তুলল।

এর বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্যক্তির পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা আবশ্যিকভাবে তার নিজেরই প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের সঙ্গে এবং সৃষ্ট শাশ্বত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি যা ঐসব ঐতিহ্যকে পবিত্রতা দান করেছিল তার বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত করল।

'অহং' শক্তির এই শক্তিবৃদ্ধি, গোর্কী আরো বললেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বা পারস্পরিক সম্পর্কে তিক্ততা এবং বৈরীভাবাপন্ন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে মানুষে মানুষে ঐক্যবন্ধন ছিন্ন করে দিল। দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হয়ে মানুষকে আত্মরক্ষার কঠিন প্রচেষ্টায় নামতে হলো। ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে গোষ্ঠী, রাষ্ট্র এবং সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সমস্ত বন্ধন হারাতে হলো। সমষ্টি আরোপিত শৃঙ্খলা পালন এখন তার কাছে কষ্টসাধ্য হলো; এমনকি তার পরিবারও তার কাছে বিরক্তিকর বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

মানুষের সৃজনশীল প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সমষ্টি ও ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে গোর্কীর সিদ্ধান্ত সত্যিই যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষণীয়।

সকল দেশের মহান কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনায় মানুষের যৌথ সৃজনশীল কীর্তির সঞ্চিত সম্পদের চিত্রটিই মূর্ত হয়েছে। এই কীর্তিই সুপ্রাচীন কাল থেকে কাব্যে সকল সাধারণীকরণ, বিখ্যাত ভাবমূর্তি এবং প্রতীকের উৎস হয়েছিল।

শেক্সপীয়ার এবং বায়রনের আগেই মানুষ ঈর্ষাপরায়ণ' ওথেলো, দোদুল্যমান হ্যামলেট এবং লম্পট ডন জুয়ান চরিত্রের জন্ম দিয়েছে। ক্যালডেরানের

পূর্বেই স্পেন দেশের অধিবাসীরা গাইত "জীবন স্বপ্নময়", এবং এই কথাই স্পেনবাসী মুরেরা স্পেন দেশের অধিবাসীদের বলার আগেই বলেছিল। সারভান-তিসের আগেই লোকগাথায় নাইট প্রথাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে আর তার ভঙ্গী ছিল অনুরূপ তীব্র ও বিষাদময়।

'মিলটন এবং দান্তে, মিকিউইস, গোথে এবং শিলার গরিমার সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তখনই যখন তাঁরা সমষ্টির সৃজনশীলতায় উজ্জীবিত হয়েছেন এবং জনপ্রিয় কবিতা থেকে প্রেরণালাভ করেছেন—যার উৎস গভীর, অন্তহীন বৈচিত্র্যময়, প্রজ্ঞাময় ও অফুরন্ত।'

গোর্কী সুস্পষ্টভাবে বলছেন যে 'তিনি এইসব কবিদের খ্যাতির আসন থেকে কোনোভাবে চ্যুত করছেন না বা তাঁদের লঘু করার বাসনাও তার নেই।' কিন্তু তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে বলছেন যে 'ব্যক্তিগত সৃজনশীলতা যদি আমাদের অপূর্ব-ভাবে কাটা এবং পালিশ করা রত্ন উপহার দিয়ে থাকে তবে তার অসংস্কৃত রূপসমষ্টি, তথা জনসাধারণের মধ্যেই উৎসারিত হয়েছিল। ব্যক্তি মাধ্যমেই শিল্প প্রকাশিত হয়। তথাপি একমাত্র সমষ্টিই সৃজনে সক্ষম। 'সাধারণ' মানুষই যিশাসকে সৃষ্টি করেছে, ফিডিয়াস মাত্র তাকে মার্বেল পাথরে আকৃতিদান করেছেন।'

'আত্ম উপাদানের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে এনে, সমষ্টি সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে চেতনার উত্তাপ তার উর্ধ্বে আপন সত্তাকে স্থাপন করে মন্থর, রক্ষণশীল এবং বিকাশমান জীবনের প্রতি ব্যক্তি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে পড়ে।'

ধনতন্ত্র ব্যক্তির প্রশ্নে যে দ্বৈত, পরস্পর-বিপরীত ভূমিকা পালন করে গোর্কী তা উদ্‌ঘাটন করেছেন। একদিকে, একের সঙ্গে সকলের বিরোধের ফলে জীবন পূর্বাপেক্ষা আরো পরুষ, আরো কষ্টসাধ্য হয়েছে। আত্মনিধন প্রতিরোধে বাধ্য হয়ে শত্রুর প্রতি সুতীব্র ঘৃণা থেকে ব্যক্তির মধ্যে জঙ্গী মনোভাবে উৎসাহিত হয়ে থাকবে···কিন্তু তবু ব্যক্তি বিশেষ একজন প্রমিথিউস, এমনকি একজন উইলিয়াম টেলের জন্ম দিতে পারেনি, কিম্বা রক্তাক্ত অতীতের শৌর্য এবং সৌন্দর্যের প্রতীক হারকিউলিসের সঙ্গে তুলনীয় এমন একটিও ভাবমূর্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি।

পক্ষান্তরে, ধনতন্ত্রের ইচ্ছা-নিরপেক্ষতার নিষ্ঠুর মুষ্টিবদ্ধ থাবার মধ্যে পুনর্জন্ম ঘটেছে সমষ্টির, নিষ্পেষণে প্রলেতারিয়েত পরিণত হয়েছে এক বলিষ্ঠ নৈতিক

শক্তিতে। ধীরে অথচ ক্রমবর্ধমান গতিতে, এই শক্তি উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে বিশ্বের মহান সমষ্টি-আধার হিসাবে একমাত্র তারই উপর জীবনের স্বাধীন বিকাশের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

সর্বহারার লেখক গোর্কী সংগ্রামী শ্রমজীবী মানুষের বস্তুবাদ এবং সমাজ-রাজনীতির দার্শনিক লেনিনের সঙ্গে আন্দোলনের মাধ্যমে জীবন ও সাহিত্যের কেন্দ্র-রূপে সমষ্টিবদ্ধ সামাজিক মানুষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে একাত্ম হয়েছিলেন।

প্রাচীন এবং মধ্যযুগে ধর্ম এই কাজ করেছে। ধর্মই মানুষকে সমষ্টি চেতনার শক্তি সম্পর্কে সচেতন করেছে যার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই সেদিনের মহাকাব্যে। বর্তমান যুগে তা সম্ভব নয়। যখন মানুষের আপন শক্তির সচেতনতা ধর্ম থেকে নয়, সংঘবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের মধ্য থেকে জন্ম নেয়।

সেই কারণেই গোর্কী সাহিত্যজগতে সেই দায়িত্বই কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন যে দায়িত্ব লেনিন বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর তত্ত্বগত, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রতিপালন করেছিলেন। আবার সেই একই কারণে, ১৯৩০-এর দশকে যখন বিশ্বজোড়া ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধ একদিকে, এবং অন্যদিকে গণতন্ত্র শান্তি এবং সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম সমগ্র মানবতার ভাগ্যকে ভারসাম্যে এনে ফেলল, গোর্কী তামাম লেখক এবং সংস্কৃতিপ্রিয় মানুষের সামনে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন: 'তোমরা কোন পক্ষে?' সৃজনশীল রচনার সার্থক এই রূপকারের পক্ষে সেইসব ব্যক্তির মুখ চেয়ে ধৈর্য ধরার অবকাশ ছিল না যারা একটা না একটা অজুহাতে দুই শিবিরের তিক্ত সংগ্রামের উর্ধ্বে অবস্থান করার চেষ্টা করছিল।

এই গৌরবময় ঐতিহ্যকে প্রগতি লেখক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টরা উত্তরাধিকার হিসাবে গ্রহণ করে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। আত্ম-সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে পঁচিশ বছর আগে অকমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যে-প্রচণ্ড আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়েছিল তার মূল্যায়ন করলে আমরা যারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তাদের কৌশলগত প্রশ্নে কিছু ত্রুটির কথা স্বীকার করে নিতে দ্বিধা নেই। আমরা অবশ্য দাবী করি যে বিতর্কের মূল বিষয়টির ক্ষেত্রে আমরা নয়, তদানীন্তন প্রতিপক্ষরাই ভুল করেছিলেন; কারণ সমাজ-প্রগতির কাজে যে লেখক বা সমালোচক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, দ্রুত সমাজের পরিবর্তন বা অগ্রগতির জন্য যিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তার পক্ষে সামাজিক-রাজনৈতিক প্রশ্নে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্কালে প্রথম প্রধানমন্ত্রীর মতো এক ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত 'এখন আমরা কোন দিকে যাব?' এই প্রশ্নের ভিত্তিতে আপসমূলক বা দোদুল্যমান কোনো পথ অবলম্বন করার সুযোগ থাকে না।

২৭ বছর আগে আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এই প্রশ্নের জবাব একভাবে দিয়েছিলাম আর নেহরু এবং তার অনুগামীরা দিয়েছিলেন বিপরীতভাবে। রাজনীতি ও সাহিত্য জগতের যেসব বন্ধুরা সেদিন আমাদের বক্তব্যের বিরোধিতা করে নেহরু এবং তাঁর অনুবর্তীদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন, তাঁরা যদি আত্ম-সমালোচনায় পরান্মুখ না হন, স্বীকার করবেন এখন যে, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে তাঁরা ভ্রান্ত ছিলেন।

(ঘ)

দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি কি? স্বাধীনতা বিরোধিতা?

১৯৪৭-৪৮ সালে কমিউনিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় অকমিউনিস্টদের মধ্যে একটা ফ্যাসান চালু ছিল যে সামাজিক-রাজনীতিক প্রতিশ্রুতি পালনে কমিউনিস্টরা যে-দাবি করেছেন তাতে লেখকদের হাত-পা বাঁধা পড়ে যাবে। তাদের মতে, এরকম প্রচেষ্টা 'সৃজনশীল স্বাধীনতা'-বিরোধী, যে-স্বাধীনতা ছাড়া কোন প্রতিভাবান ব্যক্তি তাঁর শিল্প সৃষ্টির কাজ সার্থকভাবে করতে পারে না।

১৯৪৭-৪৮ সালের পরবর্তী যুগে যখন কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক দলগুলির ইনফরমেশান ব্যুরো সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করেছে এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা ঝ্দানভ যখন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নীতি উপস্থিত করলেন, প্রগতি লেখক সংঘের অকমিউনিস্ট অংশ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে তাঁরা সংকীর্ণতাবাদী ঝ্দানভ-নীতিকে অনুসরণ করছেন।

অবিভক্ত পার্টিতে যাঁরা আদর্শ ও রাজনীতিগত প্রশ্নে সংশোধনবাদের সপক্ষে লড়াই করেছিলেন এবং অবশেষে আন্দোলনকে দ্বিধাবিভক্ত করলেন, তাঁরা অকমিউনিস্টদের এই যুক্তিকেই পরবর্তীকালে গ্রহণ করেন। বহু লেখক এবং সমালোচক যাঁরা ভাঙনপর্বে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন, প্রগতি লেখক আন্দোলনে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অকমিউনিস্টদের আনীত অভিযোগগুলিকে প্রথমেই গ্রহণ করে নিলেন।

সে কারণে এ সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃতভাবে আলোচনা জরুরী হয়ে পড়েছে যে, কোনো বিশেষ আদর্শের প্রতি অঙ্গীকার, দৈনন্দিন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সুশৃঙ্খল বাস্তব অংশগ্রহণ, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির সভ্যপদ গ্রহণ এবং কর্তব্য পালন, এসব কি ব্যক্তিসত্তা বিকাশের বাধাস্বরূপ, যা না থাকলে, বলা বাহুল্য, কোনো উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিশীল রচনা সম্ভব নয়।

কোনো বিশেষ সৃজনশীল লেখক এবং তার শিল্পকৃতির নির্দিষ্ট বিষয়ে সমস্যাটি উত্থাপিত হলেও এই প্রশ্ন প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কোনো গায়ক, অভিনেতা, চিত্রকর, নৃত্যশিল্পী, বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, উৎপাদন ক্ষেত্রের যে কোনো দক্ষ শ্রমিক—এমনকি আইনজীবী, সরকারী পদস্থ কর্মচারী, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি নানান জীবিকায় নিযুক্ত মানুষ—প্রত্যেকেরই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে। কেবলমাত্র প্রকৃত প্রতিভার অধিকারী যারা—যে প্রতিভা সংশ্লিষ্ট বিশেষ পেশার ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়—তারাই পারে ন্যস্ত কার্যভার সুচারুরূপে সম্পাদন করতে। অতএব প্রশ্ন হলো, কোনো শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজনৈতিক দলের সভ্যপদ গ্রহণ করলে কি এইসব কাজের নৈপুণ্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয়?

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব দেয় যে ঃ ব্যক্তির প্রতিভাটাই হচ্ছে সামাজিক উৎপাদনের ফসল। অন্যথায় কিভাবে এ ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায় যে আদিম মানুষ সঙ্গীত এবং নৃত্যের সংমিশ্রণে কেবলমাত্র সেই শিল্প-আঙ্গিক সৃষ্টি করেছে যার মধ্যে তথাকথিত সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তা ছিল না। আর আধুনিককালের মানুষ সঙ্গীত নৃত্য এবং অন্যান্য আরো শিল্প প্রক্রিয়াকে পরস্পর থেকে পৃথক করে প্রত্যেকটিকে উন্মার্গগামী করে তুলছে। কেমন করে আদি মানুষ যে সূর্য, অগ্নি, প্লাবন ইত্যাদি দেখে ভীত হতো এবং তাদের পূজা করত, তার তুলনায় পরবর্তী বংশধরেরা ক্রমান্বয়ে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে বুঝতে শিখল এমন কি সেই শক্তিগুলির উপর সীমিত অধিকার বিস্তার করতে সমর্থ হলো?

সুতরাং প্রকৃতিকে জানতে এবং আয়ত্তে আনতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উত্তরোত্তর ক্ষমতাবৃদ্ধি, সৃজনশীল শিল্পীর ক্রমবর্ধমান উন্নতি সমাজ বিকাশেরই ফলশ্রুতি। গোষ্ঠীবদ্ধ অবস্থা থেকে মানুষ নিজেকে আত্মিক পূর্ণতা দান করেছে এবং তার পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে নিজের ধারণাকে স্বচ্ছ করছে এবং এইভাবে বর্বর অবস্থা থেকে আধুনিক সভ্য মানুষে নিজেকে রূপান্তরিত করে চলেছে। প্রতিভা বিকাশের নির্বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রতিভা ক্রমবিকাশমান মানব সমাজের সমষ্টির ভগ্নাংশ মাত্র।

মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের মতো বিপ্লবী তত্ত্ব এবং বিপ্লবী কর্মের প্রতিভাবান ব্যক্তিদের কথাই উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক। অন্যান্য তত্ত্বের অনুগামীদের মতো তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রের প্রবক্তাদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অতিমানব হিসাবে বিবেচনা করে না। ব্যক্তিগতভাবে মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন তত্ত্ব বিকাশে এবং ব্যবহারিকভাবে বিপ্লবী লড়াই পরিচালনার মাধ্যমে নিজস্ব ক্ষেত্রে

পৌঁছেছেন। বর্তমানযুগে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন কর্তৃক বিপ্লবী তত্ত্বের প্রসার এবং বিপ্লবে নেতৃত্বদানের ফলেই সম্ভব হয়েছে—শ্রেণী হিসাবে নিজেকে সংহত করতে পেরেছে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তাদের সেই ভূমিকাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে না। দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যুগের সৃষ্টি বলেই গণ্য করে।

সমাজ বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে জার্মান দর্শন, ইংরাজী রাজনীতি অর্থনীতি ও আধুনিক বিপ্লবের ফরাসী তত্ত্ব ও প্রয়োগবিধি গঠন সম্ভব হয়েছে। বিগত শতাব্দীর মানব সমাজের গঠন প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতাগুলিকে আত্মস্থ করে দুই অসাধারণ মনীষী মার্কস ও এঙ্গেলস দ্বান্দ্বিক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তত্ত্ব বিকশিত করেছেন। লেনিনও মানব ইতিহাসে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করেছেন, দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব এবং প্রয়োগ রীতিকে আরো গভীরতা দান এবং বিকশিত করার জন্য তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভা প্রয়োগ করেছিলেন, যে-প্রতিভা আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলন এবং রাশিয়ার সবরকম বুর্জোয়া বিপ্লবী আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি।

বৈজ্ঞানিক, সৈনিক, ইঞ্জিনীয়ার, চিকিৎসক, আইনজীবী এবং রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে একথা যেমন সত্য তেমনি সৃজনশীল সত্য লেখকের ক্ষেত্রেও। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি আধুনিক মালয়ালাম ভাষার দুজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভল্লাথল এবং কুমারণ আসান কিভাবে তাঁদের যুগ এবং দেশের ফলশ্রুতিরূপে জন্মলাভ করেছেন। গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য যে অভ্যুত্থান ঘটে তারই ফলে এই প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক দুজন কবি আধুনিক মালয়ালাম কবিতার পথিকৃতে রূপান্তর লাভ করেন। তাদের দ্বারা যে কি ঘটছে সে-ব্যাপারে দুজনের কেউই অবহিত ছিলেন না।

এই ধরনের প্রতিভাশালী লেখক এবং যেসব লেখক কমিউনিস্ট তাদের মধ্যে পার্থক্য হলো যে শেষোক্ত লেখকরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পর্কে সচেতন। উল্লেখনীয় যে, ম্যাক্সিম গোর্কীর মতো ব্যক্তি, যাঁকে বুর্জোয়া সমালোচকরাও দেশের অন্যতম প্রতিভাবান লেখক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং যিনি বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, তিনিও তাঁর নিজের লেখক সত্তার বিকাশ কি দৃষ্টিতে বিবেচনা করতেন। তিনি তাঁর 'কেমন করে লিখতে শিখলাম' এই দ্বিতীয় প্রবন্ধে সিদ্ধান্ত পৌঁছেছেন—

'মানুষের চিন্তা চেতনার উর্ধ্বে' আমার অন্য কোনো চিন্তা নেই ; আমি মনে করি মানুষ, এবং একমাত্র মানুষই সকল সামগ্রী ও ভাবধারার স্রষ্টা ; সেই তো

প্রকৃত অত্যাশ্চর্য কারিগর এবং প্রাকৃতিক শক্তির অধিকারী। শিল্প-দুনিয়ার যা কিছু পরম সুন্দর,মানুষের শ্রম এবং কুশলী হাতে সৃষ্টি হয়েছে তা আমাদের সমস্ত মনন এবং ধ্যান ধারণা, শ্রম-প্রক্রিয়ার উৎস থেকেই উদ্ভূত; শিল্প, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। চিন্তা ঘটনাকে অনুসরণ করে। আমি মানুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করি কারণ আমাদের এই জগতে তার মূর্ত বিচারবুদ্ধি, তার কল্পনা এবং অনুমান ব্যতিরেকে আর কিছুই আমি দেখতে পাই না। ফোটোগ্রাফীর মত মানব-মনের নব নব বিষয়ের সমাবেশই ঈশ্বর। পার্থক্য যেটুকু তা হলো ক্যামেরা ঠিক যা আছে তাই ধরে রাখে আর ঈশ্বর হলো মানুষের সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান এবং পরিপূর্ণ সার্থক ও সমর্থ হবার বাসনায় নিজের সম্পর্কে যা সে আবিষ্কার করে বস্তুত তারই ফোটোগ্রাফী।

'পবিত্র' বলতে যদি কিছু থাকে, তাহলে আমি মানুষের নিজের প্রতি অসন্তোষ, আরো উন্নততর স্তরে যাবার জন্য তার কঠোর প্রচেষ্টাকেই 'পবিত্র' বলে মনে করি। আমি আরো মনে করি যেসব জঞ্জাল জীবনকে বেষ্টন করে আছে আর যা সে নিজেই সৃষ্টি করেছে, তার বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশই পবিত্র। ঈর্ষা, লোভ, পাপ, রোগ, যুদ্ধ এবং পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে সকল বৈরিতাকে নিঃশেষ করার বাসনাই পবিত্র, পবিত্র তার শ্রম।'

এখানে বিপ্লবী মানবতাবাদের কথা আসে, ম্যাক্সিম গোর্কীকে যে-বিষয়ে অগ্রণী পথিকৃৎ হিসাবে অভিহিত করা যায়। বিপ্লবের আগে ও পরে রাশিয়ায় তীব্র সংগ্রামগুলিতে ম্যাক্সিম গোর্কী একজন সক্রিয় অংশীদার ছিলেন। ভিন্ন ক্ষেত্রে হলেও মানবতাবাদের আর একজন পথিকৃৎ রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির সংগঠক লেনিনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। কারণ বাস্তব জীবনে একজন বিপ্লবী শিল্পী ও একজন বিপ্লবী তাত্ত্বিক ও সংগঠক যিনি শ্রেণী-শত্রুর উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন তাঁদের মধ্যে সাযুজ্য থাকে।

একথা সুবিদিত যে লেনিন ও গোর্কীর মধ্যে বহু মত-পার্থক্য ছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশের প্রত্যেকটি সঙ্কটময় মুহূর্তে গোর্কীর সংবেদনশীল শিল্পী সত্তার সঙ্গে লেনিনের আপসহীন বিপ্লবী সত্তার বিরোধ বেধেছে। গোর্কী মনে করতেন যে লেনিন অহেতুক বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে 'ঝগড়া' করছেন, পক্ষান্তরে লেনিন মনে করতেন যে গোর্কী এমন সব মৌলিক বিষয়ে 'আপস' করছেন যেখানে কোনো আপস চলে না। তথাপি পরস্পরের প্রতি তাঁরা অগাধ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। প্রত্যেকটি বিবাদের পর তাঁরা আবার

তা মিটিয়ে ফেলতেন, এমন কি ক্ষমা পর্যন্ত চাইতেন যখন সত্যিই ক্ষমা চাওয়া উচিত। এমনি আরো সব ঘটনা ঘটত। এমন কি দুজনের মধ্যে লড়াই-এ যখন কোনো একজন ভাবতেন যে লড়াই করা প্রয়োজন তখন তাঁরা সুস্পষ্টভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করতেন যে-আদর্শের প্রতি তাঁদের উভয়েরই সমান আকর্ষণ, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার স্বার্থে পরস্পরের প্রতিভা কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে এই বিবাদে তাঁরা প্রবৃত্ত হয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ এখানে গোর্কীর কাছে লেনিনের তীক্ষ্ণভাষায় বিতর্কের ঢং-এ লেখা পত্রের একাংশ তুলে ধরা হচ্ছে—

'...আমি সম্পূর্ণ একমত যে রচনার শিল্পগত বিষয়ে আপনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক এবং আপনার শিল্প-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা এবং দর্শনজ্ঞান থেকে, যদি সেই দর্শন ভাববাদী হয়, এই ধরনের ধারণা নির্ণয় করে আপনি এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যা থেকে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন প্রচণ্ডভাবে লাভবান হবে।'

'রচনার শিল্প সংক্রান্ত প্রশ্নে' সৃজনশীল লেখককে 'শ্রেষ্ঠ বিচারক' রূপে বিবেচনা করার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, লেনিন এঙ্গেলসকেই একান্তভাবে অনুসরণ করেছেন। মিনা কাউট্স্কিকে লেখা পত্রে, যে-সম্পর্কে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, এঙ্গেলস বলছেন, 'আপনার রচনার এই পর্যায়ে গল্পাংশ অতিদ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছে কিনা তা আপনিই আরো ভালো বিচার করতে পারবেন।' স্পষ্টই বোঝা যায় যে গল্পটি তৈরী করার ভার এঙ্গেলসের উপর পড়লে তিনি মিনা কাউট্স্কির চেয়ে কম দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। কিন্তু তিনি একজন সৃজনশীল লেখককে 'রচনার শিল্পগত প্রশ্নে' কর্তব্য সম্পর্কে কোনো উপদেশ দেবার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন নি। লেনিনও গোর্কী প্রসঙ্গে এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

অনিবার্যভাবে প্রশ্ন জাগে যে প্রগতি লেখক আন্দোলনে কমিউনিস্ট হিসাবে আমরা কি সৃষ্টিশীল রচনার **বিষয়বস্তু** এবং **রচনার শিল্পগত** বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে ব্যর্থ হয়েছি? আরো প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে লেনিন-পরবর্তী যুগে, আন্তর্জাতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে লেনিনবাদীরা কি মিনা কাউট্স্কিকে লেখা এঙ্গেলসের পত্রে এবং ম্যাক্সিম গোর্কীকে লেখা লেনিনের পত্রে নির্ধারিত আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল? এটা সম্ভব যে স্তালিনের মতো আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যেও রচনার বিষয়বস্তুগত প্রশ্নে বিপ্লবী আদর্শে প্রতিশ্রুত লেখকের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে রচনার শিল্পগত প্রশ্নে পার্টি সম্পর্কে তার ধ্যান-ধারণার প্রশ্নটিকে মিলিয়ে ফেলার প্রবণতা ছিল।

যদিও ধরে নেওয়া যায় এই মন্তব্য ভ্রান্ত নয়, তবু প্রকৃত ঘটনায় এই সত্য

ম্লান হয় না যে বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে যাঁরা সমাজের বৈপ্লবিক অগ্রগতির স্বার্থে লেখককে তার সমগ্র সৃজনশীল রচনা সৃষ্টির দাবি করেন এবং যাঁরা কোনো বিশেষ লেখকের 'সৃষ্টির স্বাধীনতা'র নামে পূর্বোক্ত মতের বিরোধিতা করেন তাদের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলে আসছে। বস্তুত এই কারণেই লেনিনকে গোর্কীর সঙ্গে লড়াই চালাতে হয়েছে যখনই গোর্কী সর্বহারার বিপ্লবী সাহিত্যাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।

এই একই পত্রে, যে-সম্পর্কে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, লেনিন রচনার শিল্পগত প্রশ্নে বিচারের ভার গোর্কীর উপর ন্যস্ত করলেও গোর্কীকে তার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'প্রলেতারী' পত্রিকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কঠোরভাবে পার্টিনীতি মেনে চলার দাবি জানিয়েছেন। লেনিন মনে করতেন যে প্রলেতারী পত্রিকায় দর্শন প্রসঙ্গে যা প্রকাশিত হচ্ছে তার দ্বারা পার্টির মধ্যে ভাঙন ধরবে এবং পার্টিকে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামে দুর্বল করে দেবে। 'দর্শন প্রসঙ্গে' বলশেভিকদের মধ্যে এ ধরনের বিতর্ককে তিনি 'নিতান্ত অপরিহার্য' বলে বিবেচনা করতেন, কিন্তু আবার এও মনে করতেন যে 'এই নিয়ে পার্টির মধ্যে ফাটল ধরানো মূর্খামী। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিতে একটি নির্দিষ্ট কৌশল গ্রহণের জন্য আমরা একটি ব্লক তৈরী করেছি। এ পর্যন্ত আমরা মতানৈক্য বিনাই এই কৌশল প্রয়োগ করে চলেছি...বস্তুবাদ অথবা মার্কসবাদের প্রশ্নে বিরোধের জন্য শ্রমিক-সংগঠনে বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাসীর কৌশল প্রয়োগে যদি বাধা সৃষ্টি হয় তাহলে আমার মতে, সেটা হবে অমার্জনীয় নির্বুদ্ধিতা। দর্শনগত বিষয়ে আমাদের লড়াই এমনভাবে করতে হবে যাতে 'প্রলেতারী' এবং বলশেভিকরা পার্টির উপদলে পরিণত হয়ে তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং বাস্তবে তা সম্ভব।'

পার্টি নেতা লেনিন এবং সৃজনশীল লেখক ও পার্টির একজন শ্রদ্ধাভাজন সভ্য গোর্কীর মধ্যে সম্পর্কের নির্দিষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করে এবার আমরা লেখকদের স্বাধীনতার প্রশ্নে লেনিন সাধারণ তত্ত্বগত কি মত পোষণ করতেন সে বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরব। 'পার্টি সংগঠন এবং পার্টি সাহিত্য' এই সুবিখ্যাত প্রবন্ধে তিনি বলছেন :

'সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্তৃত্বে সাহিত্যকে যান্ত্রিকভাবে খাপ খাইয়ে সমান করে নেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। এবিষয়েও কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে সাহিত্যে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর প্রশ্নে নিজস্ব উদ্যোগ, ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চিন্তা ভাবনা এবং বিচিত্র কল্পনার অধিকতর সুযোগ

সন্দেহাতীতভাবে দিতে হবে। এসবই অনস্বীকার্য; কিন্তু এগুলি থেকে এই কথাই বুঝতে হবে যে প্রলেতারীয় পার্টিকর্মের, সাহিত্য বিভাগটিকে প্রলেতারীয় পার্টি কর্মের অন্যান্য অংশের সঙ্গে ছকবাঁধা এক করা চলে না। তার দ্বারা বুর্জোয়াশ্রেণী এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাছে এই বেমানান এবং অদ্ভুত প্রতিপাদ্য বিষয়টি অগ্রাহ্য হয়ে যায় না যে, সাহিত্যকে নিশ্চয় ও অবশ্যই হতে হবে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি কাজের একটি অংশ, যা তার অন্যান্য অংশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। সংবাদপত্রগুলিকে বিভিন্ন পার্টি সংগঠনের মুখপত্র হতে হবে, এবং এইসব মুখপত্রের লেখকেরা আবশ্যিকভাবে সংগঠনের পার্টি সদস্য হবেন। প্রকাশনী এবং পরিবেশন কেন্দ্র, পুস্তক বিপনী, পাঠাগার, গ্রন্থাগার এবং অনুরূপ সকল প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই পার্টি পরিচালনার নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। সংগঠিত সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েতকে এসব কাজের নজর রাখতে হবে, সবদিক থেকে এগুলিকে তত্ত্বাবধান করতে হবে, এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই সব কিছুর প্রত্যেকটি প্রলেতারীয় কর্মযোগে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার করতে হবে এবং এইভাবে 'লেখক লেখার কাজ করে এবং পাঠক পড়ার কাজ করে' এই আধা অবলমোভী, আধাব্যবসাদারী রুশদেশী নীতির পুরনো সব কিছুর ভিত্তি দূর করতে হবে।'

লেনিন নিশ্চয়ই জানতেন যে এতে চীৎকার চেঁচামেচি উঠবে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা সাহিত্য সৃষ্টির মতো সুন্দর ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর সমষ্টির নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার চেষ্টা হচ্ছে দেখে যন্ত্রণা অনুভব করবেন। এইরকম প্রতিবাদের উত্তরে তিনি বলছেন :

'আমরা পার্টি সাহিত্য এবং তার উপর পার্টি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা করছি। যা খুশি বলার ও লেখার অবাধ স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু পার্টি বিরোধী মতামত প্রচারে যারা পার্টির ধ্বজা কাজে লাগাচ্ছে তেমন সমস্ত সভ্যদের বিতাড়নের স্বাধীনতাও আছে প্রতিটি স্বাধীন সমিতির (পার্টি সমেত)। বাক্ স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই পরিপূর্ণ থাকবে। কিন্তু সংগঠনের স্বাধীনতাও পরিপূর্ণ থাকতে হবে। বাক-স্বাধীনতার নামে তোমাকে প্রাণভরে হৈ চৈ করা, মিথ্যা কথা বলা এবং লিখতে দেওয়ার সম্মতি দিতে আমি বাধ্য। কিন্তু তুমিও আমাকে সংগঠনের স্বাধীনতা দিতে বাধ্য। যে-কোনো লোককে গ্রহণ করা অথবা ইচ্ছামত যে কোনো মতামত ব্যক্ত করার জন্য বিতাড়িত করার অনুমতি দিতে বাধ্য। পার্টি হলো স্বেচ্ছা-সংগঠন। যারা পার্টি-বিরোধী বক্তব্য বলে তাদের যদি পার্টি ঝেটিয়ে বিদায় না করে তা

হলে প্রথমে আদর্শগতভাবে এবং পরে সংগঠনগতভাবে পার্টি অনিবার্যভাবে ভেঙে যাবে। পার্টি এবং পার্টি-বিরোধী সীমারেখা নির্ধারিত হয় পার্টির কর্মসূচী, রণকৌশলগত নীতি এবং নিয়মাবলী সংক্রান্ত পার্টির বিভিন্ন প্রস্তাব, এবং সর্বোপরি প্রলেতারিয়েত আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছা-সংগঠনের সমগ্র অভিজ্ঞতা দিয়ে। প্রতিনিয়ত পার্টির অভ্যন্তরে এমন সব ব্যক্তিসমূহের সমাবেশ ঘটে যারা অসঙ্গতিভরা প্রবণতা নিয়ে আসে, যাকে সম্পূর্ণত মার্কসীয় বলা যায় না, সঠিকও নয় কোনো মতেই। আবার অন্যদিকে যে-সংগঠন নিয়মিত কর্মীদের মধ্য থেকে আগাছা দূর করার কাজ চালায়—এই সমস্ত বিষয়ে পার্টি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা উপস্থিত করে।' লেনিন এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন :

'পার্টির মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা এবং সমালোচনার স্বাধীনতা আমাদের কখনও পার্টি নামক স্বাধীন সমিতিতে জনগণকে সংগঠিত করার বিষয়টি সম্পর্কে বিস্মরণ ঘটায় না।'

বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসী কোনো প্রতিভাধর সাহিত্যকারের সৃজনশীল লেখক হিসাবে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হবার কোনো কারণই নেই, বরঞ্চ সে তার নিজের এবং সহকর্মীদের সৃজনশীল কাজ করার অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টিই করে। কারণ, সাহিত্যের বিকাশলাভের সবচেয়ে বড় বাধা হলো ক্ষুদ্র এক শোষক গোষ্ঠীর শ্রেণী শাসন যারা বিপুল সংখ্যক জনসাধারণকে পদানত রাখতে চায়। লেনিন বলছেন যে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়াদের কথাবার্তা 'নিছক ভণ্ডামী'। কারণ 'যে-সমাজ মুদ্রাশক্তিকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, যে-সমাজে শ্রমজীবী জনসাধারণ দারিদ্র্যে এবং মুষ্টিমেয় ধনী পরগাছার মতো বাস করে,সেখানে কোনো প্রকৃত এবং বাস্তব 'স্বাধীনতা' থাকতে পারে না। লেখক মহাশয়, আপনি আপনার বুর্জোয়া প্রকাশক এবং বুর্জোয়া পাঠকদের থেকে কি স্বাধীনতা ভোগ করেন যারা আপনার কাছে যৌন আবেদনপূর্ণ বিষয় এবং চিত্রে 'পবিত্র' বর্ণনাময় শিল্পে 'অতিরিক্ত সংযোজন' হিসাবে বেশ্যা চরিত্র হাজির করার জন্য দাবি জানায়? অবিমিশ্র স্বাধীনতা কথাটি বুর্জোয়া অথবা নৈরাজ্যবাদীদের বুলি। (যেহেতু, বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিতে নৈরাজ্যবাদ হলো বুর্জোয়া দর্শনের অন্তর-রূপটির প্রতিভাস।) সমাজে বাস করে কেউ সমাজ থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। বুর্জোয়া লেখক, শিল্পী অথবা অভিনেত্রীদের স্বাধীনতার অর্থ হলো (কিম্বা কপটতার মুখোশ), টাকার থলি, উৎকোচ এবং বেশ্যাবৃত্তির উপর নির্ভরশীল পরাধীনতা।'

পক্ষান্তরে, লেনিন বলছেন, 'একমাত্র তখনই সাহিত্য 'প্রকৃত মুক্ত' হতে পারে

যখন তা 'খোলাখুলিভাবে প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন' করতে পারে। এইভাবে যে-সাহিত্য সর্বহারার সঙ্গে সংযুক্ত হয় সেই সাহিত্যই প্রকৃত স্বাধীন হতে পারে কারণ তখন তাকে কিছু কিছু প্রাচুর্যে অবসরগ্রস্তা নারী, অথবা "উচ্চবর্গের কয়েক হাজার" লোকের সেবা করতে হয় না, সে সেবা করে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে,—যারা দেশের ফুল, শক্তি এবং ভবিষ্যৎ। এটি হবে স্বাধীন সাহিত্য যা সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েতের অভিজ্ঞতা (আদিম কাল্পনিক রূপ থেকে সমাজতন্ত্র বিকাশের পরিপূর্ণতা, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র) এবং বর্তমানের অভিজ্ঞতার (শ্রমিক কমরেডদের বর্তমান সংগ্রাম) মধ্যে অবিরাম পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েতের জীবন্ত কাজ ও অভিজ্ঞতায় গড়া মানবতার বৈপ্লবিক চিন্তার শেষ কথাটিকে সমৃদ্ধ করবে।'

সমাজের সবচেয়ে প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করা এবং মানব ইতিহাসের সর্বাধিক উন্নত সমাজ গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করাকেই লেনিন সৃজনশীল রচনার মহান পথ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সেই কারণেই তিনি ম্যাক্সিম গোর্কীর মতো এমন সংবেদনশীল ব্যক্তি, এমন প্রতিভাধর লেখকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

লেনিন সম্পর্কে স্মৃতিচারণায় গোর্কী এক আলোচনায় উল্লেখ করেছেন যেখানে লেনিন কেমন করে ধনিক লুঠেরারা পৃথিবীর সব তেল, লৌহ, আকরিক, কাঠ এবং কয়লা লুঠ করেছে সেই বিষয়ে শ্রমিকদের জন্য উপন্যাস রচনার প্রস্তাব করেছেন। এই প্রস্তাব তিনি করেছিলেন মার্কসবাদী দার্শনিক বগদানভের কাছে। গোর্কীকে একবার ঠাট্টাচ্ছলে লেনিন বলেছিলেন, 'আপনি এক হেঁয়ালী। সাহিত্যে আপনাকে মনে হয় গভীর বাস্তববাদী, মানুষের প্রতি আচরণে আপনি রোমান্টিক' ইত্যাদি। প্রগতিবাদী মানবতা এবং তার পথিকৃৎ বর্তমান প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর মহান আদর্শে সৃজনশীল লেখা, দার্শনিক অথবা বুদ্ধিজীবীরা কিভাবে প্রতিভ নিয়োগ করবেন ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় লেনিন সামগ্রিকভাবে বিপ্লবী আন্দোলন এবং পার্টির প্রলেতারীয় সাহিত্যের তত্ত্বগত ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্যই সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন।

আমরা কমিউনিস্টরা ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের নির্দিষ্ট অবস্থায় সাহিত্যক্ষেত্রে লেনিনের এই নির্দেশিত পথ বুঝতে এবং প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছি। আমাদের অকমিউনিস্ট বন্ধুরা অবশ্য প্রগতি লেখক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একে অনুধাবন করতে বা এর উৎকর্ষ উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। তারই জন্য দেখা দিল তাঁদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ—আর এই বিরোধে তাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত কমিউনিস্ট-বিরোধী বস্তাপচা কুৎসা চালালেন যে আমরা নাকি এমন এক জগতে 'একনায়কবাদী সামরিক শৃঙ্খলা আরোপ' করার চেষ্টা করেছি যেখানে শুরু থেকে শেষ সব কিছুরই ব্যক্তি স্বাধীনতার অবাধ সুযোগ বাঞ্ছনীয়।

নির্মল বসু

সংস্কৃতি, অপসংস্কৃতি প্রসঙ্গে

সংস্কৃতি বলতে আমরা কি বুঝি? সাধারণভাবে মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য ইত্যাদির যে-সব অনুষ্ঠান ও উৎসব, নানাবিধ সাহিত্য কর্ম, এবং পোশাক আশাক, দৈনন্দিন ব্যবহারের নানা জিনিস, উৎপাদন, আহার, প্রভৃতি মিলিয়ে যে সব কাজ, তাকে আমরা বলি সংস্কৃতিকর্ম। মানুষের জীবন কেবলমাত্র আহার, বাসস্থান বা পরিধেয় বস্ত্র অর্জনের জন্য পরিক্রমা নয়। এই পরিশ্রমের পাশাপাশি তার জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য, আনন্দলাভের জন্য আরও এমন কিছু প্রয়োজন যা তার জীবনকে পূর্ণ করবে, পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়ে নতুন শক্তির যোগান দেবে। সংস্কৃতিকর্ম এর জন্যই। কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সন্ধান করতে গিয়ে আমরা তাই এই সব দিকেই তাকাই। কিন্তু সংস্কৃতির ধারণা আরও অনেক ব্যাপক। যা কিছু আমাদের জীবনকে ধরে রাখে তাই সংস্কৃতি। যেভাবে আমরা চলি, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সব আচরণ করি, চিন্তাভাবনা আদর্শবোধের মধ্যে যা গ্রহণ করি ও নানাভাবে যার বহিঃপ্রকাশ হয়, সবটা নিয়েই সংস্কৃতি।

জীবনকে, সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলে এই সংস্কৃতি। তাই সাংস্কৃতিক মান বজায় রাখা, এই সংস্কৃতিকে আরও উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়া একান্ত আবশ্যক। কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যসাধনের জন্য যে-পথ নির্দিষ্ট হয় সে-পথে চলার ক্ষেত্রেও পাথেয় সংস্কৃতি-শক্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের

পর লেনিন যখন রাশিয়ায় বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণের কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করেন তখন তিনি এ কাজের জন্য সংস্কৃতি বিপ্লবের ওপর জোর দেন। কারণ, পুরোনো চিন্তাধারা, পুরোনো পদ্ধতি দিয়ে নতুন এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন সম্ভব নয়। চিন্তা ও কর্মে আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। চীনেও সংস্কৃতি বিপ্লবের উদ্দেশ্য তাই ছিল। কিন্তু চীনের সংস্কৃতি বিপ্লবের নেতাদের বিভ্রান্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের ফলে এখানে এই বিপ্লব সফল তো হয়ই নি, বরং বিপরীত ফল হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতেও এমন একটি সংস্কৃতি বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল। ব্যাপক সংস্কৃতি অভিযানের মাধ্যমে দেশবাসীকে যদি দেশপ্রেমে, দেশগঠনের কাজে, উন্নয়নের কর্মে অনুপ্রাণিত করা যেত তাহলে দেশের চেহারা আজ অন্য রকম হতো। কিন্তু এই চেষ্টাই হয় নি। এভাবে যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা যায় তার প্রমাণ তো বারে বারে পেয়েছি। দেশ যখন বিদেশীর দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন যেভাবে আবালবৃদ্ধবণিতা, বিশেষ করে যুব সমাজ, দেশরক্ষার কাজে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে আসে, তা আমরা দেখেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নাৎজী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক শক্তি যেভাবে জীবনযাপন করে সংগ্রাম করেছে তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বন্যার সময় যে-উৎসাহে ছেলেমেয়েরা বিপন্ন মানুষের সেবায় অগ্রসর হয়, অনেক সময় নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করে, তা কি কম?

সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে মানুষের যে এই অগ্রগমন তার গতি প্রতিরোধ করার জন্য বিরুদ্ধ সব শক্তি বরাবরই চেষ্টা করেছে। অতীতেও আমরা দেখেছি, ইউরোপে যখন নবজাগরণের (রেনেসাঁস) যাত্রা শুরু হয়েছে, জ্ঞানবিজ্ঞান চিত্রকলার ক্ষেত্রে নতুন প্রয়াস হচ্ছে, তখন বেশ কিছু ধর্মযাজক, রাজার দল, সামন্ত শক্তি নানাভাবে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। নতুন মুক্তচিন্তার পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। আমাদের দেশেও দেখি, রামমোহন যখন বিশ্বের নতুন চিন্তার দ্বারপ্রান্তে ভারতকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন, সতীদাহের মতো বর্বর প্রথা বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন কিংবা ডিরোজিও-র মতো মানুষ যখন সকল অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ছাত্রযুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন অথবা বিদ্যাসাগর যখন বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য উদ্যোগী হন, কি প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁদের। সংস্কৃতিবিরোধী অপচেষ্টা এই সব বাধাদানের কাজ।

এখন আমরা দেখছি, ভারতে এবং অন্যত্র, সব পুঁজিবাদী দেশে ও প্রায় সব ক'টি তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে চলছে সংস্কৃতিবিরোধী নানা প্রয়াস,

যাকে আমরা বলি অপ-সংস্কৃতি। সংস্কৃতির বিপরীত কর্ম, বা সংস্কৃতির নামে সংস্কৃতির অপ-ব্যবহার হলো অপ-সংস্কৃতি। নগ্নতাবাদ, মদ্যপান, অশ্লীল ছায়াচিত্র (ব্লু ফিল্ম), প্রভৃতির মধ্যে এই অপসংস্কৃতির প্রকাশ। ছায়াচিত্রে, মঞ্চাভিনয়ে, নৃত্যানুষ্ঠানে নারীদের নগ্ন করে প্রকাশ করা হচ্ছে। বিজ্ঞাপন মাধ্যমে, সংবাদপত্রে, টেলিভিশনে, পথে সাজানো পোস্টারে, হোর্ডিং-এ নগ্ন নারীচিত্র প্রাধান্য পাচ্ছে। সাহিত্যে নারীকে কেবল নগ্ন করেই পেশ করা হচ্ছে না, বিকৃত যৌনকর্ম সবিস্তারে বর্ণনা করা হচ্ছে। নগ্নচিত্র, নগ্নবর্ণনা সংকলিত পত্র-পত্রিকা পুস্তিকার প্রচার বিক্রয় বাড়ছে। ব্লু-ফিল্মের রমরমা কারবার চলছে। এই সঙ্গে চলছে মদ্যপানের ঢালাও ব্যাপার। কেবল অল্পবয়সের ছেলেরাই নয়, স্কুল-কলেজের মেয়েরাও এখন অনেকে মদ খাচ্ছে, কেউ কেউ প্রকাশ্যেই। এবং, এই সবের ফলে যৌন-সম্পর্কের পুরোনো ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে অবাধ যৌনাচার শুরু হয়েছে। বয়স্কদের মধ্যেও এই জিনিস বাড়ছে। এই সঙ্গে শুরু হয়েছে আবার ড্রাগের নেশা।

এই সব জিনিস ভারতের নানা স্থানে চলছে, পশ্চিমবঙ্গেও বাড়ছে। কেন এমন হচ্ছে? এ যে এমনি হঠাৎ হচ্ছে, তা নয়। পরিকল্পিতভাবে এই জিনিস করানো হচ্ছে। ইয়াঙ্কি কালচার বলতে আমরা যা বুঝি তা তো আছেই এর মধ্যে, তা ছাড়াও আছে আরও নানা স্বার্থের চক্রান্ত। যুব সমাজ যাতে অন্যায় অত্যাচার শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে না পারে, নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাতে তারা নতুন সমাজ সৃষ্টির পথে অগ্রসর হতে না পারে, তার জন্য তাদের বিপথগামী করে নেশায় বুঁদ করে রাখার জন্যই এই চক্রান্ত। অপরিণত বয়সের সকল ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই এই চক্রান্তের শিকার হচ্ছে। অপসংস্কৃতির জোয়ার চলছে।

ইউরোপ-আমেরিকায়, অ-সমাজতন্ত্রী সব দেশ এবং পুঁজিবাদ ও নব্য সামন্ত-বাদের প্রভাবান্বিত দেশগুলির সর্বত্রই চলছে এখন এই জিনিস। ব্যাপার একই। দেশে দেশে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির সপক্ষে আন্দোলন জোরদার হচ্ছে, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জন্য জোর লড়াই চলছে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রয়াস অব্যাহত আছে। এবং, সর্বত্রই এই সব কাজে যুব শক্তির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। তাই যুব সমাজকে বিপথগামী করো। নগ্নতা বেলেল্লাপনার অপসংস্কৃতির পথ ধরো। সমাজতান্ত্রিক দেশে এই জিনিস নেই। কোথাও কেউ এই পথে যাবার সামান্য চেষ্টা করলে রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে কঠোর

ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সংস্কৃতি ও অপ-সংস্কৃতি নিয়ে দুই ব্যবস্থার মধ্যে এই পার্থক্য চোখে পড়বেই। বিভক্ত বার্লিন শহরের পশ্চিমাংশে বই-এর দোকানে সর্বত্র পর্নো-পত্রিকা,ব্লু ফিল্মের প্রকাশ্য সিনেমা, শো, নাইট ক্লাব, সবই রয়েছে। আর দেয়াল পার হয়ে পূর্বে সমাজতান্ত্রিক জি. ডি. আর-এর বার্লিনে গেলেই দেখা যাবে এ সবের কিছুই নেই সেখানে। স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলির সর্বত্র 'পারমিসিভ্' ব্যবস্থার চূড়ান্ত। আর একটু পার হয়ে সোভিয়েতে গেলেই দেখা যাবে সব বন্ধ। কারণ, যে সব প্রয়োজনে এই সব পুঁজিবাদী দেশে যুব বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার সমাজতান্ত্রিক দেশে তা নেই। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আজ যেখানে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন সেখানে যুবসমাজ তথা সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরাবার জন্যই অপসংস্কৃতিমূলক নানা উত্তেজক উপাচারের আয়োজন।

কিন্তু কেবল এই সব নগ্নতা, মদ্যপান, ড্রাগ্সের নেশাই কি অপসংস্কৃতি? মিথ্যাচার, দুর্নীতি, ঘুষ, স্বজনপোষণ, এ সবও কি অপ-সংস্কৃতি নয়? যে নির্লজ্জ কর্তাভজার রাজনীতি আজ কোথাও কোথাও চলছে তাকেই বা আমরা কি বলব? শিক্ষক যখন তাঁর নির্দিষ্ট ক্লাসে না গিয়ে, দিনের পর দিন স্কুলে না গিয়ে অম্লানবদনে মাস শেষে তাঁর বেতনটি গ্রহণ করেন তখন তা কি সুস্থ সংস্কৃতির পর্যায়ে পড়ে? কিংবা, একজন সরকারী কর্মচারী যখন দুপুরে অফিসে নির্লজ্জভাবে ঘুষ নেন, আর সেই ব্যক্তিই বিকালে অফিসের পর লালঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলেন তখন তাকেই বা আমরা কি বলব? অথবা, সকালে সাড়ে দশটার জায়গায় বেলা বারোটা-একটায় সব অফিসে আসেন, আর বিকাল চারটে বাজতে না বাজতেই অফিস ফাঁকা। এ সব কি অপসংস্কৃতি নয়?

একজন ব্যক্তি সাধারণ ধারণা মতে অত্যন্ত সৎ, কখনও মিথ্যা কথা বলেন না, কথাবার্তাতেও অত্যন্ত ভদ্র, কিন্তু অন্ধ কুসংস্কারে তার মন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন, চিন্তা-ধারা একেবারে মধ্যযুগীয়। এঁকে আমরা কোথায় ফেলব? সংস্কৃতি না অপসংস্কৃতি, কোন্ পর্যায়ে?

ধর্ম অনেক সময় মানুষকে কিছু সৎ নিয়ম-কানুনের দ্বারা বেঁধে রাখে। জীবনে কিছুটা শৃঙ্খলা আনে। এ নিশ্চয়ই ভাল। কিন্তু, ধর্মের নামে যখন বজ্জাতি চলে? ধর্মের দোহাই দিয়ে যখন এদেশে টিকিধারী পণ্ডিত আর দাড়িওয়ালা মোল্লার দল দাঙ্গা বাধায়? ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন দেখা গেল বৌদ্ধ ভিক্ষুরা

মার্কিন সমরবাদকে মদত দিচ্ছে? কিংবা, যখন ক'দিন আগে শ্রীলঙ্কায় তামিল-নিধনে প্রকাশ্য রাজপথে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নামলেন? এ সব কি সংস্কৃতি?

আজও দেখি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে, রাজস্থানে বৃষ্টি না হলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সরকারী ব্যয়ে বৃষ্টির জন্য পূজা-যাগ-যজ্ঞ করেন, এবং তার ছবি সংবাদপত্রে ছাপা হয়। অথবা, এখনও যে সতীদাহ হচ্ছে, এবং সতীস্থানের পবিত্র স্পর্শে পুণ্য-লাভের উগ্র আকাঙ্ক্ষায় লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিল। এসব কি সংস্কৃতি-সঙ্গত?

বিপদে পড়লে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তিরুপতি ছুটতেন, জ্যোতিষীর বাড়ি যেতেন হাত দেখাতে। তাঁর অতি আধুনিক পুত্র, একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি যুগের সারথি রাজীব গান্ধীও একই কাজ করছেন। এও কি সংস্কৃতি?

গুরুবাদের মধ্য দিয়ে মানুষকে ধর্মের আফিমের নেশায় বুঁদ করে ফেলে দেবার চেষ্টা দিনের পর দিন বাড়ছে। যে-সব জায়গায় কখনও গির্জা দেখা যায় নি, এখন সে সব স্থানে অসংখ্য গির্জা গজিয়ে উঠছে। রাস্তায় দশ পা পর-পর শনি ঠাকুরের পুজো। সবই কি সৎ-কর্ম?

এই সবই অপ-সংস্কৃতি। সভ্যতার গতিপথে নিশ্চিত অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে এই সব কাজকর্ম।

এখন উপায় কি?

এই আঘাতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। বিকৃতমানের নৃত্য, গীত, নাটক প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিংবা সাহিত্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অপ-সংস্কৃতি বিস্তারের যে অপচেষ্টা তা কেবলমাত্র বক্তৃতা, মিছিল প্রভৃতির দ্বারা বন্ধ করা যাবে না সুস্থ সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের বিকল্প কর্মসূচী শিল্পী-সাহিত্যিক এবং এই ব্যাপারে উৎসাহী ব্যক্তিদের কাছে তুলে ধরতে হবে। দেখা গেছে, প্রথম থেকে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতি-কর্মের উৎসাহ দিলে তারা একে গ্রহণ করে এবং এ ব্যাপারে কৃতিত্বের সঙ্গে অগ্রসর হয়। এই কাজ ঠিক মতো করতে পারলে এই ক্ষেত্রে অপসংস্কৃতির আক্রমণ নিশ্চয়ই কিছুটা প্রতিহত করা যায়।

নৃত্য, গীত, নাটক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, নতুন যুগের আদর্শে গড়ে তুললে তা মানুষের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। সে কাজ করে যেতে হবে।

কিন্তু মূল সমস্যা আরও গভীরে, এবং বিষয়টি শ্রেণীবিচারে বিবেচনা করতে হবে। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ এখন অবক্ষয়ের শেষ সীমায় পৌঁছেছে। পুঁজিবাদের অবসান এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সর্বত্র জোরদার হচ্ছে। এই সংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্য, সংগ্রামমুখী মনোভাবকে নষ্ট করার জন্য নানা ভঙ্গিতে, অন্ধ

সংস্কার, ধর্মান্ধতা, পশ্চাৎগামী মানসিকতা, নগ্নতা, মদমত্ততা, বেলেল্লাপনা প্রভৃতির মাধ্যমে চেষ্টা চলছে। এবং স্থিতাবস্থার সমর্থকরাই এই কাজ করছে।

সুতরাং, যাঁরা সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে এগিয়ে আসবেন, আজ তাঁদের দায়িত্ব নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, নতুন মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে, সামগ্রিকভাবে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এবং, এই সংগ্রাম হবে নিরলস, একটানা।

আর পুঁজিবাদই বা বলি কেন, দীর্ঘদিন সমাজতন্ত্রের পথে চলার পর অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশেও আজ অপসংস্কৃতি উঁকিঝুঁকি মারছে। এব্যাপারেও প্রথম থেকেই কঠোর মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই জীবন। সুতরাং, এই সংস্কৃতিকে রক্ষা করতেই হবে।

মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল

জনগণতন্ত্রের সংস্কৃতি

প্রলেতারীয় কালচার বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে সমাজবাদী মতবাদ একটা বিপ্লবী মতবাদ। ইতিহাসের প্রথম সমাজবাদী রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং কমিউনিস্ট (তৃতীয়) আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠাতা, এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন সমাজবাদী বিপ্লবের ও রাষ্ট্রের সংগঠক হিসাবে সমাজবাদী রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি সমাজবাদী সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বহু তত্ত্ব ও নীতি ব্যাখ্যা ও প্রচার করেছিলেন। আজ তাঁর সেই বিপ্লবী সাংস্কৃতিক মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ ও গুরুত্ব অনেক। এই উপলক্ষে লেনিনের রচনা পড়া ও তাই থেকে শিক্ষা লাভ করা প্রত্যেক বিপ্লবী কর্মীর কর্তব্য।

আমাদের দেশে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ও সামাজিক চিন্তাধারার মধ্যে সাংস্কৃতিক বিকাশের যে-পর্যায়ের পরিচয় পাওয়া যায় তার উপর সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী দুই শ্রেণীরই প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রাচীন সামন্তবাদী চিন্তাধারার যেপ্রভাব ব্যাপকভাবে রয়ে গেছে তাকে বিপ্লবী উপায়ে মুছে ফেলা হয়নি বলে, এবং আধুনিক পুঁজিবাদী চিন্তাধারার প্রভাব প্রাচীন চিন্তাধারার প্রভাবকে সম্পূর্ণ হঠিয়ে না দিলেও, বরং তার সঙ্গে আপস করে বিরাজ করলেও, সমাজ জীবনে অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। রাষ্ট্রক্ষমতার উপর প্রধান শক্তি হিসাবে

বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাব সমাজ জীবনে এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে তাকে সাহায্য করবে।

শোষণ-বিরোধী সংস্কৃতি

লেনিনের মতে, সামগ্রিকভাবে মতবাদের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা একটা শ্রেণীভিত্তিক চিন্তাধারা। এই বিচারে প্রলেতারীয় সংস্কৃতি সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী সংস্কৃতির বিরোধী। প্রথমোক্ত দুইশ্রেণীর সংস্কৃতি নিজ নিজ পদ্ধতিতে সামাজিক শোষণের ধারক ও বাহক। শেষোক্ত বা প্রলেতারীয় সংস্কৃতির আশু লক্ষ্য তামাম শোষণ ব্যবস্থাকে নির্মূল করা। এই মৌলিক শ্রেণীগত বিরোধ শুধু সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয়, বর্তমান সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আছে, এবং শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা প্রকট হয়ে উঠছে।

একটি বিপ্লবী শ্রেণী যখন একটি প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর হাত থেকে বিপ্লবের পথে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নেয়, তখন পুরোন অর্থব্যবস্থার পরিবর্তে তার নিজস্ব বিপ্লবী অর্থব্যবস্থাও গড়ে তোলে এবং তার সাথে সাথে পুরোন সংস্কৃতির জায়গায় তার নিজস্ব শ্রেণীগত সংস্কৃতিও গঠন করে।

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে লেনিনের ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যখন রুশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণ মহান অক্টোবর সমাজবাদী বিপ্লবের পথে সে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে, তখন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পরিবর্তে সোশ্যালিস্ট রাষ্ট্র কায়েম করে, অর্থনীতিক ক্ষেত্রে সমাজবাদী অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলতে আরম্ভ করে। আর সেই সঙ্গে সমাজবাদী সংস্কৃতি গঠনের কাজও চালাতে থাকে।

উৎপাদন-ভিত্তিক শিক্ষা

সাংস্কৃতিক কাজের মধ্যে ব্যাপকতর জনশিক্ষা রাশিয়ার অর্থনীতিক গঠনের কাজে বিশেষভাবে সহায়ক হয়। তা ছিল উন্নত অর্থব্যবস্থা গঠনে অপরিহার্য। এই শিক্ষা সাধারণভাবে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পথেও সাহায্য করে। তবে সমাজবাদী জনশিক্ষা বুর্জোয়া ব্যবস্থায় যেমন সেভাবে কেতাবী বিদ্যায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলে না, কেতাবী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাকে উৎপাদনের কাজের সাথেও অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করা প্রয়োজন। লেনিন এই শিক্ষার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। এ ধরনের মিলিত শিক্ষাপদ্ধতিকে ব্যাপক করে তুলতে হলে রাষ্ট্র-ক্ষমতার সাহায্য দরকার, শুধু প্রচারের দ্বারা তা হতে পারে না।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত ও সার্থক করতে হলে তার জন্য

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে শ্রেণী-চেতনা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন, যাতে তারা অর্থব্যবস্থা গঠনের কাজে বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থ উৎখাত করে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতি পরিচালনায় সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর মতবাদ ও রাজনীতির ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেননা এই শ্রেণীগত রাজনীতির অভাব থাকলে, এমন কি অগ্রণী ভূমিকা না থাকলেও প্রলেতারীয় অর্থব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতি গঠনের কাজ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে, হয়েও যায়। এ বিষয়ে লেনিনের হুঁশিয়ারী সকল সময়েই মনে রাখা প্রয়োজন।

সংস্কৃতির মূল মনের গভীরে

প্রলেতারীয় অর্থব্যবস্থা গঠনের কাজ সম্ভব হয় শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবার পর, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব কায়েম হবার পর। কারণ রাষ্ট্রক্ষমতার সাহায্য ছাড়া, বুর্জোয়া শ্রেণীর শোষণ-ভিত্তিক অর্থব্যবস্থাকে নির্মূল না করে সমাজবাদী অর্থব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব নয়। অর্থব্যবস্থার এই শ্রেণীগত মৌলিক পরিবর্তন ঘটাবার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর তীব্র প্রতিরোধ দমন ও ব্যর্থ করে, তাকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করে পথ পরিষ্কার করে দিতে পারে একমাত্র প্রলেতারীয় রাষ্ট্রক্ষমতা।

কিন্তু সংস্কৃতি ক্ষেত্রে শ্রেণীগত বা মতবাদগত পরিবর্তন ঘটাবার কাজ আরম্ভ করবার জন্য, বুর্জোয়া সমাজে প্রলেতারীয় সংস্কৃতির প্রচারের কাজ অন্তত কিছু পরিমাণে চলতে পারে প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্র কায়েম হবার আগেও।

সমাজজীবনে সংস্কৃতির ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক, সমাজ জীবনের সমানই ব্যাপক। সামগ্রিকভাবে সমাজ জীবনে যেমন, তেমনি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেও তার চিন্তা ও চেতনার মধ্যেও প্রচলিত সামাজিক সংস্কৃতির কিছু না কিছু প্রভাব থাকতে পারে। সে মতবাদকে অবলম্বন করে প্রত্যেক মানুষের বা ব্যক্তির মধ্যে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্বন্ধে চিন্তা, চেতনা, মত ও ধারণা উৎপন্ন ও পুষ্ট হয়, গড়ে ওঠে, তার প্রভাব শুধু ব্যাপকই হয় না, সমাজের ও ব্যক্তির মনের গভীরেও তা' প্রবেশ করে, শিকড় গাড়ে।

তাই একটা শ্রেণী তার রাষ্ট্রক্ষমতার সাহায্যে তার বিরোধীশ্রেণীর অর্থব্যস্থাকে যত অল্প আয়াসে ও যত অল্প কালের মধ্যে ভেঙে দিয়ে, চূড়ান্তভাবে ধ্বংস ও নির্মূল করে নিজস্ব অর্থব্যবস্থা গড়তে ও কায়েম করতে পারে, সেই শ্রেণী তার রাষ্ট্রক্ষমতার হাজার সাহায্য নিয়েও তত অল্প আয়াসে ও তত অল্প সময়ে

তার বিরোধী শ্রেণীর সংস্কৃতিকে চূড়ান্তভাবে ও স্থায়ীভাবে নির্মূল করে নিজস্ব সংস্কৃতিকে কায়েম করতে পারে না। একথা বিশেষভাবে খাটে শোষণ বিরোধী প্রলেতারীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে।

দীর্ঘস্থায়ী শ্রেণীসংগ্রাম

কোনো অর্থব্যবস্থাকে ভাঙা বা গড়া হলো কি না, কোন্ শ্রেণীর অর্থব্যবস্থা ধ্বংস করে অন্য কোন্ শ্রেণীর অর্থব্যবস্থা সৃষ্টি করা হলো, তার পরিচয় ও প্রমাণ দৃশ্যতই ও সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃতি যখন কোনো ব্যক্তির মন ও মানসিকতাকে অবলম্বন করে ব্যাহৃত অদৃশ্য অবস্থায় থাকে, শুধু তার চিন্তা, চেতনা, মত ও ধারণার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় —সে মানসিকতাকে, যে চেতনা বা মত প্রভৃতিকে গোপন করা বা অপরের অলক্ষ্যে রেখে কাজ করা সম্ভব—তখন তাকে ধরা বা তার নিশ্চিত পরিচয় পাওয়া সহজ হয় না, অনেক সময় সম্ভবও হয় না। তা আরো কঠিন বা অসম্ভব হয় এই কারণে যে কোনো একটা বিশেষ ধরনের চেতনা বা ধারণা যার মনকে অবলম্বন করে থাকে, তার কাছেও তা অস্পষ্ট হতে পারে, তার অজান্তেও কাজ করে যেতে পারে। কোনো নতুন-গড়া সমাজব্যবস্থার মধ্যে পুরোন শ্রেণীর সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনা নির্মূল করে নতুন শ্রেণীর সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনাকে কায়েম করা দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ এবং দীর্ঘস্থায়ী সঠিক শ্রেণীসংগ্রামের উপর নির্ভরশীল। সমাজে অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটানোর পরও মৌলিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শ্রেণীগত রাজনীতির ভূমিকা ও নির্দেশ অগ্রগণ্য ও অপরিহার্য

মতবাদগত প্রচারের সুযোগ

তাহলে এ কথা বলা যায় যে, আমাদের দেশে বর্তমানে প্রধানতঃ বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা কায়েম থাকা সত্ত্বেও এই সমাজের মানুষের চিন্তা ও চেতনাকে পরিবর্তন করবার জন্য মার্কসবাদী-লেনিন-বাদী বা প্রলেতারীয় অর্থনীতিক তত্ত্ব ও নীতির মতো সাংস্কৃতিক তত্ত্ব ও নীতি প্রচার করা যেতে পারে। এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শোষণ ব্যবস্থা পরিবর্তন করার পূর্বেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তা ও চেতনার মধ্যে, তাদের মত ও ধারণার মধ্যে, তাদের মানসিকতার মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনা সম্ভব। এই উপায়ে তাদের মধ্যে শোষণ-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে তার পরিবর্তে

শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে এবং তার সপক্ষে তাদের মনে নতুন চিন্তা ও চেতনা জাগিয়ে তোলা এবং ক্রমশ তাদের প্রলেতারীয় সমাজ বিপ্লবের পক্ষে সচেতন ও সংগঠিত করা সম্ভব।

এই সম্ভাবনা থাকে বলেই ইতিহাসে শ্রেণীবিপ্লব বা সমাজ বিপ্লব ঘটেছে এবং আরো ঘটবে। সেই কারণেই আমাদের দেশেও প্রলেতারীয় মতবাদের পক্ষে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মতবাদগত বুনিয়াদের পক্ষে ব্যাপক জনমত ও বিপ্লবী পরিস্থিতির উদ্ভব চিনতে ও স্বীকৃতি দিতে পারা যাচ্ছে।

এ সবই মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রবর্তিত প্রলেতারীয় মতবাদ ও তত্ত্বগুলিকে লেনিনের তত্ত্ব ও নীতি অনুসারে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ও বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা সম্বন্ধে তাঁর শিক্ষার ফল। পুঁজিবাদী দুনিয়ার কোটি কোটি শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষ এই সব তত্ত্ব ও নীতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হচ্ছে। বর্তমান প্রলেতারীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন তারই একটা বহিঃপ্রকাশ।

এই আন্দোলনের একটা প্রধান কাজ বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল ও অবক্ষয়ী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আরো ব্যাপক ও শক্তিশালী অভিযান সৃষ্টি কর। যারা এই আন্দোলনে এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে ও সাধারণভাবে প্রলেতারীয় বিপ্লবে বিশ্বাসী, এ বিষয়ে তাদের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে।

প্রলেতারীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন

প্রলেতারীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে আমাদের দেশের বিশেষতঃ বাংলাদেশের রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ ও তার কর্মী ও সমর্থকরা বর্তমানে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে নিজেদের রাজনীতিক লক্ষ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এই লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার জনগণের গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। প্রলেতারীয় নেতৃত্বে গঠিত এই ফ্রন্ট সমাজবাদী বিপ্লবের একটা প্রাথমিক স্তরের বিপ্লবী সংগঠন। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত গণতান্ত্রিক শ্রেণীগুলিকে সংগঠিত করে, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মিতালির ভিত্তিতে শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য পেটিবুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত গণতান্ত্রিক শ্রেণী ও শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করতে হবে।

এই ফ্রন্ট গঠনের উদ্দেশ্যে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক প্রচার

আন্দোলন চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে, তাকে পুষ্ট ও জোরদার করে তোলবার জন্য, তাকে আরো ব্যাপক ও তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের পথে পরিচালিত করবার কাজে সাহায্যের জন্য প্রলেতারীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গুরুত্ব সমধিক।

জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের কাজটা কেবল রাজনীতিক বা সাংস্কৃতিক কর্মীদেরই দায়িত্ব নয়। বাংলাদেশের সমাজের বৃহত্তম অংশ কৃষক ও ক্ষেতমজুর শ্রেণী। গ্রামাঞ্চলে কারিগর প্রভৃতি অন্যান্য মেহনতকারী শ্রেণীও আছে। তাদের অধিকাংশই নিরক্ষর। তাদের সাধারণ শিক্ষা দেবার কাজে ছাত্র ও যুব সমাজ যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। দেশকে চিনতে হলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এই সহযোগিতার দ্বারা ছাত্র ও যুবকরা ফ্রন্ট গঠনে সাহায্য করতে পারে।

এই প্রয়োজন শ্রমিকদেরও আছে, অন্যান্য শ্রেণীর লোকের চেয়ে বেশিই আছে। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বেই তৈরি হবে শ্রমিক-কৃষক মিতালি। সেজন্য কৃষকদের বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে শ্রমিক শ্রেণীকে। তার জন্য কেবল নীতির প্রচারই যথেষ্ট নয়, কৃষকদের সঙ্গে সশরীরেও যোগাযোগ রাখা এবং রাজনীতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, উৎপাদনের কাজ ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করা প্রয়োজন। এই উপায়েও কিছু পরিমাণে রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক প্রচারের কাজকে এগিয়ে নেওয়া হবে। এ কাজ ইতিমধ্যেই চলছে।

শাসক শ্রেণীদের স্বার্থে বিশ্বাসঘাতকতা

এই বিষয়ে বাংলার যুক্তফ্রন্টও একটা ভূমিকা পালন করেছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে এবং তার সাহায্যে বাংলার শ্রমিক শ্রেণী তার শক্তিশালী আন্দোলনের ও সংগঠনের জোরে বিভিন্ন শিল্পে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দাবি আদায় করেছিল এবং সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে নিজের রাজনীতিক চেতনা ও সাংগঠনিক শক্তি বাড়িয়ে দিতে পেরেছিল। তার ফলে স্বভাবতই মালিক শ্রেণী ও তার সমর্থকরা শ্রমিকদের সাংগঠনিক শক্তির ও তার সমর্থক যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে।

তেমনি জমি ও ফসলের আন্দোলন উপলক্ষে গ্রামাঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে যে অভূতপূর্ব অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল, তার মধ্যে দিয়ে লক্ষ লক্ষ কৃষক ও ক্ষেতমজুর লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি ও তার ফসল পেয়েছিল। এবং নিজেদের রাজনীতিক চেতনা ও সাংগঠনিক শক্তি

বাড়াতে পেরেছিল। স্বভাবতই গ্রামাঞ্চলের কায়েমী স্বার্থবাদী জোতদার শ্রেণী ও তার সমর্থকরা সেজন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। বিক্ষোভের কারণ, যুক্তফ্রন্ট সরকার পূর্বেকার কংগ্রেস সরকারের মতো কৃষকদের আন্দোলন দমন করবার জন্য পুলিশ পাঠিয়ে জোতদারদের সাহায্য করেনি এবং তা না করায় কৃষকদের অভ্যুত্থানকেই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণী আন্দোলনকে এবং সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন না করে এইভাবে সাহায্য করাই ছিল অবশ্য যুক্তফ্রন্টের সর্বসম্মত ও স্বীকৃত নীতি। সেজন্য সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি মারফত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীরা সংগ্রামী জনগণের মনে উৎসাহ সৃষ্টি করেছিলেন, যুক্তফ্রন্ট এই জনকল্যাণকর নীতিকে কার্যকরী করার জন্য তাদের আন্দোলনে সাহায্য করেছিলেন। আন্দোলনে এ ছিল প্রলেতারীয় সংস্কৃতির অবদান।

অথচ যুক্তফ্রন্টের ও তার সরকারের এই নীতিকে কাজে পরিণত করবার যে ব্যবস্থা হয়েছিল, তাতে শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণীসংগ্রাম যতটুকু অগ্রসরহতে পেরেছিল, তাই দেখেই যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী কায়েমী স্বার্থবাদীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল এবং তা শহরের ও গ্রামাঞ্চলের বড় বড় শিল্পপতি ও জোতদার মহাজনদের পৃষ্ঠপোষক কয়েকজন যুক্তফ্রন্ট নেতার নিকট অসহনীয়বোধহয়েছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন এর দ্বারা গ্রামাঞ্চলে সামন্তবাদী শোষক শ্রেণীর প্রভুত্বের ও দাপটের দিন ফুরিয়ে আসছে। তাই তাঁরা জনগণের স্বার্থকে পদদলিত করে তাদেরই তৈরি করা যুক্তফ্রন্ট ও তার সরকারকে ভেঙে দিয়ে খোলাখুলি নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল ও জনবিরোধী শ্রেণী-চরিত্রের পরিচয় দেন এবং জনগণের যুক্তফ্রন্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। তারপর আসে রাষ্ট্রপতি শাসন। আর আসে জনসাধারণের উপর পুলিশী হামলা।

এই নতুন রাজনীতিক পরিস্থিতিতে যুক্তফ্রন্ট আমলের সফলতাগুলিকে রক্ষা করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সেজন্য সাংস্কৃতিক দিক থেকেও আরো নতুন কাজের দায়িত্ব এসে পড়েছে। সে দায়িত্ব সাংস্কৃতিক কর্মীরা নিশ্চয়ই যথাযথ পালন করবেন। সরকারী দমন ব্যবস্থার প্রতিরোধেও এগিয়ে আসবেন। সংস্কৃতি রাজনীতির অনুগামী ও সহায়ক।

জনগণের "সংগ্রামের হাতিয়ার" যুক্তফ্রন্ট সরকার এক বছরের মধ্যেই যতটুকু কাজ করতে পেরেছিল তার দ্বারা জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের কতকটা অগ্রগতি অবশ্যই হয়েছে। গণ-আন্দোলনের ও শ্রেণী আন্দোলনের অগ্রগতির ভিতর দিয়ে বেশ খানিকটা রাজনৈতিক ও বিপ্লবী চেতনা ও সংগঠিত শক্তি

প্রকাশ পেয়েছে। যুক্তফ্রন্টের ও শোষিত মেহনতী জনগণের এই সফলতা ও অগ্রগতিকে সাংস্কৃতিক কর্মের দ্বারা জনগণের সামনে তুলে ধরা দরকার। সেই সঙ্গে দরকার কোন্ কোন্ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে কোন্ কোন্ শ্রেণীর স্বার্থ বরবাদ করবার আগ্রহের ফলে এই বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে তাও জনগণের সামনে প্রকাশ করে দেওয়া। জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের অগ্রগতিতে বাধা দিয়ে কারা শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থে আঘাত করেছে এবং কেন তা করেছে, আর এই অপকর্মে কারা তাদের দোসর ছিল সেকথা ব্যাখ্যা করবার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক প্রচারে সাহায্য করবার জন্য সাংস্কৃতিক কাজের প্রয়োজন। এটা বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রলেতারীয় সংস্কৃতির শ্রেণী-নীতি প্রয়োগের একটা ক্ষেত্র।

প্রলেতারীয় সাংস্কৃতিক প্রচারের জোর যত বৃদ্ধি পাবে সেই অনুপাতে প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি তার বিরোধিতা ততো তীব্রতর করবে। সেজন্য কায়েমী স্বার্থের রক্ষা করা ও প্রলোভনের দ্বারা প্রলেতারীয় সংস্কৃতির অগ্রগতিকে যথাসাধ্য বাধা দিতে চেষ্টা করবে। এই অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী অবক্ষয়ী সংস্কৃতির প্রচারের জন্যও নতুন নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। তার একটা নমুনা কলকাতার "মুক্ত মেলা"। এই প্রচেষ্টা যুক্তফ্রন্টের সময় দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল, রাষ্ট্রপতির শাসন ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হয়। এই ধরনের অনুষ্ঠানকে আপাত-নির্দোষ বলে দেখানো হয়, কিন্তু তার সাহায্যে সুস্থ ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রচারের পথ রুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে মানুষকে অন্য পথে টেনে নেবার ও দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলবার চেষ্টা হয়ে থাকে। "মুক্ত মেলার বেলেল্লাপনা" এখন আর "কমিউনিস্ট প্রচার" নয়, অপসংস্কৃতির অনুষ্ঠান

"সাংস্কৃতিক" অনুষ্ঠানের মারফতে এই রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিরুদ্ধে সমস্ত প্রগতিশীল মানুষকে সজাগ ও সচেতন হতে হবে।

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ

জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনে প্রলেতারীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। উপন্যাস, নাটক, সংগীত, ফিল্ম, সাংবাদিকতা ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকেই তাকে সাহায্য করা যায়। প্রলেতারীয় মতবাদ বা মার্কসবাদী লেনিনবাদী নীতি-প্রচার করতে এগুলির প্রত্যেকটিরই প্রভূত শক্তি ও সম্ভাবনা আছে। কেবল দেখতে হবে যেন প্রকৃত প্রলেতারীয় শ্রেণী-সংগ্রামের ধারক ও বাহকের কাজ করে, সংশোধনবাদের ও হঠকারিতার এবং গোড়ামির বিরুদ্ধে সঠিক পথে কাজ করে, আর্ট বা শিল্পকলাকে বিমূর্ত ও প্রাণহীন আর্ট হিসাবে না

দেখে শ্রেণী-সংগ্রামের সক্রিয় হাতিয়ার বলে গ্রহণ করে, আর সমাজের সম্পদ উৎপাদনকারী মানুষকে সমাজের তামাম সম্পদ ও শক্তির এবং সমস্ত সংস্কৃতির মূল উৎস বলে স্বীকৃতি দেয়।

কিন্তু আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক প্রচারের এই বাহনগুলিকে যেরূপ ব্যাপকভাবে অপসংস্কৃতির ও অবক্ষয়ী সংস্কৃতির প্রচারে কাজে লাগানো হচ্ছে, সে কথা ভাবলে এদেশে সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার কারণ দেখা যায়। যারা জীবনের পরিবর্তে মৃত্যুর জয়গান করে, যারা আলোকের পরিবর্তে অন্ধকারের মহিমা কীর্তন করতে ভালবাসে, যাদের চোখে সামাজিক সম্পদ সৃষ্টিকারীর চেয়ে পরগাছা নিষ্কর্মার কদর বেশি, তারা লেনিনবাদী সাংস্কৃতিক নীতির বিরোধিতাই করতে পারে এবং করবেও। সেইজন্য তাদের প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ সংগ্রাম দরকার। অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে গণ-আন্দোলনের জোয়ারের সাথে সাথে গণ-সংস্কৃতির আন্দোলনকেও তাই বিপুল শক্তিতে এগিয়ে নিতে হবে।

দেশের বর্তমান অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট যেভাবে ক্রমশই গভীরতর হয়ে উঠছে, তাতে সাংস্কৃতিক সঙ্কটও তীব্রতর হতে থাকা স্বাভাবিক। তার উপর সাম্রাজ্যবাদী, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী অবক্ষয়ী সংস্কৃতির নোংরা বাস্তবতার ও রুচিবিকারের প্রভাব তাকে আরো গভীর পঙ্কের মধ্যে টেনে নিতে চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিরোধ একান্ত প্রয়োজন। সে-প্রতিরোধ সংগঠন করতে পারে প্রলেতারীয় রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত গণ-আন্দোলনের সঙ্গে গণ-সংস্কৃতির আন্দোলনের মিলন। লেনিনবাদী সাংস্কৃতিক তত্ত্ব ও নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রলেতারীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনই পারে সে কাজ করতে।

বিপ্লব ও বাস্তবধর্মী শিল্পকর্ম

আমাদের দেশে যেখানে সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী সংস্কৃতিকে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত, তাকে প্রতিক্রিয়াশীল ও অবক্ষয়ী সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হলে তার বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় সাংস্কৃতিক মতবাদকে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে। সেজন্য উপযুক্ত রাজনীতিক চেতনা ও মনোবল নিয়ে লড়তে হবে, তার হাত থেকে সুস্থ ও প্রগতিশীল সংস্কৃতিকে উদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে, এবং তাকে ক্রমশ জনগণতান্ত্রিক চরিত্রের সংস্কৃতিতে পরিণত করতে হবে। সে জেহাদ শুরু করতে আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

প্রলেতারীয় ও জনগণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে যাদের বিশ্বাস আছে তারা বাস্তবতাবর্জিত "আর্ট ফর আর্ট'স সেক" মানতে পারে না। সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির কাজে তাদের বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে বিপ্লবী বাস্তবতার সঙ্গে বিপ্লবী কাল্পনিকতার সংমিশ্রণ, যার সাহায্যে সাধারণ মানুষের মনে সমাজ বিপ্লবের চিন্তা জাগাতে পারা যায়, মানুষকে বিপ্লবী চেতনা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়। এ ধরনের সৃষ্টি নির্ভর করে শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক মানুষের বাস্তব সামাজিক জীবনের ও উৎপাদন কর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর, সে সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর। এই ধরনের শিল্প সৃষ্টিই সজীব ও সার্থক শিল্প হতে পারে এবং তা প্রলেতারীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে পারে। এই গুণ ও চরিত্র না থাকলে শিল্পকে জনগণের গণতান্ত্রিক শিল্পে ও সংস্কৃতির অংশে পরিণত করা যাবে না।

পুঁজিবাদী সমাজের সাংস্কৃতিক ভাবনা

সম্প্রতি মার্কিন মুলুকে একটি গণ-আত্মহত্যার ঘটনা হয়তো আমাদের অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অলৌকিক ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণে অভ্যস্ত মার্কিন নাগরিকদের এক সম্প্রদায় বেশ কিছুদিন চলতি সভ্যতা থেকে পাশ কাটিয়ে বিচ্ছিন্ন জীবনধারা গড়ে তুলেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের যিনি গুরু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাস্তব পারিপার্শ্বের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁদের আত্মিক সঙ্কটের মুক্তি নেই। সেই সঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য সেই গুরুমশাই নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে গোটা সম্প্রদায়কে গণ-আত্মহত্যার দাওয়াই দিয়েছিলেন। মার্কিন পুলিস বাহিনী যখন সেখানে গিয়ে প্রবেশ করলো তখন দেরী হয়ে গেছে। কয়েকশো মৃতদেহ ভিড করে পড়ে আছে গোটা অঞ্চল জুড়ে। এই ঘটনা একটি মার্কিন সংবাদপত্রে পড়ে এ রাজ্যের একজন কবির কবিতার লাইন আমার মনে পড়েছিলো—

তবু হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিল জীবনের ভুলে
অন্ধকার হয়ে আছি, অন্ধকারে থাকবো এবং
অন্ধকার হবো!
আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।
(শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

পুঁজিবাদী সমাজের এই আত্মিক সঙ্কটের সূত্রপাত, বলা বাহুল্য, সেইদিন থেকে যেদিন পুঁজিবাদ নিজের নিয়মে সঙ্কটের জালে আবদ্ধ। হিংস্র সাম্রাজ্যবাদী

লোলুপতাও তার তৃষ্ণা মেটাতে পারছে না। সে নিজের নিয়মেই দানবে পরিণত হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের নীল আকাশকে সে হারিয়েছে, ভুলেছে দেশান্তরে পাড়ি দেবার সুদূরের আহ্বান। সৌন্দর্যবোধ, মানবিকতা, স্বাধীনতা, মৈত্রী পণ্যের মতো সের দরে বিক্রি হয়ে গেছে। বুর্জোয়া শিল্পে ভাবনার এই আত্মিক সঙ্কট, তাকে বলা যেতে পারে—anarchy of capitalism in the human spirit—Ralph Fox।

ইতিহাসের বিবর্তন ধারায় একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ শ্রেণীর মানুষের বিযুক্তিকে (alienation) যাঁরা চিরন্তন সত্যের দার্শনিকতা মণ্ডিত করতে চাইলেন, সেই বিচ্ছিন্নতার ঐতিহাসিক শিকড়কে না খুঁজে বা সেই পরিবর্তনের পথে ব্যক্তির ভূমিকা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে উপস্থিত না করে বুঝতে অস্বীকার করে—"world is not in me, I am in the world." তাঁরা সার্ত্রে'র মতন অস্তিত্ববাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সমাধান খুঁজতে গেলেন, অথবা সুররিয়ালিস্টদের মতন স্বপ্নের জগতে মুখ ফেরালেন, নয়তো গোটা দুনিয়াকে দেখলেন উল্টো হয়ে ঝুলছে, কাফ্‌কার মতন বা আলবেয়র কামুর মতন সনাতন নৈরাশ্যবাদকেই সোচ্চার করলেন—"Rock is still rolling, we are all sysyphus". পঞ্চাশের দশকে একজন জাপানী ঔপন্যাসিকের একটি উপন্যাসের নায়ক আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার আগে তাঁর শেষ চিঠিতে রুদ্ধ কপাট খুলে ইতিহাসের দিকে তিনি একটু তাকিয়েছিলেন। তাঁরই চিঠির একটি অংশ, "We are all victims of traditional period of morality". নিজেও আত্মহত্যা করেছিলেন ঐ জাপানী ঔপন্যাসিক, নাম তাঁর ওসামুজাদাই। মনে পড়ে বিখ্যাত রুশ কবি এসেনিন আত্মহত্যা করেছিলেন। তাঁর শোকসভায় তাকিয়ে মায়াকোভস্কির বিখ্যাত কবিতা মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের জয়গান। কিন্তু কে জানত, খোদ সমাজতন্ত্রে বসে মায়াকোভস্কি আত্মহননের পথ নেবেন? প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী সভ্যতার শতাব্দীব্যাপী জমে থাকা অন্ধকার, হিংস্র প্রতিযোগিতার দিনগত পাপ ও আত্মহননের হাতছানি থেকে মূল মানবশ্রেণীর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার যে দার্শনিক সমস্যা, যাকে বলা যেতে পারে from alienation to integration-এর সমস্যা, সেটি গোটা ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগেই একটি মানবিক ও দার্শনিক সমস্যাও বটে।

একটি বিশেষ যুগের সাংস্কৃতিক চিন্তা, নন্দনতত্ত্বের ধারণাগুলি বিচারের মাপকাঠি হিসাবে মার্কস-এঙ্গেলস্ একটি সূত্রের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। একটি বিশেষ সমাজের অর্থনৈতিক উপাদান ও রাষ্ট্র-কাঠামোর

উপর যাঁদের কর্তৃত্ব থাকে, তাঁরা ভাবাদর্শের জগতেও কর্তৃত্ব করেন। তাঁরা শুধু সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলিকে পণ্যের মতো চড়া দামে বিক্রয় করেই ক্ষান্ত নন, নিজেদের শ্রেণীর দর্শনে জনগণকেও কলুষিত করেন। এই কলুষতা ও আবর্জনা গায়ে মেখে সমাজ-রহস্যকে বুঝতে অস্বীকার করে শিল্পীর স্বাধীনতার রণহুংকার সবদেশেই শোনা গেছে। এমন কি পঞ্চাশ বছর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে ঘর করে সল্‌ঝেনিৎসিনের মতো লেখকদেরও আজও জন্ম হয়। এঁরা কেউ কেউ প্রাচীন-পন্থী কলাকৈবল্যবাদী। দুটি বিশ্বযুদ্ধের আগুনের হল্‌কা থেকে হয়তো গা বাঁচিয়েছেন, নয়তো পরম ব্রহ্মের সাধক। বস্তু ও মনের বিতর্কে বস্তুজগতকে তুচ্ছ জ্ঞান করে দুর্লভ স্বাধীনতা পিয়াসী, নয়তো সোজাসুজি লেনিনের ভাষায় রাজকোষের অর্থ, দুর্নীতি ও পতিতাবৃত্তির ভাগীদার হয়েছেন। এই শিল্পীকুলকে Christopher Caudwell একটু ব্যঙ্গ করে বলেছেন—

"Sheething its eyes to beauty, turning its face on science, only follows its ·stupidity to the end. It crucifies liberty upon a cross of gold and if you ask in whose name it does this, it replies—in the name of personal freedom."

এই সমস্যাই বিগত কয়েকটি দশক ধরে যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বুর্জোয়া সাহিত্যে প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে। মার্কিন মুলুকে বীট কবিদের আন্দোলন, ইংল্যাণ্ডের 'অ্যাংরি জেনারেশন'-এর নাট্য আন্দোলন আমাদের দেশেও তুফান তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে বণিক সভ্যতা নিজেদের পতনোন্মুখ অবস্থার সপক্ষে নেশাগ্রস্ত করতে চাইছে মানুষকে। শক্তিশালী সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলিকে তারা বিপুলভাবে ব্যবহার করেছে। নয়া-উপনিবেশবাদের ফেরিওয়ালারা 'কোকাকোলা' সংস্কৃতির ভস্ম ছড়িয়েছে বিশ্বময়। নিজেদের সমাজ-দেহের রোগের জীবানুকে তারা পুঁজির মতই রপ্তানি করেছে তৃতীয় দুনিয়ার দেশে দেশে। নেশা, আত্মহত্যা, অপরাধ-প্রবণতা, সর্বব্যাপী লিবিডোতন্ত্র, অলৌকিকতা সর্বোপরি প্রগতি ও সাম্যবাদ-বিরোধিতার জীবনদর্শন।

এবারে একটু দেশের মাটিতে আসা যাক। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের অবস্থাটি হলো, ঐতিহাসিকভাবে অচল শ্রেণীগুলি ক্ষমতা আঁকড়ে থেকে দেশের গণতান্ত্রিক বিকাশকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। প্রাক্-পুঁজিবাদী এবং প্রাচীন পদ্ধতিতে কৃষি ব্যবস্থার অনড় গোদের উপর পুঁজিবাদী শিল্পবিকাশের বিষ-ফোঁড়াটি জন্মসূত্রেই বিকলাঙ্গ। সঙ্কট আর্থ-সামাজিক জীবনকে গ্রাস করছে। সাংস্কৃতিক জীবনকেও কলুষিত করছে। শবদেহের পচা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। দারিদ্র্য,

নিরক্ষরতার বেড়াজাল, নিয়তিবাদ, অদৃষ্টবাদ, ধর্ম, সম্প্রদায়ের ভেদবুদ্ধিতে প্রবল শক্তিসম্পন্ন জনগণের অধিকাংশ আজও সাংস্কৃতিক অর্থে নিস্তেজ। এই সবই হলো অসম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্যা। এরই পাশে শিল্পমেলা ও বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামও চলছে। হনুমান ও গরু দেবতা হিসেবে আজও পূজিত হচ্ছে। আবার ৩৩ কোটি দেবতাকে ছাড়িয়ে সন্তোষী মা বা সাঁইবাবারা তালিকা বাড়াচ্ছে।

পশ্চিমবাংলার প্রতিক্রিয়ার শিবির সংস্কৃতির মঞ্চে বেশ খানিকটা সংগঠিত। সমাজ কাঠামো যত পচছে, এদের প্রতিক্রিয়ার উগ্রতা তত বাড়ছে। এইটাই নিয়ম। জাতীয় সঙ্কটের পটভূমিকায় শিল্পীর স্বাধীনতার রণধ্বনিতে এরাও সোচ্চার। এই স্বাধীনতার অর্থ কি? এদের একজন প্রতিষ্ঠিত লেখকের উপন্যাসের নায়কের স্বগতোক্তি—কোনো কোনো মানুষ জন্মসূত্রেই গ্রহের ফেরে পতিতাসক্ত হয় এবং সেটি নাকি চিরন্তন সত্য। আর একজন লেখক একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য হলো আদিবাসীদের দলবেঁধে নাচা। বলা বাহুল্য, দেশী বিদেশী মাদক দ্রব্যের সংমিশ্রণে এরা প্রগতির বিরুদ্ধে বিরাট পসরা সাজিয়ে বসেছে। চলচ্চিত্রের মতন শক্তিশালী শিল্প মাধ্যমটি ফাটকাবাজদের নিয়ন্ত্রণে,কলকাতার নাট্য মঞ্চগুলিতে কালোবাজারী ব্যবসায়ীদের আনাগোনা। সত্তরভাগ দারিদ্র্যসীমার নীচে যে দেশ, সেই দেশের নেশাকে আরও তীব্র করতে হবে। সংস্কৃতির সমস্ত মাধ্যমগুলিতে শত্রুরা সক্রিয়। অতি সম্প্রতি ধর্মীয় কুসংস্কার ও যৌনতার এক বেপরোয়া প্রতিযোগিতা চলছে। ফ্রয়েডীয় বস্তাপচা সূত্রগুলির উপর দাঁড়িয়ে, যা লেনিনের ভাষায় বুর্জোয়াশ্রেণীর লাম্পট্য ও ক্ষয়ের লক্ষণ, তাকেই ছড়িয়ে দেবার এক সুনিপুণ উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এই যৌনতার বিষ-খাওয়া-ইঁদুরের মতো আস্ফালনের দিকে তাকিয়ে কতদিন আগে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

"ভেবে দেখলাম যৌন অত্যাচারের হাত থেকে মানুষের উদ্ধার পেতে হলে প্রথমে প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। মানুষ তার শ্রম খাটিয়ে ভালভাবে বাঁচতে শিখলে অনেক গ্লানির পাঁক থেকে সে নিজেকে তুলে ধরতে পারবে।"
—একটি বখাটে ছেলের কাহিনী।

এই ছিল একজন শিল্পীর দ্বিতীয় জন্ম। প্রাগৈতিহাসিক, চতুষ্কোণের রচয়িতা যে শিল্পী, তারই সফল পরিণতি। আর, ধর্মীয় প্রসঙ্গ, এ-ও এক বিরাট হাতিয়ার। মার্কস লিখেছিলেন, যে মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করতে পারেননি বা আবার নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন, তার কাছে ধর্মের অনুভূতি স্বাভাবিক।

আমাদের দেশে গরিষ্ঠ অংশের সমস্যা হলো নিজেকে আবিষ্কার না-করার সমস্যা। দেশের আর্থিক-সামাজিক পিছিয়ে পড়া অবস্থাও তার জন্য দায়ী। তারই উপর দিয়ে বাবা তারকনাথের সোচ্চার পদযাত্রা। এর পিছনেও রয়েছে কিন্তু প্রতিক্রিয়ার সংগঠিত উদ্যোগ। সমাজপরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা থেকে স্থিতাবস্থার অন্ধকারে আটকে রাখতে হবে সমাজের গতিকে।

ধনতন্ত্রের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে সমাজতন্ত্রের শিকড় গড়ে উঠেছে দুনিয়া জুড়ে তারই মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে মার্ক্সীয় শিল্প ভাবনার সূত্রগুলি, মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্বের চেতনা। ইতালির ক্যাথলিক বিশ্বাসে লালিত দার্শনিক ক্রোচে, তাঁর জীবনে হাতেখড়ি করেছিলেন মার্ক্সীয় ইতিহাস-চেতনার বিরোধিতা করে এবং সেই ভদ্রলোকই ১৯০২ সালে বুর্জোয়া নন্দনতত্ত্বের ধারণাগুলি পুঁথিবদ্ধ করেন। সেই ধারণাগুলি আজ কিছু বিদ্যায়তনে পাঠ্য তালিকায় অঙ্গীভূত হলেও বুর্জোয়া সমাজের ও তাত্ত্বিকদের কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, কারণ বুর্জোয়া শিল্পভাবনাই এখন দিকভ্রষ্ট। একজন সমালোচকের ভাষাতে—'জাঁকজমকপূর্ণ গ্লানিতে পরিণত হয়েছে'। অপরদিকে বিকাশমান শক্তি হিসেবে আন্তর্জাতিক মঞ্চ জুড়ে ফুটে উঠেছে মার্ক্সীয় শিল্পভাবনার বিকল্প শিবির। ছবিটি এখনও সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু প্রথম সূর্যের আলোয় সে উদ্ভাসিত, নতুন পথ চিনে সে চলতে শুরু করেছে। লেনিন সেই শিল্পভাবনাকে বলেছিলেন এটা ভুঁইফোড় নয়, কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মস্তিষ্কপ্রসূত উদ্ভাবনও নয়। মানব জাতির বিকাশের ধারা বেয়ে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, মানব সমাজ যে জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত করেছে, প্রোলেতারিয়ান সংস্কৃতি হবে তারই স্বাভাবিক বিকাশের পরিণতি, তাকেই আমাদের পুনরায় প্রয়োগ করতে শিখতে হবে। লেনিন যখন Young Communist League-এর সভায় এই তাত্ত্বিক ধারণাকে উপস্থিত করেন তখন সোভিয়েত সাহিত্য জগতে অনেক মহারথীদের লড়াই অব্যাহত ছিল। এক অংশ বুর্জোয়া সভ্যতার সমস্ত সাহিত্য সম্ভারগুলিকে উৎপাটিত করতে চেয়েছিলেন নতুন সৃষ্টির তাগিদে। লেনিন তাদেরই একটু হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন 'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর কিছু নাই ভবে, পূজা করিবার'। কূপমণ্ডুকতা সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের ভিত্তি হতে পারে না। কয়েক দশক পেরিয়ে এসে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে বোধহয় সেই ভুলই হয়েছিল যা এখন আবার স্বীকার করা হচ্ছে।

নভেম্বর বিপ্লব ইতিহাসের মোড়কে ঘোরাল, নতুন দুনিয়ার জয়যাত্রা শুরু হল। মার্কস-এঙ্গেলস-এর ভবিষ্যৎবাণী ঐতিহাসিক অনিবার্যতাকে প্রমাণ করল।

'দুনিয়া জুড়ে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিল্পভাবনা আনলো স্থির বিশ্বাসের ছবি। যে শুভ্র মানসিকতার ভোরের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন অনেকেই, সেই ভোরের আলো ফুটতে কমিটমেন্টের প্রশ্নও নির্দিষ্ট হল। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্যেও সৃষ্টি হল নতুন সমস্যা। শিল্পভাবনার নিছক আত্মমুখীনতা বিরুদ্ধে নিছক বিষয়ীগত মনোভাব অথবা যান্ত্রিকতা মাথা চাড়া দিয়েছে বহুবার, যা প্রকৃত বিচারে সমাজতান্ত্রিক শিল্পে সৌন্দর্যকে পঙ্গু করতে চেয়েছে! এঙ্গেলস্ যদিও লিখেছেন—

"Economic situation is not as original cause which alone is active while all else is nearly passive effect. There is rather mutual action on the basis of economic necessity."

নিছক মন বা মননকে আশ্রয় করা অথবা বস্তুগত বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দেওয়া, এই দুই বিচ্যুতি বুর্জোয়া সমালোচকদের হাতে অস্ত্র জুগিয়েছে—সমাজতান্ত্রিক শিল্পসৃষ্টিকে আক্রমণ করতে। কিন্তু যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে সে তো হাঁটবেই। রুশ বিপ্লব জন্ম দিল যে নতুন মানবিকতাবাদকে ইয়োরোপের নেতিবাদী শিল্পভাবনার বিপরীত মেরুতে এশিয়া, আফ্রিকা, লাটিন আমেরিকার খনিতে বাগিচায় যে নতুন শিল্পের জন্ম হল, ইতিহাসের নিয়মে 'কার সাধ্য রোধে তার গতি'।

ইয়েনান বক্তৃতামালায় মাও ৎসে-তুং সেই নবীন শিল্প ভাবনায় নন্দনতাত্ত্বিক ধারণার ভ্রম সংশোধন করে বললেন—

What we demand is the unity of politics and art, the unity of content & form, the unity of revolutionary political content and the highest possible perfection of artistic form."

কিন্তু এই ঐক্যও তো রচিত হতে পারে দ্বান্দ্বিকতার পথে বিরোধ ও মিলনের প্রক্রিয়ায়।

এদেশে সমাজবিপ্লব আজও অসম্পূর্ণ। কিন্তু যেহেতু বিশ্বে ভারসাম্য পাল্টাচ্ছে, আমরাও তাই নিরন্তর আশাবাদী। আমাদের অনিবার্য লক্ষ্য, পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের আত্মিক সঙ্কট থেকে মুক্ত হয়ে জনসাধারণের বিকাশমান জীবনসত্যের ও সংস্কৃতির পক্ষে স্থান করে নেওয়া। প্রতিক্রিয়ার আবর্জনার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করবো মার্কসীয় নৈতিকতা থেকে, কোন অভিজাত গোঁড়ামি বা পেটিবুর্জোয়াসুলভ একগুঁয়েমি দিয়ে নয়। সর্বহারার ঐক্যবদ্ধ শ্রেণীগুলির সংগ্রামই এই নৈতিকতার উৎস। সংস্কৃতির সংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন নয়। দুই সংগ্রামেরই লক্ষ্য সমাজটাকে পাল্টানো, যে-সমাজ সৃষ্টি করবে নতুন মানুষ, নতুন সংস্কৃতি, নতুন মানবিকতা।

চিত্ত বসু

রাজনৈতিক আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সম্পর্ক

সংস্কৃতি একটি ব্যাপক ও সামগ্রিক ধ্যান-ধারণা। একটি দেশের একটি যুগের সংস্কৃতি বলতে বোঝায় সেই দেশের সেই যুগের অথবা কালপর্বের শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান ও অন্যান্য সকল সৃজনশীল কারুকৃতের সমষ্টির মিলিত ফসল সম্ভার। আলাদা আলাদা ভাবে শিল্প-উৎকর্ষতা, অথবা সাহিত্য প্রগতি অথবা অন্যান্য সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের চিত্রায়ণ, সংস্কৃতির পরিমাপ নয়। এই সবের মিলিত যোগফলই সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণার জন্ম দেয়।

শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি সমাজ-প্রগতির ধারার উর্ধ্বে নয়। নিরপেক্ষ নয়। একে অপরের উপর নির্ভরশীল। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি কল্পনা করা যায় না। সমাজ প্রগতি আবার আর্থ-কাঠামোর প্রতিফলন। আর্থ-কাঠামোর পরিচয় সুস্পষ্ট করে তোলে উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদন শক্তি-উৎপাদন সম্পর্ক সামাজিক-বিকাশ ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। সেই সম্পর্কের নিরিখেই আমরা সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক স্তর নির্ণয় করে থাকি। সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক, এবং সাম্যবাদী সমাজের ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হয়েছে মূলত উৎপাদন-শক্তি এবং উৎপাদন-সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে। শিল্প-সাহিত-বিজ্ঞান ও অন্যান্য সকল সৃজনশীল কর্মপ্রয়াস আর্থ-সামাজিক

বাস্তবতারই উপরি-কাঠামো। এক কথায়, সংস্কৃতি হচ্ছে বিশেষ যুগের প্রগতি এবং পরিমাণের প্রতিবিম্ব।

ইতিহাসের প্রগতিধারায় আমরা তাই পরিচয় পাই সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির, পুঁজিবাদী সংস্কৃতির, এবং সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির। একটি সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন যেমন অবশ্যম্ভাবী তেমনি সংস্কৃতিও পরিবর্তনীয়। অব্যয় নয়, অক্ষয়ও নয়। সমাজ পরিবর্তন হয়ে থাকে সমাজের বিপ্লবী শক্তিগুলির সক্রিয়তার জন্য। সমাজের বিপ্লবী শক্তিগুলির ক্রিয়াকলাপই (শ্রেণী সংগ্রাম) নতুন সমাজ সৃষ্টি করে। আবার তাদের ক্রিয়াকলাপ নতুন সংস্কৃতিও সৃষ্টি করে। আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর উপর সাংস্কৃতিক উপরি-কাঠামো তৈরী হয়।

।। দুই ।।

সমাজ বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য যেমন প্রয়োজন সংগঠিত প্রয়াস (যাকে সাধারণতঃ শ্রেণী-সংগ্রাম বলা হয়), তেমনি নতুন সংস্কৃতি স্বয়ম্ভু নয়। আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয় না। সচেতন এবং সংগঠিত প্রয়াস প্রয়োজন হয়। নতুন সমাজ গঠনের আন্দোলন এবং নতুন সংস্কৃতি গড়ার আন্দোলন সমার্থক না হলেও, পরস্পরবিরোধী নয়; বরং পরিপূরক। একে সমৃদ্ধ হয় অন্যের দ্বারা। শুধু পরস্পর সহযোগী অথবা পরিপূরক নয়, উভয়ের পরিপূরকতা আবশ্যিক। রাজনীতিক সংগ্রাম সাদামাটা অর্থে জীবন-জীবিকার সংগ্রাম। অনেকের ধারণা সেটা খুব স্থূল, নিতান্তই ধুলোমাটির রূঢ়তা। কিন্তু জীবন রাজনীতি-বর্জিত নয়। সুস্থ, উদ্দেশ্যময় অর্থবহ জীবনের গ্যারাণ্টিই সৃষ্টি করে রাষ্ট্রনীতি। সেই সুস্থ-অর্থময় জীবনের জন্য মানুষের সংগ্রাম, সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। রাজনৈতিক কর্মী এবং সংস্কৃতি কর্মীর উদ্দেশ্য এবং কর্মসাধনা মূলত একই স্রোত-অনুসারী। একই যুদ্ধ যাত্রার দুটি পদাতিক বাহিনী। কার্ল মার্কসের ব্যাখ্যাটি এই প্রসঙ্গে খুবই অর্থপূর্ণ। তিনি বলেছেন: একটি বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থায়, প্রথমত একটি বিশেষ সামাজিক কাঠামো জন্ম নেয়। দ্বিতীয়ত, এই বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থা মানুষ এবং প্রকৃতির সঙ্গে একটি বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে। মানুষের রাষ্ট্র এবং বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণীত হয় এই দুটোরই দ্বারা। ফলে বৌদ্ধিক কর্ম-কাণ্ডও নিয়ন্ত্রিত হয় (মার্কস, থিওরী অব সারপ্লাস ভ্যাল্যু)।

।। তিন ।।

শিল্প জীবন-ধর্মী। শিল্প জীবন-নিরপেক্ষ নয়। চেরনিশেভস্কি বলেছেন: আমাদের এই সময়ে 'শিল্পের জন্য শিল্প' খুব অদ্ভুত শোনায়। যে-কোনো মানবিক ক্রিয়া-কলাপই কোনো না কোনোভাবে মানুষের জন্য কিছু করে যায়। তা না হলে তা অনর্থক, অন্তঃসারশূন্য। মানুষকে অগ্রগতির পথে পরিচালনা করার জন্যই বিজ্ঞান। একইভাবে শিল্প নিষ্ফল চিত্ত-বিনোদনের জন্য নয়।

তিনি আরও বলেছেন, "শিল্প যে কেবল জীবনকে প্রতিফলিত করে তাই নয়। শিল্প জীবনকে ব্যাখ্যাও করে। অনেক ক্ষেত্রেই জীবনের বিভিন্ন দিক-গুলির ওপর শেষ রায় দেয় শিল্প।

জীবন-ধর্মী শিল্প সমাজ-পরিবর্তনের সংগ্রামে খুবই শক্তিশালী অস্ত্র। এরূপ অস্ত্রগুলি যতই সংগৃহীত হবে, ততই যুদ্ধের জয় সম্পর্কে আরও বেশী করে সুনিশ্চিত হওয়া যাবে।

জীবন-ধর্মী শিল্প-সাহিত্যের প্রধান উপকরণই হচ্ছে সামাজিক পরিবেশ। সেই সামাজিক পরিবেশ থেকে বিচ্যুত হলে, সৃষ্টি জীবনধর্মী হতে পারে না। এসম্পর্কে প্লেখানভ বলেছেন: যেখানেই সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে শিল্পী-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে কোন অসঙ্গতি এসেছে, দেখা গিয়েছে সেখানেই কলা-কৈবল্যবাদের জন্ম এবং শিকড় বিস্তার।

এই বিষয়ে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের অভিমত আরও সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন: আমার মত হোল, সমাজতন্ত্র সমস্যা সম্পর্কিত উপন্যাস তার লক্ষ্য পূরণ করতে পারে যদি সেটি সামাজিক বাস্তবতার পরিপূর্ণ চিত্রায়ণ করতে পারে। তা পারে মানুষের মনে সঞ্চিত ভ্রমগুলোকে দূর করতে। তা পারে বুর্জোয়া পৃথিবীর তথাকথিত আশীর্বাদকে নড়বড়ে করে দিতে। আরও পারে সমাজে আজ যা রয়েছে তা চিরকালই থাকবে, এরূপ ভাবনা-চিন্তাগুলিকে মানুষের মন থেকে সরিয়ে দিতে। (মিনা কাউটস্‌কির কাছে লেখা চিঠি, লণ্ডন, নভেম্বর ২৬, ১৮৮৫)।

।। চার ।।

বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং বিপ্লবের জয় অর্জন করেছেন এমন দু'জন নায়কের সংস্কৃতি সম্পর্কে মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এ দু'জন হলেন ভি আই লেনিন, এবং মাও ৎসে-তুং। প্রাক-বিপ্লব এবং বিপ্লবোত্তর যুগের অভিজ্ঞতা নিয়েই তাঁরা উভয়েই রুশ ও চীন সংস্কৃতির পর্যালোচনা করেছেন।

১৯২০ সনে লেনিন অনুভব করেন, রুশ কমিউনিস্ট পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটির উচিত 'সর্বহারার সংস্কৃতি' সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করা। কারণটি হোল, বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাষ্ট্র সংস্কৃতি বিষয়ে কী দৃষ্টিভঙ্গি নেবে তা নির্ণয় করা। কিছু কিছু প্রশ্নে মতপার্থক্য যে ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছিল, তা লেনিনের কথায় স্পষ্ট ধরা পড়ে। প্রস্তাবটি রচিত হয় ৮ অক্টোবর ১৯২০। প্রস্তাবটি পাঁচটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত। একটি অনুচ্ছেদেই তার সারমর্মটি ধরা পড়ে। তারই অনুবাদ রাখলুম। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, মার্কসবাদ বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীর একমাত্র বিপ্লবী মতবাদরূপে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। তার কারণ হোল, বুর্জোয়া যুগের মূল্যবান সাংস্কৃতিক ফসলগুলিকে পরিহার অথবা বর্জন না করে এই মতবাদ দু' হাজারেরও বেশী বছর ধরে মানবজাতির মূল্যবান চিন্তা-ভাবনার ও সংস্কৃতির যে বিকাশ হয়েছে সেগুলোকে আত্মস্থ করতে পেরেছে এবং নতুন ও নতুনতর চাপ দিতে পেরেছে। শুধুমাত্র এই ভিত্তিতে এবং এই দিকে এগিয়ে যেতে পারলে এবং তার সঙ্গে সর্ব'হারা একনায়কত্বের বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলিকে সম্পৃক্ত করতে পারলে, সর্ব'হারা সংস্কৃতির প্রকৃত বিকাশ সম্ভব হবে। স্মরণ রাখতে হবে, সেই সংস্কৃতির একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে সবরকমের শোষণের অবসান। প্রস্তাবটির দু'টো বিশেষ দিক সবিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এক, নতুন সংস্কৃতি গড়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং লক্ষ্য। দুই, সংস্কৃতির ছেদহীন বিকাশ সম্পর্কে স্বচ্ছ চিন্তা-ভাবনা। রাষ্ট্রের ভূমিকাটি গুরুত্ব পায় এই কারণে যে রাষ্ট্রের উপরিকাঠামোই হচ্ছে সংস্কৃতি। যে শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্র, সেই শ্রেণীর স্বার্থ ও চিন্তা-চেতনা প্রতিফলিত হবে সংস্কৃতিতে। দ্বিতীয় দিকটি একটু আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সে দিকটি হোল সংস্কৃতির ছেদহীন বিকাশ। সামন্ত যুগে সাংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যে আদলে, পুঁজিবাদী যুগে তার পরিবর্ত'ন হয়েছে। আবার সমাজতান্ত্রিক যুগে পুঁজিবাদী যুগের সংস্কৃতির আদল ও উপকরণ উভয়ই পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু লেনিনের ব্যাখ্যা এই কথাই বলে যে অতীতের সংস্কৃতি একেবারে বর্জনীয় নয়, তাকে উন্নীত করা এবং সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন। একটি সাংস্কৃতিকপ্রবাহ পলি রেখে যায়। সেই উর্বর পলিতেই উন্নত সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির বনিয়াদের উপর গড়ে ওঠে পুঁজিবাদী সংস্কৃতি। আবার পুঁজিবাদী সংস্কৃতির বিবর্তন হয় সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে। সমাজের বিবর্ত'নের ধারার সঙ্গে সংস্কৃতিরও রূপান্তর হয়। এখানেও আবার রাষ্ট্রের ভূমিকা খুবই গুরুত্ব রাখে। তার উপরেই নির্ভর করে এই রূপান্তরের

গতি ও ধারা। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব রাষ্ট্রের দায়িত্বকে সুচিহ্নিত করে দিয়েছে।

সমাজের রূপান্তর এমনিতে হয় না। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের (শ্রেণী সংগ্রাম) মধ্য দিয়ে (পরিমাণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন) তা হয়। তা সার্বজনীন সত্য, ইতিহাস-পরীক্ষিত। পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে সংগঠিত ও সচেতন প্রয়াস। এই পরিবর্তনের ধারা বেয়েই আদিম সাম্যবাদী সমাজ রূপান্তরিত হয়েছে সামন্তবাদী সমাজে, সামন্তবাদী সমাজ রূপান্তরিত হয়েছে পুঁজিবাদী সমাজে এবং পুঁজিবাদী সমাজ সমাজতান্ত্রিক সমাজের রূপ নিয়েছে। পরবর্তী অনিবার্য রূপান্তর হচ্ছে সাম্যবাদী সমাজ। এই সব রূপান্তরণের প্রধান এবং একমাত্র চালিকা শক্তি হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রাম।

সংস্কৃতির রূপান্তরও অনুরূপভাবেই হয়। সেই রূপান্তরণের চালিকা শক্তিও হচ্ছে সংগঠিত এবং সচেতন প্রয়াস। তাই আজ প্রয়োজন সংগঠিত ও সচেতন সংস্কৃতি-আন্দোলন।

॥ পাঁচ ॥

বিপ্লবের অগ্রগতি এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছেন মাও ৎসে-তুং। তিনি বলেছেন, "বিপ্লবী সংস্কৃতি হচ্ছে জনগণের হাতে একটি বিপ্লবী হাতিয়ার। বিপ্লবী সংস্কৃতি জনগণকে প্রাক-বিপ্লব সময়ে মতাদর্শগতভাবে তৈরী করে। বিপ্লবী ফ্রন্টের অতি-আবশ্যিক একটি অংশ, যা বিপ্লবের সাফল্যের জন্য একান্তভাবেই অপরিহার্য।" তিনি এই প্রসঙ্গে লেনিনের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন তাঁর 'চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যসমূহ' প্রবন্ধে।

লেনিনের উদ্ধৃতিটি হোল: বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া কোনো বিপ্লবী আন্দোলনই হতে পারে না।

রাজনীতি, অর্থনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ককে মাও স্পষ্টতর করেছেন। তিনি বলেছেন, 'নয়া চীনের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি একখাতে মেলাও, তবেই তুমি পাবে নয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। তাই হবে নামে ও বাস্তবে প্রজাতান্ত্রিক চীন। সেই চীনকেই আমরা গড়তে চাই।'

চীনের জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল গভীর এবং বিজ্ঞানসম্মত। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন: নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি হচ্ছে জাতীয় সংস্কৃতি। তা সাম্রাজ্যবাদের দৃঢ় বিরোধী এবং চীনের মর্যাদা এবং স্বাধীনতাকে উর্ধ্বে তুলে

ধরে। এই সংস্কৃতি আমাদের চীনের। এই সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির স্বাক্ষর বহন করে। এই সংস্কৃতি অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক এবং নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিগুলির সঙ্গে নিকট সম্পর্ক স্থাপন করে। এই সম্পর্ক এমনভাবে স্থাপন করে যে সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে কিছু আহরণ করতে পারে এবং মিলিতভাবে পৃথিবীতে এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি কোনোমতেই কোনো প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির সঙ্গে মিলতে পারে না। কারণ আমাদের এই সংস্কৃতি হচ্ছে বিপ্লবী জাতীয় সংস্কৃতি। আমাদের নিজস্ব চৈনিক সংস্কৃতিকে লালন ও পুষ্ট করতে বিদেশের প্রগতিশীল সংস্কৃতির থেকে অনেক কিছুই আহরণ করতে হবে। আমাদের আহরণ করতে হবে শুধু আজকের অন্যান্য প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি থেকেই নয়, অন্যান্য দেশের অতীত সংস্কৃতি থেকেও। আজ যা প্রয়োজন তার থেকেই করব তা নয়। অতীত যুগের থেকেও করব এবং করব সেই সব পুঁজিপতি দেশের অতীত সংস্কৃতি থেকে, বিশেষ করে সেই সব দেশের 'নব জাগরণের' কালপর্ব থেকে। কিন্তু কোনো কিছুই বাছ-বিচার না করে করব না, যা করবো তা সূক্ষ্ম এবং নিপুণভাবে বাছ-বিচার করে।

॥ ছয় ॥

ভারত ছিল একটি বৃটিশ উপনিবেশ। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক শোষণের শিকার। স্বাধীনতা অর্জন করার পরে যে-শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করল, তারা পুঁজিবাদী বিকাশের পথকেই অনুসরণ করে চললো। পুঁজিবাদ বিকাশের পথে যে এগোনো শুরু হোল, তাও কিন্তু সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নয়, বিরোধ-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে নয়। আপোস-রফার মধ্য দিয়ে। ফলে, পুঁজিবাদের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দিকগুলিরও প্রস্ফুটন হয় নি। সামন্তযুগের প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণা, জীবনাচার, এককথায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল উপরিকাঠামো প্রায় অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। পুঁজিবাদী বিকাশের প্রগতিধর্মী এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলিও বিকৃত হয়ে গেল এবং এখনও রইল। পুঁজিবাদী বিকাশের সাংস্কৃতিক উপরি-কাঠামোর প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রগতি-বিরোধী চেহারা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টতর হতে শুরু করল।

ভারতীয় সমাজ বিকাশের ধারার এই পরিণতি হিসেবেই সাংস্কৃতিক

বিকাশের বিকৃতি আজ খুবই স্পষ্ট। এই বিকৃতিগুলির বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মতান্ধতা, ধর্মীয় মৌলবাদ, জাতপাত বোধ, পৃথকতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রভৃতি। প্রগতিবাদী, গণতান্ত্রিক, জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশের ব্যর্থতাই মূলত এর জন্য দায়ী। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এই ব্যর্থতার সুযোগ নিতে যে খুবই তৎপর, তা আজ দিনের আলোর মত স্বচ্ছ। সাংস্কৃতিক পরাধীনতা রাজনীতিক-অর্থনীতিক পরাধীনতার চাইতেও আরও বড বিপদ। কারণ, সাংস্কৃতিক পরাধীনতা এবং পদলেহনকারিতা জাতীয় বিকাশের জীবনী শক্তিকেই বিনাশ করে দেয়। দেশজ সংস্কৃতির চাইতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ আজ শাসক শ্রেণীর মধ্যে খুবই তীব্র। শাসক শ্রেণীর এই আগ্রহের আতিশয্য এবং তীব্রতা বহু আলোচিত অপ-সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে উৎসাহ যোগাচ্ছে।

আমাদের দেশজ জাতীয় সংস্কৃতির বনিয়াদটি গড়ে উঠছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বনিয়াদটি পাকাপোক্ত না হতে পারলেও, সেই দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। কিন্তু শাসকশ্রেণীগুলির দুর্বলতা, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহনকারী দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আপোস রক্ষা এক ভারত-জাতিসত্তাবোধের বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। রুদ্ধ করে দিয়েছে ভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ধারাকে। পরিণামে দেখা দিয়েছে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বিপদ।

।। সাত ।।

জাতীয় সংস্কৃতির প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জাতি-সত্তার প্রশ্নটি। ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি এক-শিলা চরিত্রের নয়, বহু-শিলা চরিত্রের। ভারতের ভৌগলিক মানচিত্র, সমাজ-বিকাশের সবিশেষ বৈশিষ্টগুলি, বহু ভাষার বহু ধর্ম-বিশ্বাসের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব, বহু সংস্কৃতি-গোষ্ঠীর বিকাশ—এই সব মিলিয়ে ভারতীয় জাতিকে এক মহাজাতির গুণ-সমৃদ্ধ করেছে। এই মহাজাতির ধ্যান-ধারণার আধার-শিলা হোল, 'একের মধ্যে বহুর মিলনের' আর্তি। আর এই আর্তিটি আবেগ সঞ্জাত নয়, ঐতিহাসিক কার্য-কারণ বিধৃত।

'ভারত একটি নির্ভেজাল ধ্রুপদী অর্থে-একজাতি'—এরূপ একটি ধ্যান-ধারণা রয়েছে। আবার পাশাপাশি আর একটি ধ্যান-ধারণা বিদ্যমান রয়েছে যার মর্মার্থ হচ্ছে 'ভারত আদৌ একজাতি নয়—বহুজাতির সমাহার।' ভারতীয়

বাস্তবিকতা এই দুটোর মধ্যে কোনটির সঙ্গেই পুরোপুরি খাপ খায় না, সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মনে হয়, দুটো অবস্থানই কমবেশী চরম।

প্রকৃত পক্ষে ভারত একটি জাতি, কিন্তু বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক জাতি। ভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতি মিলনধর্মী, আহরণ-সমৃদ্ধ এবং আত্মস্থকারী। বহু ভাষা-সংস্কৃতির সৃজনশীল কর্ম প্রয়াসের মিলিত-মিশ্রিত ফসল।

প্রথমোক্ত ধ্যান-ধারণাটি সংকীর্ণতা-ধর্মী এক পেশে, ভারতীয় বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। কেন্দ্রিকতার প্রবণতাটি খুবই সবল। এই কেন্দ্রিকতা মিলিত-মিশ্রিত জাতীয় সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণার বিরোধী। এই ধ্যান-ধারণা জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পক্ষে বিপদজনক। কারণ এই ধ্যান-ধারণাই জন্ম দেয় ধর্ম-ভিত্তিক রাজনীতির এবং রাষ্ট্রের। হিন্দু রাষ্ট্র অথবা খালিস্তানের কথা এই চিন্তা-ভাবনা প্রসূত। এই চিন্তা ভাবনার উৎসই হচ্ছে সেই ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা যা হোল, ভারতীয় সংস্কৃতি হচ্ছে 'হিন্দু-সংস্কৃতি।' কিন্তু আগেই বলেছি, ভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতি হচ্ছে মিলিত-মিশ্রিত সংস্কৃতি। বহু ভাষা, বহু ধর্ম গোষ্ঠীর মানুষের সংগ্রামের ফসল।

দ্বিতীয়টির উৎস হচ্ছে, স্তালিনের জাতি সম্পর্কে সূত্রায়ণের অন্ধ অনুসরণ। সেই অন্ধ অনুসরণ ভারত-বিভাগের অবস্থান নিতে অবিভক্ত সি পি আইকে টেনে নিয়েছিল। স্তালিনের সেই সূত্রকে অবলম্বন করে খালিস্থানের সমর্থনে যুক্তিও খাড়া করা যেতে পারে। ভারতীয় জাতিসত্ত্বা এবং তার বিশেষ চরিত্র বিশ্লেষণ এই কারণেই খুব জরুরী।

স্তালিনের সেই সূত্র রচিত হয়েছিল সেই দূর ১৯১৩ সনে। ভারতের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তার পরে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সোভিয়েত রাজনীতি ও সাহিত্যেও পরিবর্তন এসেছে। তার প্রমাণ হচ্ছে, পি, এন, ফেদোসিয়েভ-এর গ্রন্থ, "লেনিনইজম অ্যাণ্ড ন্যাশনাল কোশ্চেন"। স্তালিনের সূত্র থেকে ফেদোসিয়েভের বক্তব্য বেশ খানিকটা আলাদা ধরনের। তুলনা-মূলক পর্যালোচনার জন্য, দুটো উদ্ধৃতিই পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হোল।

ভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতি আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য, এই পর্যালোচনা একান্তভাবেই প্রয়োজন। জাতীয় সংহতির আন্দোলনকে সঠিকখাতে পরিচালিত করতে হলে ভারতীয় জাতিসত্ত্বা সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা খুবই জরুরী।

॥ আট ॥

পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশে বুর্জোয়া সংস্কৃতির উপর যবনিকা নেমেছে। নয়া গণতান্ত্রিক, অথবা জনগণতান্ত্রিক, অথবা সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির অস্তিত্ব আজ স্বীকৃত। স্বীকৃত সেই সংস্কৃতি বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিকল্পরূপে।

কিন্তু সেই সংস্কৃতিও পরিবর্তনের উর্ধ্বে নয়। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৭তম কংগ্রেস সোভিয়েত সংস্কৃতির গুণগত পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছে। 'গ্লাসনসৎ' নামেই তাঁর পরিচয়। সংস্কৃতির প্রাধান্য সমাজে যে কত গভীর এবং তা রাজনীতি-অর্থনীতির নীতিকে কত ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে, তা গর্বাচভ রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে। শোনা যায়, 'পেরেসত্রোইকা' এবং 'গ্লাসনসৎ' এই দুটি শব্দ সোভিয়েত নাগরিকদের আজ মুখে মুখে। 'গ্লাসনসৎ' হচ্ছে মুক্ত-সমাজের চাহিদা আর 'পেরেসত্রোইকা' হচ্ছে·অর্থনীতিক সংস্কার।

মহাচীনের প্রাক-বিপ্লবের যুগে সংস্কৃতির গুরুত্ব আমরা মাও ৎসে-তুং-এর উদ্ধৃতি থেকে উপলব্ধি করেছি। বিপ্লব-উত্তর পরিস্থিতিতে সংস্কৃতি আন্দোলনের গুরুত্ব কমে যায় না। সঠিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন বিপ্লবকে সংহত করতে পারে। আবার তা ভ্রান্ত হলে ক্ষতি সাধনও করতে পারে। চীনের 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' বছরগুলি সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি'র অভিমতে সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লব (মে ১৯১৬-অক্টোবর ১৯১৬) চীনের পার্টি'র, জনগণের এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের বিপুল ক্ষতি সাধন করেছে (সিপিসি'র ইতিহাসের উপর প্রস্তাব)। অতি-বাম সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরই হচ্ছে এই পরিণতি।

॥ নয় ॥

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতির নবযাত্রা শুরু হয়েছিল। নব চেতনায়, নব প্রতিশ্রুতিতে উদ্বুদ্ধ ছিল সেই অভিযান। স্বাধীনতার আন্দোলন সমৃদ্ধ হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সৃজনশীল শিল্প-সাহিত্যের দ্বারা. আবার সে যুগের শিল্প-সাহিত্যও সেই সংগ্রামকে যুগিয়েছে প্রেরণা, বৌদ্ধিক রসদ-উপকরণ। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই একে অপরকে পালন করেছে, পুষ্ট করেছে।

শাসক শ্রেণীগুলি এই নব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, মিলন-ধর্মী, 'গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি' বিকাশের ধারাকে অব্যাহত থাকতে দেয় নি,লালন করা তো দূরের কথা, শ্রেণী-স্বার্থের প্রয়োজনেই। বস্তুত সেই ধারাকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। তার কুপরিণামই হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, ধর্মীয় মতান্ধতা ও মৌলবাদ।

এই সবগুলি মিলিয়ে ডেকে আনছে বিদেশী হস্তক্ষেপ এবং জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের সামনে বে-নজির বিপদ। রাজনৈতিক স্তরে, গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এই বিপদের মোকাবিলা করতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নব জাতীয় সংস্কৃতির আন্দোলনই হচ্ছে একমাত্র স্থায়ী প্রতিষেধক। নব জাতীয় সংস্কৃতিই জাতীয় ঐক্য ও সংহতির একমাত্র রক্ষাকবচ।

নব-জাতীয় সংস্কৃতি সাধারণভাবে হবে, (১) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী (২) সামন্ততন্ত্রের অবশিষ্টাংশের বিরোধী (৩) সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা এবং উপকরণ সমৃদ্ধ (৪) বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির অবিভাজ্য অংশ, (৫) ভারতীয় বিপ্লবের লক্ষ্য অনুসারী।

রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন দু'টি পৃথক স্রোত হতে পারে—কিন্তু এক অভিন্ন উদ্দেশ্য অনুসারী। দু'টি স্রোত নিজেদের উৎস থেকে যেমন বেগ অর্জন করবে—তেমনি একের বেগ অপরের বেগকে আরও বাড়িয়ে দেবে। এই দু'ই স্রোতের মিলন ভারতীয় বিপ্লবের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। আসলে, চাবিকাঠি।

স্তালিনের বক্তব্য

A nation is a historically constituted stable community of people, formed on the basis of a common language, territory, economic life, psychological make-up manifested in a common culture.

ফেদোসিয়েভের বক্তব্য

The nation is a lasting historical community of people constituting a form of social development based on community of economic life in combination with the community of language, territory, culture, consciousness and psychology.

সিদ্ধেশ্বর সেন

শিল্পীর স্বাধীনতা ও দায়

কর্মগতিকে, একসময়—প্রায় দেড়যুগ আগে—আমাকে কিছু ঘুরতে হয়েছিল মফঃস্বল আর গ্রামবাঙলায়। সে-সময়, মেদিনীপুরের এক প্রত্যন্ত চাষীপাড়ায়, একতারা-বাজানো এক বাউলের গলায় শুনেছিলাম :

"আমি বৃন্দাবনে ঘুরে বেড়াই,
কারে ডরাই, কারে ডরাই,
আমি স্বাধীনরাজ্যে বসত করি
চলবে না রে ছলচাতুরী।"

তখন ও-অঞ্চলে খাদ্যসঙ্কট লেগেছিল। জায়গাটা এমনিতেই খরা। তায় দুর্বিপাক। লোকজনের অবস্থা আরও কাহিল। তবু, তার মধ্যেও, শ্রোতাদের মাথা নাড়া, গানের সঙ্গে সঙ্গত করা তো দেখেছি!

আশ্চর্য লেগেছিল। কিংবা, আশ্চর্যেরই-বা কতটা আছে!

তার অল্পদিন বাদেই দেশে আসছিল এক সাধারণ নির্বাচন। ওই গ্রাম্য গায়কটির কোনও স্থায়ী ঠিকানা বা ভোট ছিল কিনা জানি না। কিন্তু চাষীদের ছিল। ভোটের বাবুরাও আনাগোনা শুরু করেছিলেন, শুনতে পাই। তাই কি একান্ত মরমী যোগ-বোধ ছাড়াই, বা তা ছাড়াও, পরিস্থিতির কার্য-কারণের তাগিদেই সেই গ্রাম্য-শিল্পীর বর্ণনায় এক পুরাণ-অতিকথার "বৃন্দাবনের

স্বাধীনরাজের" আশা অতগুলি দুর্দশাগ্রস্ত জাগতিক গেরস্ত-চাষীর মনে পরিবর্তনের কোনও ঈষৎ কল্পনাও জাগিয়ে তুলতে চাইছিল ?

কে জানে। তবে "মুক্তি", "স্বাধীনতা"—জনসমাজে এ-দুটি শব্দের আবেদন ও উদ্দীপনের তুলনা মেলা ভার। যে অবস্থাতেই হোক না কেন, আপেক্ষিক ভাবেই। লেখক-শিল্পীর "সৃষ্টি"র বা "চিন্তার স্বাধীনতা"-ও যে কেন এর থেকে একেবারে ভিন্নকোটিতে অবস্থান করবে, তার কোনও যুক্তিবুদ্ধি বর্তমান আলোচকের মতে, নেই। তাই, সব যুগেই সব সৎ সাহিত্যিকই সেই প্রেরণা নিজেদের রচনাকর্মে অঙ্গীকৃত না করে, সচেতনভাবে না হোক বাস্তবতার প্রতিফলনের নিয়মেই বোধহয়, এক পাও এগোতে পারেন নি।

লেখক-শিল্পীর সৃষ্টির স্বাধীনতা কথাটা তবু, দুর্ভাগ্যত, আজ উঠেছে যেন নতুন করেই, পশ্চিমীমহল থেকেই বিশেষ ভাবে—এবং আমার মতে, গোটাটাই এক ভুল পরিপ্রেক্ষিতে।

এ-প্রশ্নটির সত্যিকারের সদর্থক ও সার্থক আলোচনা তাই থমকে যায় এক নঙর্থক ঘোরপ্যাচে। যাঁরা তথাকথিত "স্বাধীন" বনতে চান—অদৃষ্টের পরিহাস তাঁরাই আবার কোনও বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর বা মতবাদের অধীন ও অধঃস্তন না হয়ে তা পারেন না, একটির পক্ষে ও অপর একটি "বাদ" বা ভাবাদর্শের বিরোধিতা না করে তা পারেন না। অর্থাৎ "নিরপেক্ষ" "স্বাধীন" বস্তুটি সেই তাঁদের হাত থেকেও ফস্কে কখন তলিয়ে যায়, যেটি পড়ে থাকে—সেটি সেই অদৃষ্টেরই গেরো! পরশ্রমজীবীতন্ত্রে এই সামাজিক বুদ্ধিভ্রান্তিই তাই এই প্রশ্নে বহুতর বুদ্ধিজীবীরই বুদ্ধিনাশের নজির হয়ে থাকে, এদেশে-ওদেশে। কে না জানে, এ-ভ্রান্তিবিলাসের বেসাতি সাজিয়ে আস্ত এক আন্তর্জাতিক সংস্থাই কাজ করে চলেছে যার নাম 'কালচারাল ফ্রিডম'! এই বাংলাদেশেই যে একদিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল—ঝোপ বুঝে বিশেষ কোপ মারার এক উপযুক্ত পরিস্থিতি পেয়ে, অবশ্যই কিছু মাত্র সাহিত্যিককে সঙ্গী জুটিয়ে নিয়ে—এক 'স্বাধীন-সাহিত্য সমাজ', তাও আশা করি আমাদের অনেকেরই আজও স্মরণের বাইরে যায় নি। তবু, অল্পদিনেই আবার "স্বাধীন" ভাবেই আত্মবিলোপের পথ না নিয়ে, এদেশের সমাজনৈতিক জলহাওয়ায়, তা-ও কুল পায় নি।

এই "স্বাধীন" শিল্পীদলের মোদ্দা তত্ত্ব হলো সমাজতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্রের সঙ্গে সৃষ্টির স্বাধীনতা ব্যাপারটি আদৌ খাপ খেতে পারে না। কারণ, এই "মুক্ত" দুনিয়ার প্রবক্তারা প্রাণপণ বোঝাবার চেষ্টা করে আসছেন যে, একমাত্র পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থাতেই শিল্পী ও স্রষ্টা তাঁর আত্মপ্রকাশের "অবাধ স্বাধীনতা"

ভোগ করেন আর সমাজতন্ত্রী দুনিয়াতে নাকি সবকিছুই সৃষ্টিকর্ম চলে "ওপর থেকে ফতোয়া জারী" করে। অবশ্য মাত্র পঞ্চাশাধিক বছরের সমাজতান্ত্রিক সভ্যতায় শিল্প-সাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিচারে অনেক সময় যে-অবাঞ্ছিত, এমনকি গুরুতর, ভুলত্রুটিও কোনো কোনো পর্বে ঘটে গেছে— বর্তমান আলোচক কিন্তু আদপেই তার স্বপক্ষে ধামাধরার কথা বলছেন না; এরেনবুর্গ, শোলোখভের মতো সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের বরেণ্য সাহিত্যিক নিজেরাই কোনো না কোনো সময়ে তার সমালোচনা করেন। কিন্তু, সেই সব ব্যতিক্রমকে নিয়ম বলে মানতে বর্তমান আলোচক অপারগতা জানায়। শুধু, 'শিল্পীর স্বাধীনতা ও তার দায়'-এর সমস্যাটিই এখানে আলোচ্য ও অনুসন্ধানের বিষয়।

একটি কথা এ-প্রসঙ্গে আগেই বলে রাখা দরকার যে, নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্মাণ যেখানে চলেছে, সেখানে স্বভাবতই শিল্পী-সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা ইতিবাচক হয়েই গড়ে ওঠে। স্বাভাবিক কারণেই তা ঘটে।

অথচ, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে সেই সব শিল্পী ও লেখকই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হন যাঁদের সৃষ্টিকর্মে স্থিত স্বার্থ ও "প্রতিষ্ঠান" বা "এস্ট্যাবলিশমেণ্ট" সম্পর্কে থাকে অন্তত সমালোচনাত্মক, বিশ্লেষণমুখী দৃষ্টিভঙ্গী—বাস্তবতা শুধু নয়, ক্রিটিক্যাল বাস্তবতা—একান্ত মৌলিক রূপান্তরধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী যদি না-ও থাকে। কেন এমন হয়, সে-কারণটিও আমাদের বুঝে দেখার কথা। ঐতিহাসিক ও বস্তুবাদী ডায়লেকটিকসের বিচার-প্রণালীই, আমার মতে, এ-অবস্থাটি বোঝার পক্ষে সহায়ক।

পুঁজিতন্ত্র তার সূচনাসময়ে শিল্প-সাহিত্যের বিকাশে, সন্দেহ নেই, এক ইতিবাচক ভূমিকাই নিয়েছিল। কিন্তু, কালক্রমে পুঁজিতন্ত্রে যখন সবকিছুই হয়ে উঠল বিক্রয়যোগ্য ও মুনাফাশিকারী পণ্য, তখন শিল্পী-সাহিত্যিকও সেই বাজারী সম্পর্কের নিয়মের আবর্তে না জড়িয়ে পারেন নি এর ফলাফল যা হবার হলো। ইতিহাসের সব থেকে এক নিষ্ঠুর একনায়কতন্ত্র—পুঁজির এক-নায়কতন্ত্রের শিকার হলেন সৃষ্টিশীল লেখক-শিল্পীরাও। সেকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্মেও এই ট্রাজেডির স্বাক্ষর রয়েছে।

তবু, উদাহরণত, রাজতন্ত্রী বালজাকও যে সমাজতন্ত্রী মার্ক্স-এঙ্গেলসের অন্যতম প্রিয় লেখক হয়ে ওঠেন, তার কারণও এই যে মহাশিল্পী বালজাক তাঁর বুদ্ধির পক্ষপাত সত্ত্বেও শিল্পসৃষ্টিতে প্রতিফলন ঘটান তৎকালীন সমাজ-বাস্তবতারই। তলস্তয় প্রসঙ্গে লেনিন যেমন লিখেছিলেন, "আমাদের আলোচ্য

শিল্পী যদি প্রকৃতই মহৎ শিল্পী হন, তবে তিনি তাঁর রচনাবলীতে বিপ্লবের অন্তত কিছু তাৎপর্যপূর্ণ দিকের প্রতিফলন ঘটিয়েছেনই।" এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব-সঙ্গতিতে একটি অগ্রসরমান শিল্প-সাহিত্যধারা গড়ে ওঠে।

পণ্য, মুনাফা ও বাজারীতন্ত্র যে পুঁজিতন্ত্রের গর্ভে অনিবার্যভাবেই বেড়ে উঠেছে, শেক্‌স্‌পীয়রের মহৎ প্রতিভা সে-প্রক্রিয়ারও প্রতিফলন ঘটায়:

"......Commodity, the bias of the world,
The world who of itself is poised well,
Made to run even upon even ground,
Till this advantage, this wide-drawing bias,
This sway of motion, the Commodity
Makes it take head from all its differency,
From all direction, purpose, course, intent......"

পণ্য, পুঁজি ও মুনাফাতন্ত্রী সমাজে, বিশেষভাবে তার সর্বগ্রাসী পর্যায়ে—সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ বা নয়া-উপনিবেশবাদের যুগে—ব্যক্তির বিযুক্তি-বোধ, শোষিত নিপীড়িত ও শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে যেমন প্রধানত সামাজিক-অর্থনৈতিক, লেখক ও শিল্পীর ক্ষেত্রে তেমনি প্রধানত আত্মিক-মানসিক এমন একটা স্তরে পৌঁছে যায়, যখন তার "স্বাধীনতা"র স্পৃহা পর্যবসিত হয় মাত্র তার "আত্মবিক্রয়েরই স্বাধীনতা"তে।

ভাসা-ভাসা ভাবে দেখতে গেলে মনে হতে পারে যে, তা কেন? বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা তো সকলের জন্যে "অবাধ" সুযোগই উপস্থিত করেছে। আর তাই যে যা খুশী, এমনকি শিল্পের নাম নিয়েও করে খেতে পারে। সৃষ্টির স্বাধীনতার এমনি এক "নিরঙ্কুশ" "পরম" বিভ্রম তৈরি করলেও, তার পর মুহূর্তেই বাজারী নিয়মেই শিল্পীর সেই মনসিজা কল্প-প্রতিমা অচিরে ধূলিসাৎ করে দিতে পুঁজিতন্ত্রী "অবাধ" ব্যবস্থা কোনোই কার্পণ্য করে না। তাই এই ধনতন্ত্রী পণ্যতন্ত্র ব্যবস্থায় প্রতিটি সৎ শিল্পীই জানেন যে, সৃষ্টির স্বাধীনতা এ-পরিবেশে কতখানি অলীক-কুসুম, এবং শ্বাসরুদ্ধ। আর, তা সত্ত্বেও, যদি প্রতিভাধর সৎশিল্পী এই সমাজেই সৃষ্টিকর্মের স্বাধীনতার অপরাহত মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে এগিয়ে যেতে পারেন, তার কারণ তাহলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষণবিরোধী শক্তিগুলির জোরালো অবস্থানই সেই শিল্পীর পক্ষে, আপেক্ষিক-ভাবে, প্রকৃত স্বাধীন থাকার শর্তগুলি সৃষ্টি করে দেয়।

পুঁজিতন্ত্রী, উপনিবেশী ও আধা-উপনিবেশী সমাজে শ্রমজীবী ও নিপীড়িত মানুষের এই জোরাল মুক্তি-আন্দোলনের অস্তিত্বই শিল্পীর স্বাধীনতার আপেক্ষিক অবস্থা নিয়ে আসে। এই মুক্তি-আন্দোলন কী পরিমাণে শক্তিশালী—তার ওপরেই নির্ভর করে লেখক-শিল্পীর এই আপেক্ষিক স্বাধীনতাও। নইলে, লেনিন যেমন দেখিয়েছিলেন, "বুর্জোয়া শিল্পী, লেখক, অভিনেতার স্বাধীনতা হলো নিছক মুখোশ ঢাকা (বা ভণ্ডভাবে মুখোশ আঁটা) নির্ভরশীলতা—টাকার থলি, দুর্নীতি ও গণিকাবৃত্তির ওপর।" কেননা, মনোপলি নিয়ন্ত্রণ করে বৃহৎ বাজারী সংবাদপত্র-পত্রিকা, চলচ্চিত্র-শিল্প, বাণিজ্যিক বেতার, টেলিভিশন (যেসব দেশে তার চল আছে), রঙ্গমঞ্চ এবং বাজারী নিয়ম অনুযায়ী, এমন কি তারা শিল্প-সাহিত্যরুচি তৈরি করারও স্পর্ধা দেখায়। সামাজিক সমস্যা থেকে ও তার নিরসনের সংগ্রাম থেকে মানুষ যাতে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে, একমাত্র তেমন সব কাজকেই অবাধ বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয়।

জীবনবাদী, প্রগতিধর্মী লেখক-শিল্পীদের রচনা যাতে ব্যাপক পাঠক-সমাজের কাছে না পৌছতে পারে, তার সবরকম ব্যবস্থাই তারা নেয়—উপেক্ষা, অবহেলা বা সাক্ষাৎ বিরোধিতায়। অবশ্য, তাতে মানবতাবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকদের সৃষ্টি থেমে থাকে না। বাঙলা সাহিত্যে এর একটি মহৎ দৃষ্টান্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। খ্যাতির তুঙ্গে থাকাকালেও গণতান্ত্রিক সংগ্রামী মানুষের দিকে তাঁর পক্ষপাতিত্বের কারণে বড বড় পত্র-পত্রিকার দরজা তাঁর রচনাপ্রকাশের ক্ষেত্রে যে একদিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, সে-তথ্যও তো আমাদের অজানা থাকার কথা নয়।

তবু, নিজদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সেইহেতু মানবিক মুক্তি ও শ্রমজীবী মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জোরালো বিকাশে অংশীদার হয়ে সুস্থ গণতন্ত্রী মানবতাবাদী শিল্প-সাহিত্যধারার উদ্ভব ও তার ক্রমিক প্রসারও আমাদের যুগের এক লক্ষণীয় বাস্তবতা। এ-অবস্থাটির ওপর আরও বৈপ্লবিক প্রভাব ফেলে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব ও তার উত্তরোত্তর পরাক্রম, আজকের আফ্রো-এশীয় দুনিয়ার দুর্নিবার্য উত্থানও তারই আরও এক অবশ্যম্ভাবী শর্ত সৃষ্টি করছে। তাই, বিমূর্তভাবে নয়, শিল্পীর স্বাধীনতা ও দায়ের সমস্যাটিকে এই মূর্ত সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই বিচার করে দেখতে হবে।

আজ নয়, সেই স্বদেশীর যুগে, রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য সৃষ্টি' প্রবন্ধে লিখে-ছিলেন, "বর্ষা ঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন এক একটা সময় আসে যখন

হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পর বাংলাদেশে সেই অবস্থা আসিয়াছিল। ···ফরাসি বিদ্রোহের সময়েও তেমনি মানবপ্রেমের ভাবহিল্লোল আকাশ ভরিয়া তুলিয়াছিল। তাহাই নানা কবির চিত্তে আঘাত পাইয়া কোথাও বা করুণায়, কোথাও বা বিদ্রোহের সুরে আপনাকে নানামূর্তিতে অজস্রভাবে প্রকাশ করিয়াছিল। অতএব কথাটা এই, মানুষের মন যেসকল বহুতর অব্যক্তভাবকে নিরন্তর উচ্ছ্বসিত করিয়া দিতেছে, যাহা অনবরত ক্ষণিক বেদনায়, ক্ষণিক ভাবনায়, ক্ষণিক কথায় বিশ্বমানবের সুবিশাল মনোলোকের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এক-একজন কবির কল্পনা, এক-একটি আকর্ষণ কেন্দ্রের মতো হইয়া তাহাদেরই মধ্যে এক-এক দলকে কল্পনাসূত্রে এক করিয়া মানুষের মনের কাছে স্পষ্ট করিয়া তোলে ··।" মহাকবির এ-কথাটি যেন আমরা তলিয়ে ভাবি।

যে-শিল্পী বা মানুষ নিজেই যন্ত্রবৎ বা যান্ত্রিকতারই পূজারী, তার কোনো স্বেচ্ছা-নির্বাচন নেই, নিজের নির্বাচিত পথ নেই—একমাত্র বাইরের অবস্থান্তরের হিসেবের অদলবদলেই তারও অদলবদল। এ-শিল্পীকে, তাই, স্বাধীন বলতে পারি না, কারণ দায়বোধ না থাকলে স্বাধীনতা কিসের? তাই কোনো কাজ ও তার ফলাফলের জন্যে এমন ব্যক্তিকে দায়ী করাও নিরর্থক। তেমনি সমান সত্য হলো, প্রকৃত সৃষ্টির স্বাধীনতা অসম্ভব যদি না শিল্পী তাঁর দায় সম্পর্কে পূর্ণভাবে আত্ম-সচেতন থাকতে পারেন। সৃষ্টিকর্মেও সেই ভাবাকাশকেই সমগ্রভাবে মেলে ধরার দায়ও তাই এই প্রকৃতভাবে স্বাধীন শিল্পীর কাঁধেই বিশেষ করে বর্তায়।

নারায়ণ চৌধুরী

লেখকের শ্রেণীবিচার

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শুভাশুভ লক্ষণের এক মিশ্র লীলা প্রত্যক্ষ করছি। সমাজ-সচেতনতার দ্বারা মণ্ডিত শিল্পচর্চা ও জ্ঞান-বিদ্যার অনুশীলন যদি সক্রিয় বুদ্ধিজীবিতার একটি প্রধান ধর্ম হয়ে থাকে তো মানতেই হবে যে আজকের বুদ্ধিজীবী লেখকরা শিল্পীরা কবিরা তাঁদের শিল্পকর্মের মধ্যে যথেষ্ট জাগ্রত চৈতন্যের প্রমাণ বহন করছেন। নতুন লেখকদের কবিতায় গল্পে সে কী প্রতিভার ধার; মননশীলদের প্রবন্ধে-নিবন্ধে তথ্যভূয়িষ্ঠতার সঙ্গে সে কী নতুন চিন্তার দ্যুতি; বর্তমান প্রজন্মের শিল্পীদের শিল্পকৃতির ভিতর সৃষ্টিশীল মনের সে কী প্রাণবন্ত অভিনয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নতুন নতুন আঙ্গিকের সংযোজন! কিন্তু বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সংস্কৃতি কর্মীদের এই উৎসাহব্যঞ্জক প্রাণশক্তি তাঁদের স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যতই সুফলের কারণ হোক না কেন, মনে হয় সমাজ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে, পারস্পরিক মেলামেশার ক্ষেত্রে, তাঁদের ভূমিকা আরও উন্নত আরও সচেতন হবার অপেক্ষা রাখে।

কেন এ-কথা বলছি তা একটু বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক তথা সাহিত্যিক গোষ্ঠীগুলির কিছু কিছু অভিজ্ঞতা এই লেখকের আছে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারা যায়, আলোচ্য প্রতিটি গোষ্ঠীই যেন তাঁদের নিজ নিজ বিশ্বাস রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী

সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে এক-একটি আলাদা বিচরণের জগৎ গড়ে তুলেছেন। এই জগৎগুলি জল-অচল প্রকোষ্ঠের মতো একটি অন্যটি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র। তাদের এক ক্ষেত্রে মিলিত হবার কোনো সাধারণ ভূমি নেই। গোষ্ঠীগুলির পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের রেওয়াজ অনুপস্থিত। রেওয়াজ অনুপস্থিত তার কারণ, ভাব-বিনিময়ের এমন কোনো সাধারণ সূত্র চোখে পড়ে না যাকে কেন্দ্র করে···বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারে। শুধু যে তাদের মধ্যে কোনোরূপ আদান-প্রদান নেই তা-ই নয়, তাদের পরিভাষাও যেন আলাদা তাঁদের সাহিত্যের বর্ণিতব্য বিষয়, পরিবেশ, চিত্র-চরিত্র সব কিছুর মধ্যে যোজনব্যাপী ব্যবধান। অন্যপক্ষে, প্রতিটি গোষ্ঠীর চিন্তা ও কল্পনা কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে ঘিরে ঘূরপাক খাচ্ছে। ওইরূপ আবর্তনের ফলে তাদের চিন্তাভঙ্গী ভাষাভঙ্গী হয়ে যাচ্ছে আলাদা, এমনকি শব্দব্যবহারের ছাঁচও স্বতন্ত্র চেহারা লাভ করছে—কোনো গোষ্ঠীর বিষয়বস্তুই আর ভাষার সঙ্গেই অন্য কোনো গোষ্ঠীর বিষয়বস্তুর আর ভাষার মিল নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন', 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন,' 'রবিবাসর', 'পূর্ণিমা সম্মেলনী,' 'কবি পরিষদ,' 'উজ্জয়িনী সাহিত্যসভা' প্রভৃতি সংস্থার মানসিকতার সঙ্গে বামপন্থী চিন্তাদর্শ-পরিচালিত সাহিত্যিক সংস্থাসমূহের (যেমন 'সংস্কৃতি-পরিষদ', 'পরিচয়' মাসিক-পত্রেরসম্প কত সঙ্গে সাহিত্যিক সম্প্রদায় ; 'সাহিত্যপত্র,' 'এক্ষণ', 'মানবমন,' 'মূল্যায়ন,' 'সপ্তাহ' প্রভৃতি পত্রপত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট লেখকগোষ্ঠী) মানসিকতার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। প্রথম সারির সংস্থাগুলির পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টিকোণের যথেষ্ট তফাৎ থাকলেও এই একটা লক্ষণীয় মিল দেখতে পাওয়া যায় যে, এদের দৃষ্টিভঙ্গী গতানুগতিক, ঐতিহ্যাশ্রয়ী, রাজনীতিবিমুখ, সাহিত্যের প্রচলিত মূল্যবোধগুলিতে আস্থাশীল এবং স্থিতাবস্থার সংরক্ষণকামী। অধিকন্তু, খ্যাতিমান বর্ষীয়ান জনপ্রিয় লেখকদের এরা নিজ নিজ দলে অভিভাবকরূপে ভেড়াবার জন্য সতত পরস্পরের সঙ্গে অলিখিত প্রতিযোগিতায় নিরত। এইসব সংস্থার সদস্যগণ প্রগতিশীল ভাবধারা সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ঘামান না, বরং অন্তরে অন্তরে এই ভাবধারা সম্বন্ধে বিলক্ষণ বিরূপতা পোষণ করেন। এঁরা প্রায়ই সংকীর্ণ জাতীয়তার পূজারী, তবে এঁদের এই একটা প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে যে, এঁদের অনেকেরই সাহিত্যপ্রেম নিখাদ এবং যে-সাহিত্যের এঁরা পোষকতা করেন সে-সাহিত্য দেশের মৃত্তিকার সঙ্গে সংযুক্ত। নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের ব্যথা-বেদনা এঁদের সাহিত্যে রূপায়িত হয় না বটে, তবে এঁদের সাহিত্যের আবহ, চিত্র-চরিত্র ইত্যাদি ষোল-আনা স্বদেশী। জাত্যাভিমানপুষ্ট দেশপ্রেমের যত ত্রুটি-

বিচ্যুতিই থাকুক না কেন, তার এই একটা সদ্‌গুণ আছে যে তা মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মমত্বের মনোভাব জাগ্রত করে। জাতীয়তার সঙ্গে জাতীয় সাহিত্যের যোগ অচ্ছেদ্য।

পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় কবি-সাহিত্যিক গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যে সকল লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সম্পর্কযুক্ত রয়েছেন, তাঁরা প্রগতিশীল ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ নতুন কালের চিন্তা-চেতনাকে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে রূপ দিতে সচেষ্ট, নতুন আঙ্গিক আর ভাষাশৈলী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সতত নিযুক্ত, শোষিত ও অবহেলিত শ্রেণীর মানুষদের অভাব-অভিযোগ স্বপ্ন কামনার রূপায়ণে আন্তরিক যত্নপর, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সক্রিয় শরিক। এ-সবই অতিশয় প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য, কিন্তু দেখা যায় সুস্পষ্ট লাভের পিঠে কিছু ক্ষতিও তাঁদের মেনে নিতে হয়েছে। নতুন কালের অগ্রসর ভাবধারার সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়ে এঁরা যেন কতক পরিমাণে জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে, সাহিত্যের ধারাক্রমাগত উত্তরাধিকারের সঙ্গে, যোগ হারিয়ে ফেলেছেন। এঁদের ভাষাভঙ্গী, শব্দব্যবহার, চিন্তার ছাঁচ কিছুটা যেন উৎকেন্দ্রিক। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে এঁদের যে বলিষ্ঠতা, সেই বলিষ্ঠতার অনুরূপ প্রকাশশৈলী খুঁজতে গিয়ে এঁরা সচরাচর যে ইডিয়ম ও পরিভাষা ব্যবহার করছেন তা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রবহমান সংস্কার থেকে কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্লিষ্ট বলে মনে হয়। তবে এঁদের সম্পর্কে বড় কথা এই যে, এঁরা গতানুগতিক মূল্যবোধ তথা অর্থহীন দেশাচারের নিতান্ত অনুগত ভৃত্য নন, প্রচলিত সত্যের সারবত্তা সম্বন্ধে সর্বদা প্রশ্ন ও বিচারশীল, একাধিক পুরস্কারধন্য সুপ্রসিদ্ধ ও মান্য কিন্তু কার্যত কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারী 'জনপ্রিয়' প্রবীণ লেখকদের সম্পর্কে মোহমুক্ত, সর্বোপরি প্রথম সারির সংস্থাগুলির মতো প্রচার-উন্মুখ নন। সাহিত্যের ট্র্যাডিশন অনুশীলনে এঁদের আপেক্ষিক উৎসাহের অভাব আমাকে বেদনা দেয়, কিন্তু এঁদের নবীনত্বপ্রীতির আমি তারিফ করি। এঁদের সংস্কারমুক্তির চেষ্টার মধ্যে যে সজীব প্রাণের ধর্ম নিহিত আছে, তাকে খাটো করে দেখা চলে না।

পূর্বোক্ত দুই ধরনের সংস্থার বাইরে তৃতীয় এক সাহিত্যিক সংস্থা আছে যাদের লেখকগণ গান্ধীবাদী চিন্তায় অনুপ্রাণিত। এঁরা পূর্বের দুই শ্রেণী থেকেই স্বতন্ত্রভাবে চলতে চেষ্টা করেন, চলতে গিয়ে আত্মাভিমানপুষ্ট হন। এঁদের আদর্শবাদ, বর্ণিত বিষয়ের গাম্ভীর্য, চটুলতার প্রতি বিমুখতা, সমাজসেবার মনোভাব প্রভৃতি প্রশংসাযোগ্য গুণ। কিন্তু ক্রমাগত একই বিষয়ের চর্চা করতে করতে এঁদের প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে এসে গেছে মুদ্রাদোষ, একঘেয়েমি ও চিন্তার

গতানুগতিকত্ব। মৌলিক বিদ্রোহী চিন্তার জগৎ থেকে এঁরা সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করছেন। গান্ধীবাদের সদ্‌গুণ নিশ্চয় এঁদের রচনায় প্রতিফলিত, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গান্ধীবাদের আবরণে এঁরা কায়েমী স্বার্থের পরিপোষক। প্রচলিত অবস্থা-ব্যবস্থাকেই জীইয়ে রাখতে এঁরা চান। যদিও গান্ধীবাদ কিন্তু সে-কথা বলে না। গান্ধীবাদী চিন্তার মধ্যে যথেষ্ট বৈপ্লবিক অভীপ্সা নিহিত আছে। গান্ধীবাদকে ঠিক ঠিক ভাবে বিচার ও প্রয়োগ করলে তার ক্রান্তিকারী ভূমিকা তা থেকে উদ্ভূত হতে বাধ্য।

চতুর্থ এক শ্রেণীর লেখক আছেন যাঁদের ঐতিহ্য, প্রগতিশীলতা, জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতা, গান্ধীবাদ-সাম্যবাদ কিছুরই বালাই নেই; যাঁদের এক কথায় বলা যেতে পারে সংবাদপত্রসেবী ও সংবাদপত্রসেবিত সাহিত্যিক। স্বাধীনতা-উত্তর বৃহৎ সংবাদপত্রের আদর্শহীনতা ও বৈশ্য মনোবৃত্তি এইসব লেখকদের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করেছে বললেও চলে। এঁরা সংবাদপত্রের 'মালিক-সম্পাদক'-এর ভজনাকারী, বশংবদ আজ্ঞাবহ মাত্র; এঁদের লেখকসত্তা গৌণ। বাঙলা দৈনিকের ঢালাও পৃষ্ঠাসমূহের উদার দাক্ষিণ্যের দৌলতে সাহিত্যচর্চা করবার সুযোগপ্রাপ্ত হয়ে এঁরা সাহিত্যের নামে বাঙলা ভাষায় এমন এক ধরনের তরল 'ইয়াঙ্কিপনা'র সূত্রপাত করেছেন—যার সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের পূর্বকথিত ডান-বাম কোনো ধারারই কোনো মিল নেই। এঁরা লোভী, নগদ লোভের কারবারী, আদর্শবাদ-বিবর্জিত, দেশের ইতিহাস ও বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে অচেতন কতকগুলি 'সময় সেবক'-এর জটলা মাত্র; এঁদের সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভালো।

পঞ্চম আর-এক লেখকগোষ্ঠী আছেন, যাঁদের প্রতিনিধিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় লালিত বর্ধিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় স্বভাবতই এই মহলে সৃষ্টিশীল লেখক অপেক্ষা জ্ঞান-চর্চাকারী গবেষক আর সমালোচকের প্রাধান্যই বেশি। অধ্যাপকেরা মনোবৃত্তি ও অভ্যাস এই দুই কারণেই সমালোচনা-কর্মে সমধিক স্ফূর্তি বোধ করেন। আমাদের দেশের অধিকাংশ বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক-বর্গীয়—এটা অকারণ নয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ সমালোচক-অধ্যাপকদের সমালোচনার মৌলিকতাকে বলিহারি যাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এঁরা পরের মুখে ঝাল খাওয়া সমালোচক, নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর এঁদের যথেষ্ট পরিমাণে আস্থা নেই। এ-কথার প্রমাণ স্বরূপে এখানে দুটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করব।

যেসব জ্ঞানী-গুণী বলে কথিত মানী অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁরা পণ্ডিতপ্রবর আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়কে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর মূল্যবান অবদানের জন্ত সংবর্ধিত করবার জন্ত সময় বেছে নিলেন কখন? না, যখন যোগেশচন্দ্র সপ্ত কি অষ্ট-নবতিপর বৃদ্ধ, যখন আচার্যদেবের আর নড়বার-চড়বার ক্ষমতা নেই, যখন তাঁকে সংবর্ধিত করা না করা তাঁর পক্ষে প্রায় তুল্যমূল্য ব্যাপার, যখন তাঁর এক পা—ইংরেজী বাক্যরীতি অনুসরণ করে বলি—সমাধির অভিমুখে বাড়ানো হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাগণ শেষ অবধি বাঁকুড়ায় গিয়ে যোগেশচন্দ্রকে মানপত্র প্রদান করে যতই বিলম্বিত হোক একটা মস্ত বড় কর্তব্য পালনের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন!

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হালফিল। কোন পরম লগ্নে না জানি তারাশঙ্কর ব্যবসায়ী জৈনদের 'জ্ঞানপীঠ' সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছিলেন, তারপর আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি হিড়িক পড়ে গেছে কে কার আগে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি দিয়ে তারাশঙ্করকে সংবর্ধিত করবেন। "আগে কেবা মান করিবেক দান, তারি লাগি কাড়াকাড়ি!" তারাশঙ্করের লেখায় যদি এতই গুণপনা ছিল বাপু, তো তাঁর সাহিত্যকৃতির জন্য তাঁকে আগেভাগে সম্মান জানালেই তো ল্যাঠা চুকে যেত। এখন লোকের মুখ কী করে বন্ধ করা যাবে, যদি লোকে বলে যে, এ হচ্ছে তারাশঙ্করের 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার লাভের প্রতিক্রিয়ার ফল। এ পরপ্রত্যয়নের বুদ্ধির একটি নিকৃষ্ট উদাহরণ। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মাতব্বর সমালোচক-অধ্যাপকদের এর চেয়ে বিচারদৈন্য ও অধীনতা কল্পনা করা যায় না।

নৃপেন চক্রবর্তী

প্রগতিশীল লেখকের দায়িত্ব

আসাম-আগরতলার সড়ক ধরে চলুন। সকাল ছ'টা থেকে দেখবেন একটি মিছিল। উপজাতি মা-বোনেরা, হাতে একটি খাবারের পুঁটলি, কাজে যাচ্ছেন। ওরা বর্ডার রোডের শ্রমিক।

প্রথম দৃষ্টিতেই মনটা বেদনায় ভরে ওঠে। বেশী দিনের কথা নয়। ১৯৫০-৫১ সাল। এই জুমিয়া মা-বোনেদের ঘরে আমরা থেকেছি। সকাল-ভোরে উঠে মা-বাবা জুমে চলে যেতেন। পিঠে একটি খারা, তাতে ভাতের মোচা। ছোট্ট ছেলেমেয়ে থাকতো ঘরে। বড় মেয়েটা তাদের শুনাতো ঘুম-পাড়ানি গান। সন্ধ্যায় ওরা ফিরতেন ঘরে, খারায় ভর্তি করা বাঁশের করুল, নানা ধরণের সব্জি। ওরা পাথর ভাঙবেন, মাটি কাটবেন, ঠিকেদারের মজুরে পরিণত হবেন, তখন আমরা কি কেউ ভেবেছি?

জুমকে ঘিরে ছিল তাদের জীবন, তাদের ধর্ম, তাদের সংস্কৃতি, তাদের গান, তাদের প্রেম ও স্বপ্ন। জুম যেমন কেউ একা একা কাটতেন না, একা ফসল তুলতেন না, তেমনি জুমের ফসলও ভাগ করা হতো সকলের মধ্যে। জীবন ছিল যৌথ। জুমের জমি কার, সে প্রশ্ন ছিল হাস্যকর।

জুমের ফসল বাজারে নেবার দরকার ছিল না। মহাজন-ব্যবসায়ী আসতেন বাড়ীতে, ঘোড়া নিয়ে। কি তার বাজার দর, কি তার ওজন—জুমিয়া তা নিয়ে

মাথা ঘামাতেন না। বিনিময়ে তিনি হয়তো পেতেন কিছু লবণ, দেশলাই, বিস্কুট, মেয়েদের হাতের রেশমী চুড়ি, মাটির কলস, লাংগি। সারা বছরের জন্যে ঘরে তা সাজিয়ে রাখা হতো।

কিন্তু তখনো জুমিয়ার ঘরে ছিল একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণতা, গানে, নাচে ভরে ওঠো জীবন। রাতে চরকার শব্দ শেষ হলে, সকালে ছোট্ট-মেয়েটার কোমরে তাঁত, তাতে প্রথম হাতে খড়ি। শিকারীর বাণে মৃত হরিণের মাংস ঘরে ঘরে বিলি করার আনন্দ।

গত ২৫-৩০ বছরের মধ্যে এই জুমিয়া মা-বোনদের কারা এ-এ-রোডে টেনে নামিয়েছে? এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি শান্তিপূর্ণ সুখের সংসারকে কারা তছনছ করে দিয়েছে? এমন যৌথ-জীবনের উপর আঘাত হেনে তাকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর-শীল করে তুলেছে—ঠিকেদারের দয়ার উপরে, বাজারের নির্মম নিয়মের উপর। যদি রাস্তা না যেতো ঐ গভীর জঙ্গলে, যদি ঠিকেদার আর বাজারকে দূরে রাখা যেতো—ওদের বিচ্ছিন্ন ঘর থেকে, যদি ওদের শত শত বছরের অরণ্যকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া যেতো—ওদের অবাধে জুম করার জন্য! মাছ যেমন সমুদ্রের বুকে সাঁতার কাটে, জুমিয়া মা-বোনেরা যদি আবার সেই সমুদ্রকে ফিরে পেতেন ঐ বিস্তীর্ণ বনের মধ্যে।

ব্যথাতুর মনে এ সব প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক। ইংরেজ যখন এ দেশে আসে, ভারতীয় যৌথ গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতিকে গায়ের জোরে ভেঙে দিয়ে, উপর থেকে সেখানে তাদের নতুন শোষণ-ব্যবস্থাকে চালু করে 'নতুন সভ্যতা' নাম দিয়ে, তখনো একই দৃশ্য দেখা যায়। একই আর্তনাদ শোনা যায় অতীতকে ফিরে পাবার জন্যে।

কিন্তু এটা হলো পরিবর্তনের এক দিক। ইংরেজ যদি এদেশে না আসতো, তবে কি চিরদিনই ভারতীয় গ্রামের ঐ স্বয়ং অর্থনীতি বেঁচে থাকতো? তা থাকতো না। ধনতান্ত্রিক বিকাশ তার নিজের অমোঘ নিয়মে সেখানে সেই স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে ভেঙে চুরমার করে দিতো। হয়তো সে বেদনা হতো আরো দীর্ঘস্থায়ী, সেই বিকাশও হতো স্বাভাবিক। ইংরেজ যেন নিষ্ঠুর ডাক্তারের মতো ছুরি চালিয়ে, অপারেশন করে সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হতে সাহায্য করলো ইতিহাসের নির্দেশে।

জুম অর্থনীতি সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। স্বাভাবিক ভাবেই এই অর্থ-নীতির মৃত্যু হতো; জুমের জঠর থেকে বেরিয়ে আসতেন মায়েরা-বোনেরা, কেউ জমির মালিক হয়ে, কেউ জমির শ্রমিক হয়ে, সর্বহারা হয়ে। হয়ত তাঁরা যাদের দ্বারা শোষিত হতেন—তারা তাঁদের নিজের ঘরের লোক। কিন্তু সেখানেও আসতো

বাজার, আসতো বাজারের অসম-প্রতিযোগিতা। এপথই ধনতান্ত্রিক সমাজের পথ। যেখানে জুমিয়া ঘরের ছেলেরা এখন মন্ত্রিসভায় বসেছেন, সেখানেও জুমিয়া মা-বোনেরা জুম-অর্থনীতিকে ঘিরে এখন আর 'শান্তিপূর্ণ সুখী সংসার, রক্ষা করতে পারছেন না। সমগ্র জুমের ফসল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এক টুকরো কাপড়, একটু সুতো, একটু লবণ-কেরোসিন কিনতে।

জুমিয়া-মা-বোনদের ঘর ভেঙেছে ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা, কোনো জাতি নয়, উপজাতি নয়। এই ভাঙার দৃশ্য যেমন আমাদের নিকট মর্মান্তিক, তেমনি ভাঙার মধ্য দিয়েই জন্মলাভ করেছে একটি নতুন শ্রেণী, সর্বহারা শ্রমিক-শ্রেণী। জুমিয়া মা-বোনেরা সেই শ্রেণীর অংশ হয়ে, এই প্রথম সমবেত হয়েছেন ট্রেড ইউনিয়নের পতাকাতলে। তাদের সেই ভাঙা ঘর নতুন করে গড়ে তোলার লক্ষ্য সামনে রেখে। তারা ক্রমশঃ প্রথম সারিতে এসে দাঁড়াচ্ছেন। হতাশা, বেদনা রূপান্তরিত হচ্ছে কঠিন প্রতিজ্ঞায়। শোষিত, পেছনে পড়া জুমিয়া-মা বোন এখন আর গভীর জঙ্গলে জনবিচ্ছিন্ন নন, তাঁরা এক নতুন জনসমুদ্রে নিজেদের একতা-বদ্ধ করেছেন।

বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার এই দুটি দিককেই মনে রাখতে হবে। সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে ভিত্তি করে, সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা এখনো গ্রামের শতকরা নব্বই জনের মনকে গ্রাস করে থাকে। নানা ধর্ম, নানা বর্ণ, নানা জাতি উপজাতির গণ্ডীতে ভাগ করা মেহনতি শোষিত মানুষ সুস্পষ্ট দেখতে পান না যে শোষক শ্রেণীর কাছে কোনো জাত-বিচার নাই, নাই ধর্ম বা বর্ণ নিয়ে মাথা ঘামানো। কোনো কারখানা গড়ে ওঠে না একজাত বা এক ধর্মের শ্রমিক নিয়ে। তাই, রাজার ছেলে মন্ত্রী হলেন, না জুমিয়ার ছেলে মন্ত্রী হলেন, তার উপর নির্ভর করবে না শোষণ কমবে, না বাড়বে। গীর্জার প্রার্থনা সেরে, মসজিদ মন্দিরে নামাজ মন্ত্র পড়ে তাঁরা ঠাণ্ডা মাথায় যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করতে পারেন—একসাথে বৈঠক করে, যদি বড়লোকের মুনাফা বাড়ানোতে কোন সঙ্কট সামনে আসে। তাদের একমাত্র বিচার্য বিষয় হলো মুনাফা। কারখানার মালিক যেমন নিজের মুনাফার স্বার্থে জড়ো করেন সকল জাতি, সকল ধর্ম সকল বর্ণের শ্রমজীবী মানুষকে, তেমনি এই সকল জাতপাতের মেহনতি মানুষ প্রতিদিন কারখানায় দীক্ষিত হন, আন্তর্জাতিকতায়, মালিকের বিরুদ্ধে শোষণ-হীন সমাজ গড়ে তোলার শপথ নিয়ে।

একজন প্রগতিশীল লেখকদের দায়িত্ব হলো, এই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে কখন, কোথায়, কোন চেহারা নিয়ে এই শ্রেণী-সংগ্রাম আত্মপ্রকাশ করছে—তা তুলে

ধরা। শ্রেণী-দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখে সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা। শোষক শ্রেণীর হাতে আছে পত্রিকা, রেডিও, সাহিত্য,নাচ-গান। টাকা দিয়ে কিনে রাখা এই সাংবাদিক-শিল্পী-সাহিত্যিক কখনো ঘুম-পাড়ানি সাহিত্য রচনা করেন, কখনো গৃহযুদ্ধের রসদ তৈরী করেন, কখনো হতাশায় ডুবিয়ে রাখেন—শ্রেণী সংগ্রামের সৈনিকদের, নিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশ্যে। সত্যকে মিথ্যার জালে ঢাকার জন্য বন্ধুকে শত্রু করার জন্য বড লোকের এবং তাদের সরকারের টাকার কোন অভাব নাই। প্রগতিশীল লেখককে কলম ধরতে হবে কোথাও আসামের মতো ঘটনাকে কেন্দ্র করে, কোথাও হেলিয়ামুড়ার মতো ঘটনাকে কেন্দ্র করে, যারা শ্রমজীবী মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দুই পরস্পর বিরোধী শিবিরে—তাদের মুখোশ খুলে দেবার জন্য। একাজে তিনি একা নন। প্রতিটি গণতন্ত্র-প্রিয় লেখককে জড়ো করতে হবে, সংখ্যালঘুদের সংবিধান-সম্মত অধিকার রক্ষার সংগ্রামে। কখনো কখনো স্বৈরাচারী শক্তির আক্রমণ থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার স্বার্থে, বুর্জোয়া সাহিত্যিকদের সাথে তাঁকেও সহবাস করতে হবে এক শিবিরে। কিন্তু তা নিশ্চয়ই হবে সাময়িক, একটি বিশেষ পরিস্থিতিকে সামনে রেখে, সীমাবদ্ধ একটি লক্ষ্যকে দৃষ্টিতে রেখে। প্রগতিশীল লেখকের কলমকে মূলতঃ হাতিয়ার হতে হবে সর্বহারা শ্রমিককে একটি শ্রেণী-হীন সমাজের জন্য প্রস্তুত করতে, তাকে রাজনীতি সচেতন করার কাজে,তাকে সমাজতান্ত্রিক চেতনায় সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করার জন্য।

শ্রেণী-সংগ্রাম কোনো দল বা পতাকার জন্য অপেক্ষা করে না। যেখানে দল নাই, ইউনিয়ন নাই, পতাকা নাই – সেখানে মেহনতি মানুষ লড়ছেন—স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে। কখনো এ-এ-রোডে, কখনো কারখানায়, কখনো স্কুলে-কলেজে, কখনো মাঠে ময়দানে। কিন্তু যাঁরা লড়ছেন খাদ্যের জন্য, মজুরীর জন্য, স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য—তাঁরা কি জানেন যে তাদের শত্রু এক, সংগ্রাম অভিন্ন? তারা কি খবর রাখেন যে বিহারে যখন তাদের দমন করা হচ্ছে পুলিস দিয়ে, কলকাতায় তখন তাঁরাই জয়ী হচ্ছেন সকল বিভেদনীতিকে অগ্রাহ্য করে, তাঁরা কি জানেন যে, এশিয়া থেকে আফ্রিকার গভীর অরণ্যে তাদের লড়াই আজ একটার পর একটা দেশে বিজয়ী হচ্ছে? শোষক শ্রেণীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ শাসন ক্ষমতা। প্রগতি-শীল লেখক যদি শ্রমিকশ্রেণীকে এই সঠিক খবর দিতে পারেন, বড়লোকের প্রচার-যন্ত্রকে ভোঁতা করে দিয়ে তাদের সকল সংগ্রামকে একই শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, একমাত্র তখনই তাঁরা শ্রমিক শ্রেণীকে সমাজতান্ত্রিক চেতনায় বলিষ্ঠ করতে পারবেন; তাদের একটি সুসংহত রাজনৈতিক সৈন্যদলে পরিণত করতে, তখন তাঁদের কলম হবে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

বর্তমান পরিস্থিতি ও শিল্পী সাহিত্যিকদের কর্তব্য

আজকের এই সভায় যে বিষয়ে আমাকে বলতে বলা হয়েছে,সে সম্পর্কে বলার মতো অনেক যোগ্য শিল্পী-সাহিত্যিক এই সভাতেই আছেন। আমি এসেছি একটি আলোচনার সূত্রপাত করতে। আমাদের যা কর্মসূচী রয়েছে, যে লক্ষ্যে আমরা এগোচ্ছি এবং লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকরা যা লিখছেন বা সৃষ্টি করছেন, তার মধ্যে ঐক্যমত সৃষ্টির জন্য এই ধরনের আলোচনা আরও জোরদার করার দরকার। ব্যাপক করা দরকার তার কারণ হচ্ছে, শিল্পের বিষয়ে সাহিত্যের বিষয়ে নানা মত পার্থক্য আছে। এবং তা থাকতেই পারে। এই মতপার্থক্য শুধু তাদের সঙ্গে নয় যারা আমাদের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং সেই বিরোধিতায় আমাদের কোনও দ্বিধা নেই। কিন্তু আমরা যারা একসঙ্গে চলতে চাই, কাজ করতে চাই, এবং সেখানে মূলগত পার্থক্য না থাকলেও (আশা করি নেই), তবু কিছু মতপার্থক্য আছে ও থাকবেই। কারণ এটা আমরা মেনেই নিয়েছি যে,শিল্পের বিষয়ে,সাহিত্যের বিষয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়। এটাও আমরা মেনে নিয়েছি, যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি এবং যে লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি, সেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রসঙ্গগুলি নিয়ে সমাজকাঠামো নিয়ে আমাদের মধ্যে মিল-অমিলের বিষয়টি অনেকটা স্পষ্ট, কিন্তু সুপার স্ট্রাকচার-এর ক্ষেত্রে কোন্‌টা ভালো সাহিত্য, ভালো নাটক, কোন্‌টা আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই—সেই বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল বিষয়।

স্বভাবতই এ নিয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিছু মতপার্থক্য থাকবেই, তাতে কোনো ক্ষতি আছে বলে আমি মনে করি না। অন্তত মূলগতভাবে যদি আমরা কিছুটা একমত হতে পারি।

আমরা একটা রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে চলেছি। আমাদের একটা আদর্শ আছে, যে-আদর্শকে আমরা রূপায়িত করতে চাই। আমরা একটা বিশেষ দর্শনে বিশ্বাস করি। একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা সমাজব্যবস্থা পাল্টাতে চাই। সমাজের একটা ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন আনতে চাই। আমরা চাই মানুষের মধ্যে একটা বড়োরকমের পরিবর্তন আসুক এবং সেই কারণেই আমরা কাজ করে চলেছি। যদিও আমরা জানি, এমন পরিবর্তন ঘটতে এখনও দেরি আছে। এই যে পরিবর্তন আমরা চাইছি, তার জন্য কতকগুলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার, রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন দরকার। তার জন্য আমরা লড়াই করে চলেছি। এবং আমরা মনে করি, শিল্পী-সাহিত্যিক, সংস্কৃতির সাথে জড়িত যত মানুষ আছেন এ কাজে তাঁদেরও একটা মস্ত বড়ো ভূমিকা আছে। তাঁরা এর থেকে বিচ্ছিন্ন নন। তাঁদের যা ভূমিকা, তাঁরা যদি তা পালন করেন, আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেছি, তার সঙ্গে যদি ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেন, আলাপ-আলোচনা করে যদি সেই দৃষ্টিভঙ্গিকেই তুলে ধরেন, তবেই লক্ষ্যের দিকে পেঁীছনো যাবে।

সেই লক্ষ্যে পেঁীছনোর জন্য বিভিন্ন দিক থেকে সর্বাত্মক একটি কর্মসূচী নিয়ে আমরা চলি। আমরা যখন কোনো কর্মসূচী মানুষের কাছে রাখি তা সে কোনো অর্থনৈতিক কর্মসূচীই হোক বা নির্বাচনের কর্মসূচীই হোক, আমাদের যে মূল লক্ষ্য তা সামনে রেখেই বলি, আসলে আমরা একটা ভাবাদর্শের কথাই বলি। শিল্প-সংস্কৃতির জগতে সরাসরি রাজনীতি করেন না এমন অনেক মানুষ, যাঁরা সেই লক্ষ্যে পেঁীছনোর জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, স্বভাবতই তাঁদের উপরও একটা দায়িত্ব এসে যায়। একটা পরিবর্তনের দিকে আমাদের দেশকে, মানুষকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। স্বভাবতই তার বিরুদ্ধেও বহু শক্তি আছে। আছে শিল্প-সাহিত্য এবং সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও। সংস্কৃতি-জগতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে স্রোত চলেছে, তার থেকে যদি জনসাধারণকে সরিয়ে আনতে না পারি, স্বতঃস্ফূর্ততাকে আমরা পরাস্ত করতে না পারি, তাহলে এই বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বুর্জোয়া ভাবধারা মানুষকে গ্রাস করবে। যে বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে আমরা প্রতিনিয়ত লড়াই করছি—

সমস্ত ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যেহেতু ঐ ভাবধারাগুলো মানুষের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে, সেই কারণে প্রতিনিয়ত একটা ভাবাদর্শের লড়াই চলেছে। সুপরিকল্পিতভাবে এই ভাবাদর্শগত লড়াই আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। আজকে যাঁরা সভা ডেকেছেন তাঁদের কাছে আমার আবেদন যে, আমি কয়েকটি কথা বললাম, সেটা বড়োকথা নয়; আরও সংগঠিতভাবে, ঐক্যবদ্ধভাবে যে-কয়েকটি সংগঠন এখানে উপস্থিত আছেন এবং যাঁদের কাছে আজও পৌঁছনো যায়নি, বহু ব্যক্তি আছেন যাঁরা এমন কোনও সংগঠনে নেই তাঁদের কাছেও আমাদের যেতে হবে যদি কোনও বিরোধিতা বা ভুল বোঝাবুঝিও থাকে, তবুও তাঁদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা করতে হবে, তাঁদের আমাদের পক্ষে নিয়ে আসতে হবে। এর জন্য আমাদের ধৈর্য সহকারে কাজ করতে হবে। ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে চলবে না, এটা মনে রাখতে হবে যে, নানারকম অর্থনৈতিক, পারিপার্শ্বিকতার নানা চাপ ও প্রতিকূলতার মধ্যে কখনও-কখনও দেখা গেছে, কোনও ব্যক্তি যিনি একদা ভালো সাহিত্যিক হতে পারতেন, তিনি অন্য পথে চলে গেছেন। সুতরাং মনে রাখতে হবে যে, আমাদের অনেকদূরে এগোতে হবে।

আমি সংবাদপত্রে দেখেছি,খবরও পাচ্ছি যে, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ সংস্কৃতির সপক্ষে লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকরা রাস্তায় নেমেছেন, প্রচার করছেন। আপনারা যাঁরা একাজ করছেন জেনেশুনেই করেছেন। আবার এমন কিছু কিছু সংবাদ পত্রও দেখেছি, যাঁরা এর বিরোধিতা করছেন, তাঁরা বলছেন, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের প্রয়োজন নেই। হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমরা এই মতের বিরুদ্ধেই দাঁড়াচ্ছি। আমাদের বামপন্থী সরকারের কর্মসূচীর মধ্যেই এটা আছে। তার মানে এই নয় যে, সরকার সাহিত্যের ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবেন। তার মানে এই নয় যে, তাঁরা লেখকদের বলবেন, তাঁদের কী লিখতে হবে। এমন কোনও crude (স্থূল) জিনিস হতে পারে না। কিন্তু আমাদের মতামতও জানাবার অধিকার আমাদের নিশ্চয়ই আছে। বলবার অধিকার আমাদেরও নিশ্চয়ই আছে। আমাদের সমাজে যা কিছু কুৎসিত, জঘন্য, কদর্য, তার প্রতি এই উদ্দেশ্যমূলক দরদ প্রকাশ আমরা কখনও মেনে নিতে পারি না। শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে কোন্‌টাকে আমরা কুৎসিত বলি, কোন্‌টাকে বর্জন করতে বলি, সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে। যখন দেখি কোনও নাটকে, সাহিত্যে, শিল্পে বাস্তবতার নামে এই সবের প্রতিফলন হচ্ছে, তখন সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে বেশি দেরি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে

এটাও মনে রাখতে হবে যে এই সবের পরিবর্তে আমরা মানুষকে কী দেবো। ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে আমরা কী পরিবেশন করবো বা করছি? ওদের তুলনায় গুণগতভবে সেগুলো ভাল কি না, এটাও আমাদের দেখতে হবে। এইভাবেই মানুষকে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসতে পারব। জোর জুলুম করে মানুষকে টেনে আনা সম্ভব নয়।

আমরা যে লক্ষ্যের কথা বলতে চাই, সংস্কৃতিকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, সে ব্যাপারে আপনারা ইতিমধ্যে শুনেছেন, জেনেছেন। আমরা সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে কিছু কাজও করেছি। এ সম্পর্কে আপনারা যদি মনে করেন, কোনও আলোচনা আছে, সমালোচনা আছে, আপনারা তা করতে পারেন। আপনারা যদি মনে করেন যে, ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে আমরা কোনও ভুল পদক্ষেপ নিচ্ছি, যাতে লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথে ক্ষতি হতে পারে, বাধার সৃষ্টি হতে পারে আপনারা তার শুরুতেই আমাদের বলতে পারেন। আমরা কখনই মনে করি না যে, আমরা সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। আমরা আপনাদের মতামত বোঝবার চেষ্টা করব, যদি আপনারা এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। কারণ, আমরা মনে করি, সম্পূর্ণভাবে এই বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার আগে, আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছনোর আগে, বুর্জোয়া এই সমাজ ব্যবস্থার বিকৃত মতাদর্শের বিরুদ্ধে আমাদের মতাদর্শকে জয়যুক্ত হতে হবে সমস্ত মানুষের কাছে। আমাদের intellectual victory অর্জন করতে হবে। সেই কারণে যারা অন্য পথে বিশ্বাস করে, ভুল পথে চলে, যারা অন্য সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাস করে, যারা সামন্ততান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ভাবধারায় বিশ্বাস করে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সুস্থ সংস্কৃতির শিবির গড়ে তুলতে হবে। মতাদর্শের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শত্রুদের পরাস্ত করতে হবে।

কিছু নাটক-সাহিত্য আছে, যেগুলো অসুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টি করে, কিন্তু কিছু মানুষকে আকৃষ্টও করে। সেই সবের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই। কিন্তু আমরা আবার এমনও দেখেছি যে, সুস্থ সংস্কৃতি, সুস্থ সাহিত্য যা মানুষের চেতনাকে জাগিয়ে তোলে, মানুষের চেতনাকে বদলে দেয়, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে সেগুলোও মানুষকে আকৃষ্ট করে। গ্রামে যাত্রা হয়। আমি শুনছি, দু-ধরনেরই যাত্রা গ্রামে হচ্ছে। এর মধ্যে আমাদের ভ যাতে যেগুলো প্রগতিশীল, সেখানেও হাজার হাজার দর্শক যাচ্ছেন। তাঁরা সারারাত বসে সেগুলো দেখছেন। উৎসাহিত হচ্ছেন, উদ্দীপিত হচ্ছেন। এই কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, এগুলি মানুষকে আকর্ষণ করে। আমরা এগুলিকে উৎসাহ দিতে চাই, সাহায্য দান

করতে চাই। আমি আপনাদের এই কথাই বলব যে, এই প্রচলিত ধারার মধ্যে যেন আমরা সঠিক ধারাটিকে বেছে নিই।

কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, সাহিত্যের মধ্যে প্রগতিশীলতাই বা কী, আর প্রতিক্রিয়াশীলতাই বা কী? এটা ঠিক, শুধু বক্তব্যের সঠিকতা ও সত্যতা যাচাই করলেই হবে না, তা কী ভাবে প্রকাশিত হলো, পরিবেশিত হলো, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই কারণেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা দরকার। বিষয়বস্তু (content) ও প্রকাশ ভঙ্গিরও (form, সার্থক মিল হওয়া দরকার।

আমি এক নামকরা সাহিত্যিককে জানি, যিনি হঠাৎ একদিন অন্য সাহিত্য লিখতে শুরু করলেন। তার জন্যে আমি কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদকে, যিনি আমাদের মধ্যে এসব ভালো বুঝতেন, এ সম্পর্কে সেই সাহিত্যিককে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে, সাহিত্যিক ভদ্রলোক নাকি জবাব দিয়েছিলেন যে, আমাদের চোখের সামনে যেটা বাস্তব সেটা কি অস্বীকার করা যায়? আমি কিন্তু এই কথার অর্থ ঠিক বুঝি না। এটা ঠিক যে, সমাজের যে-যৌন বিষয় নিয়ে গল্প লেখা হয়, ঘটনা হিসেবে তা হয়তো বাস্তব। কিন্তু যৌনতা বাস্তব বলেই অন্য আরও যে বাস্তব আছে, যার দিকে মানুষকে আমরা নিয়ে যেতে চাইছি, আমরা মানুষের মনটাকে বদলাতে চাইছি, একটা পরিবর্তন আনতে চাইছি, তার কি কোনও মূল্য নেই? সেটা আমাদের দেখে নিতে হবে না? যা খারাপ সেটা যেমন বাস্তব, যা ভালো সেটাও তো বাস্তব। এই দুয়ের মধ্যে কোনটাকে আমরা তুলে ধরবো সেটাই ভাবতে হবে। অনেক লেখক আছেন, যাঁরা হয়তো বলবেন,টাকাপয়সার অভাবে বা নানাকারণে এসব করেন। কিন্তু এই যুক্তি তো আমরা সমর্থন করতে পারি না। বাস্তবতার মধ্যেও আমাদের বেছে নিতে হবে, কোনটাকে আমরা বড়ো করে তুলব, মানুষের কাছে পরিবেশন করবো। আমি বলছি না যে, একটা রক্তমাংসহীন আদর্শ (ideal) মানুষ তৈরি করতে হবে। তাতে সাহিত্য সাহিত্য হবে না। একটা মনগড়া লিখে দিলাম যে, এই হলো পুরুষ আর এই নারী, যার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই, তেমন সাহিত্য কেউ পড়ে না। সেটা অবৈজ্ঞানিক চিন্তা। কাজেই যেটা খুব পরিষ্কার কথা, সেটাই আমাদের বুঝে নিতে হবে।

বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে আমরা দেখেছি, এমন অনেক সাহিত্য লেখা হয় যেগুলির সেই সময়ে নিদারুণ বিরোধিতা হয়। এমন করে দিতা হয় যে সেগুলো সাময়িক চাপা পড়ে যায়। পরবর্তীকালে মানুষের প্রগতির সঙ্গে

সঙ্গে সেইসব সাহিত্য সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা-গুলিও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে।

আমেরিকান ফিল্মে যেসব মারামারি দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখানো হয় সেইসব নাকি কিছু হিন্দী ও বাঙলা ফিল্মেও দেখানো হচ্ছে। আমি সব ছবিকে generalise করছি না। সেটা অন্যায় করা হবে। ইদানিংকালে দেখেছি এবং ইউরোপেও শুনে এলাম, ফিল্মে Sex, Violence introduced হচ্ছে। এইসবের মধ্যে দিয়ে আমাদের যুবসমাজকে অন্য পথে তারা চালিত করতে চাইছে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। হতে পারে, কিছুটা টাকা রোজগার করার জন্য, কিন্তু কিছুটা ইচ্ছাকৃতও এসব করা হয়। সামগ্রিকভাবে এসব দেখে মনে হয়, আসলে উপর থেকে এইসব ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশের শতকরা আশি ভাগ মানুষ নিরক্ষর, অক্ষরজ্ঞানহীন। কোন্‌টা কী, তা বিচার করার সব ক্ষমতা তাঁদের নেই। তাঁরা এই সমস্ত দেখছেন স্বতস্ফূর্ত ভাবে। এই স্বতঃস্ফূর্ততায় তাঁদের আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। নিরক্ষর মানুষের পক্ষে সব কিছু বিচার করার সুযোগ থাকে না। সেইজন্য আমাদের কর্তব্য, দেশের যা কিছু ভালো আছে, অতীতে যা ছিল, তাকে গুছিয়ে তাঁদের কাছে পরিবেশন করা।

আমাদের সমাজে যখন এই রকম একটা অসুস্থ অবস্থা, যখন রাজনীতির মধ্যে অস্থিরতা, যখন দেশের যুবসম্প্রদায়ের সামনে হতাশা, বেকারী, তখন তাদের এইসব অসুস্থ পরিবেশের মধ্যে টেনে আনা হচ্ছে। ধর্মীয় নানা কুসংস্কার, কুচিন্তা ইত্যাদি তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এগুলো কখনই সুস্থ চেতনার লক্ষণ নয়। এইভাবে আমাদের যুবসম্প্রদায়কে বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা চলছে। সমাজব্যবস্থাকে বদলাবার কথা আমরা যেটা বলি, যে পরিবর্তন আনার জন্য আমরা সংগ্রাম করছি, সেই সমাজ-বিপ্লব এখনও সমাধা হয়নি। আমাদের অনেক কাজ বাকি আছে। সামনের নির্বাচনকে শুধু লক্ষ্য মনে করলে চলবে না। নির্বাচনের মাধ্যমে যেটুকু সুযোগ, তাকে রাজনৈতিক ভাবে মানুষের চেতনা বদলানোর কাজে, মানুষের কাছে যাওয়ার কাজে আমরা ব্যবহার করি। এটাই শেষ নয়, সব নয়। প্রতিটি মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে হবে—যুবসম্প্রদায়, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মেহনতী মানুষ, যেখানে যত আছে। কিন্তু তারা যদি ঐভাবে একবার বিপথে চলে যায়, তাহলে কিসের জন্য তারা লড়াই করবে, কী তাদের লক্ষ্য হবে, কী হবে তাদের ভাষা, কিসের আকর্ষণই বা তাদের থাকবে? কিছুই তাদের থাকবে না। সব থেকে বিচলিত হবার কথা এইটাই। ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই চায় যে, তারা ও আনন্দ করবে, উৎসব করবে। কী করে এটা হয় যে,

যুবসম্প্রদায়ের একটা অংশ বিপথে চলে গেল? আসলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অস্থিরতা এ তারই প্রতিফলন। মারদাঙ্গা নানান সংঘর্ষের কথা যা আমরা বলি, তার মধ্যে যুবসম্প্রদায়ের একটা অংশকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিগতদিনে টেনে আনা হয়েছে। মানুষ খুন করতে শেখানো হয়েছে। পরীক্ষায় জাল-জুয়াচুরি করা, মানুষের ওপর জোর-জুলুম করা, হাঙ্গামা করা, প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করা ইত্যাদি শেখানো হলো। আমাদের দায়িত্ব, তাদের ভুলপথ থেকে সরিয়ে আনা। সরকারের দায়িত্ব আছে নিশ্চয়ই। এ ব্যাপারে আমাদের হস্তক্ষেপ করতে হবে, যাতে যুবসম্প্রদায় কোনোভাবেই বিপথে চালিত না হয়।

আপনারা জানেন যে, সামনেই নির্বাচন আসছে। হঠাৎ একটা নির্বাচন কেন হচ্ছে, তাও আপনারা জানেন। এর জন্য আপনারা দেখবেন, পয়সার খেলাও শুরু হবে। এই অবস্থায় আমাদের পক্ষে যাঁরা এসেছেন তাঁদের চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে, কোনটা মন্দ বোঝাতে হবে। গ্রামে, শহরে, সর্বত্র আমাদের সজাগ থাকতে হবে। সেই কারণে আমি বলতে চাই যে, শিল্পী-সাহিত্যিক যাঁরা আছেন, যাঁরা নাটক করেন, যাঁরা শিল্প সৃষ্টি করেন, তাঁদেরও একটা বড় দায়িত্ব আছে। সুস্থ সঠিক মতাদর্শের পক্ষে যত বেশি বেশি মানুষ আসতে পারে, তার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কেবলমাত্র পরিবেশের স্বতঃস্ফূর্ততার উপর আমরা নির্ভর করতে পারি না। পাড়ায়-পাড়ায় এলাকায়-এলাকায়, গ্রামে-শহরে আমাদের চেষ্টা চালাতে হবে আরও অনেক মানুষকে আমাদের কাছে টানবার। সকলেই নিশ্চয়ই আমাদের মতো রাজনৈতিক কাজ করেন না। কিন্তু তার মধ্যে বহু সৎ মানুষ আছেন, যারা সুস্থতা চান। তাঁদের আমাদের বের করতে হবে। আমাদের অসংখ্য মানুষ দরকার।

নির্বাচন একটা রাজনৈতিক লড়াই। এই রাজনৈতিক লড়াই আমাদের কাছে একটা সুযোগ। সাধারণভাবে এই সময়ে সমস্ত মানুষ, যাঁরা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামান না, তাঁরা নির্বাচন যখন আসে তখন রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন। ভাবেন, কে সরকার গঠন করবে, তাতে কী অবস্থা হবে, সমস্ত জিনিসের দাম কেন বাড়ছে, কার জন্য বাড়ছে, কোন্ সরকারের অপরাধে কোন্ নীতির জন্য এসব হচ্ছে—এইসব নিয়ে গ্রামে শহরে,ঘরে-ঘরে কথাবার্তা হয়। এইটাই আমাদের কাছে একটা সুযোগ। এই সুযোগে আমরা ভারতবর্ষের চারদিকে সদলবলে মানুষের কাছে পৌঁছে যাব। আপনারা যাঁরা সাধারণভাবে আমাদের নীতিগুলিকে, লড়াইকে সমর্থন করেন, তাঁরা আমাদের সংগ্রামকে শক্তিশালী, জোরদার করে তুলুন যাতে ভারতবর্ষে একটা দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারি, যাতে

আমরা দেখতে পারি যে যারা প্রতিক্রিয়াশীল, স্বৈরাচারে বিশ্বাস করে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বিশ্বাস করে, যারা প্রাদেশিকতার বিষ ছড়াতে চায়, তাঁদের বিরুদ্ধে আমরা পশ্চিমবাংলার মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছি। ভারতবর্ষে অনেক জায়গায় দুর্ভাগ্যবশত সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা,জাতিগত বিভেদ নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ চলছে। অন্য ভাষার বিরুদ্ধে জেহাদ চলছে। পশ্চিমবাংলা এসবের ঊর্ধ্বে; কিন্তু এখানেও শত্রুপক্ষ তৎপর। আমাদের এইসব ব্যাপারে প্রতিক্রিয়ার শক্তি টেনে নামাতে চাইছে। আমরা যারা রাজনীতি করি, আপনারা যাঁরা শিল্প-সাহিত্য করেন, এ সম্পর্কে সকলকে সজাগ থাকতে হবে। এরা যে শুধু সরকারের শত্রু। বামপন্থীদলগুলির শত্রু, তা নয়। আমি বলছি, এরা সমগ্র সমাজের শত্রু, আমরা লক্ষ্য করছি, ছোটো খাটো নানা গোষ্ঠীধর্মের নামে এটা-সেটার নামে মানুষের মধ্যে বিষ ছড়াচ্ছে। আমরা সবসময়েই বলি যে, আমরা কখনও ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করি না। কিন্তু এরাই ধর্মের নামে, প্রাদেশিকতার নামে, সমস্ত ভারতবর্ষকে দ্বিধা-বিভক্ত করতে চাইছে। ধর্মের নামে, মড়ার খুলি নিয়ে কুৎসিৎ নাচ নাচছে। আমরা এ বরদাস্ত করতে পারি না। এরজন্য সরকার, পুলিশ, প্রশাসন যা করার করবে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে আপনাদের আমাদের একযোগে কাজ করতে হবে। এরা সমাজের কলঙ্ক, গোটা ভারতবর্ষের শত্রু। এর মধ্যে পশ্চিমবাংলাই একটা রাজ্য যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ লালঝাণ্ডার নিচে জোটবদ্ধ হয়েছে। ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা ভারতবর্ষকে ভালবাসি। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের কথা আমরা ভাবি না। যখন একটা আদর্শ বা লক্ষ্য পুরণের প্রত্যাশায় পশ্চিমবাংলার মানুষ সংগঠিত হচ্ছে, তখন সমগ্র ভারতবর্ষে বিশৃংখলা। আজ একটা দল, কাল অন্য দল, নীতিও পাল্টে গেল। এইজন্য মানুষ পশ্চিমবাংলার দিকে তাকিয়ে। অন্য এক ইতিহাস স্বাভাবিকভাবেই এখানে সৃষ্টি হচ্ছে।

এটা শুধু নির্বাচন বা সরকার পরিবর্তন সংক্রান্ত কথা নয়। আমাদের মূল ও সুদূরপ্রসারী দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে এক মুহূর্তও ভুললে চলবে না। মুক্ত আকাশের নিচে যে অসংখ্য মানুষ বসবাস করে তাদের সংগঠিত করা, আমাদের সংগঠনে টেনে আনা, তাদের চেতনা জাগ্রত করা—এগুলোই আমাদের করতে হবে। আপনাদের কাছে আমার আবেদন, এই কাজে আপনারা আমাদের সহযোগিতা করুন। আমাদের সম্পর্কে যদি আপনাদের কিছু বলার থাকে, সমালোচনা থাকে, বলুন। আমরা সেগুলোয় নজর দেব, আলোচনা

পর্যালোচনা করব। মূলগত বিষয়ে আমরা একটা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাই। যদি কিছু মতপার্থক্য দেখা যায় সে-সম্পর্কে আগামী দিনে আমাদের অভিজ্ঞতা আপনাদের অভিজ্ঞতা একত্রে জড়ো করে আমরা লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চাই। এই সঙ্ঘবদ্ধভাবে চলা শুধু কয়েক দিনের জন্য নয়, নির্বাচনের পরেও যাতে আমরা ব্যাপকভাবে এগিয়ে যেতে পারি তার চেষ্টা করতে হবে। কারণ সময় খুব ভাল আসছে না। তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। যেখানে যেখানে আমাদের শক্তি আছে সেই শক্তিকে সংঘবদ্ধ করতে হবে এবং পশ্চিম বাংলা নিশ্চয়ই সেইরকম রাজ্য, যেখানে আমাদের কর্মসূচী আছে। সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী যখন একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তখন এখানে কিন্তু সেই অস্থিরতা নেই। বামপন্থী আন্দোলন এখানে শক্তিশালী। স্বাধীনতার পর থেকেই বহু বছর ধরে পশ্চিমবাংলার জনগণের আন্দোলনে, সংগ্রামে আমরা নেতৃত্ব দিয়েছি। তার জন্য আমাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। অসংখ্য মানুষ জেল খেটেছে। বিনা বিচারে আটক হয়েছে বহু মানুষ। মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ফেলা হয়েছিল বহু মানুষকে। শত শত মানুষের ওপর গুলি চলেছে। কংগ্রেসী গুণ্ডারা আক্রমণ করেছে। আমাদের জীবন বলি হয়েছে। সত্তর সাল সাতাত্তর সাল অবধি যা ঘটেছে সবই আপনাদের জানা। অনেক নাটক অভিনয়ও জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমন তীব্র অভিজ্ঞতা কি ভারতবর্ষের কোথাও হয়েছে? কোথাও হয়নি। আমরা, এই পোড়খাওয়া মানুষেরা আজ অনেক সচেতন। সেই হিসেবে আমরা আজ যে সুযোগ পেয়েছি, তাকে সম্পূর্ণ-ভাবে গ্রহণ করে যাতে আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত হতে পারি, তার চেষ্টা করতে হবে। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, শুধু নির্বাচনের জন্য নয়, আজ আমরা যে একসাথে জড়ো হতে পেরেছি, এটাই বড় কথা। আপনারা যাঁরা লিখতে পারেন, নাটক-যাত্রা-চলচ্চিত্র করতে পারেন, তাঁরা যে রাস্তায় নেমেছেন, অন্যায়ের প্রতি-বাদ করছেন, এগুলি সেই মূল লক্ষ্যে পৌঁছবার, সেই সমাজ গড়বার দিকে নজর রেখেই চলেছে। মানুষের মধ্যে একটা সুস্থ চেতনার জাগরণ আমাদের আনতেই হবে।

প্রমোদ দাশগুপ্ত

শিল্প-সাহিত্যের জগতে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশমান সভ্যতার গতিধারার প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। আদিম সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার যুগ থেকে বর্তমান সমাজতন্ত্রের উত্তরণের যুগ পর্যন্ত অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটেছে ঐতিহাসিক নিয়মনীতিতে। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সমাজ-বিবর্তনের প্রতিটি স্তরে সামাজিক-অর্থনৈতিক চিন্তাধারা, সামাজিব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলীর ছাপ রয়ে গেছে সেই-সেই সময়ের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিরও বিকাশ ঘটেছে এবং ঘটছে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায়। তাই শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ সমাজবিকাশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কেবল সমাজবিকাশের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বললে ভুল হবে। সমাজবিকাশ এবং সমাজপরিবর্তনে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির একটা ভূমিকা রয়েছে। সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন বাঁকে যেমন নতুন নতুন শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনি এই পরিবর্তনের উপযোগী মানসিকতা এবং কর্মসূচী রূপায়ণের দৃষ্টিভঙ্গি নিরূপণে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি একটা ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করে থাকে। একটি সামাজিব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ব্যতিরেকে যেমন নতুন অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে না, তেমনি পুরাতন শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চিন্তার পরিবর্তন ব্যতিরেকে নতুন শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেনি। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশের প্রশ্নে, এই ক্ষেত্রে নতুন নতুন চিন্তার প্রশ্নে এটা

যেমন একটি দিক, আরো একটি দিক রয়েছে। সেটি হলো পুরাতন অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থার গর্ভ থেকেই নতুন অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থা জন্ম নেয়। ঠিক তেমনি পুরাতন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির কাঠামোর মধ্য থেকেই নতুন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উদ্ভব হয়।

লেনিন আমাদের শিখিয়েছেন: "কথাটা আমাদের মনে রাখা উচিত যখন ধরা যাক, প্রলেতারীয় সংস্কৃতির কথা আমরা বলি। আমরা যদি পরিষ্কার করে এ কথা না বুঝি যে, মানবজাতির সমগ্র বিকাশের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট সংস্কৃতির যথাযথ জ্ঞান লাভ করেই এবং সে সংস্কৃতিকে ঢেলে সেজেই কেবল আমরা প্রলেতারীয় সংস্কৃতি গড়তে পারি—একথা যদি আমরা না বুঝি তা হলে সমস্যার সমাধান করতে পারব না। প্রলেতারীয় সংস্কৃতি এমন একটা কিছু নয় যা কোত্থেকে উঠেছে কেউ জানেন না, যারা নিজেদের প্রলেতারীয় সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ বলে অভিহিত করে, তাদের স্বকপোলকল্পিত উদ্ভাবন তা নয়। ওটা একেবারে বাজে কথা। পুঁজিবাদী সমাজ, জমিদারী সমাজ, আমলাতন্ত্রী সমাজের জোয়ালের নিচে মানবজাতি যে জ্ঞানভাণ্ডার জমিয়েছে, প্রলেতারীয় সংস্কৃতিকে হতে হবে তারই সুনিয়মিত বিকাশ। মার্কসের হাতে ঢেলে সাজা অর্থশাস্ত্র যেমন আমাদের দেখিয়েছে মানব সমাজকে কোথায় যেতে হবে, অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে শ্রেণীসংগ্রামের উদ্ভরণে প্রলেতারীয় বিপ্লব শুরুর দিকে, ঠিক তেমনিভাবেই এই সমস্ত পথ ও রাস্তা পৌছিয়েছে, পৌছায় ও পৌছচ্ছে প্রলেতারীয় সংস্কৃতিতে।"

তিনি আরো বলেছেন: "বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের ভাবাদর্শ হিসাবে মার্কসবাদ বিশ্ব ঐতিহাসিক তাৎপর্য অর্জন করেছে এই জন্য যে, মার্কস কখনই বুর্জোয়া যুগের মূল্যবান সুকৃতিকে বিসর্জন দেননি, বরং উল্টে, মানব চিন্তা ও সংস্কৃতির দুই সহস্রাধিক বছরের বিকাশের মধ্যে যা কিছু মূল্যবান ছিল, তাকে আত্মস্থ করেছেন ও ঢেলে সাজিয়েছেন। এই ভিত্তিতেই ও এই ধারাতেই সর্ববিধ শোষণের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের শেষ সংগ্রামস্বরূপ তার একনায়কত্বের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত হয়ে আরো যে কাজ চলবে, তাকেই সত্যকার প্রলেতারীয় সংস্কৃতির বিকাশ বলে স্বীকার করা যায়।

"সাম্প্রতিক ইতিহাস এবং বিশেষ করে কমিউনিস্ট ইস্তেহারের আবির্ভাবের সময় থেকে বিশ্বের সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতের অর্ধশতাব্দীর বিপ্লবী সংগ্রামের সমগ্র অভিজ্ঞতায় তর্কাতীতরূপে প্রমাণ হয়েছে যে, কেবল মার্কসবাদের বিশ্বধ্যানই হলো বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ, দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতির সঠিক অভিব্যক্তি।"

নতুন এবং উন্নত শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশের জন্য আমাদের অবশ্যই এই

লেনিনবাদী নীতি অনুসরণ করতে হবে। অনেকের ধারণা আছে যে, ভারতের বুকে নতুন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হলে এ বিষয়ে পূর্বতন সমস্ত কিছুর অবলুপ্তি ঘটাতে হবে। এই ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত এবং অর্থহীন। শিল্প-সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতের যে ঐতিহ্য, তা মহান। এই ঐতিহ্যের দুনিয়াজোড়া সুনাম রয়েছে। আর এই ঐতিহ্য আকস্মিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ জন্য বিভিন্ন সময়ে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের কঠোর ও কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। সেই সমস্ত সংগ্রামের প্রতিফলন ঘটেছে ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে। বিভিন্ন সময়ের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিভিন্ন যুগের নানা সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের স্বাক্ষর বহন করছে। তাই সেগুলিকে যেমন রক্ষা করতে হবে, তেমনি সেই সমস্ত সৃজনশীল কর্মকাণ্ড থেকে শিক্ষা গ্রহণ ক'রে দোষ-ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তিগুলি দূর করে নতুন নতুন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে।

এর অর্থ কি এই যে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রশ্নে শ্রেণীসংগ্রামের কোনো স্থান নেই? না, তা নয়। এক্ষেত্রেও যেমন শ্রেণীচেতনার প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি অপরিহার্যভাবেই প্রয়োজন রয়েছে শ্রেণীসংগ্রামের। লেনিন বলেছেন, "পুঁজিপতিদের জন্য প্রয়োজনীয় চাকর তৈরি করত সাবেকী স্কুল, বিদ্বানদের তা পরিণত করত এমন লোকে যাদের লিখতে ও বলতে হয় পুঁজিপতিদের মর্জিমতো। তাই তা ঝেঁটিয়ে দূর করা আমাদের উচিত। কিন্তু তা দূর করা, চূর্ণ করা উচিত, এ কথার মানে কি এই যে, লোকের পক্ষে প্রয়োজনীয় যা কিছু মানবজাতি সঞ্চিত করে তুলেছে, তা আমরা সেখান থেকে নেব না? তার মানে কি এই যে, কোন্‌টা পুঁজিবাদের পক্ষে প্রয়োজন এবং কোন্‌টা কমিউনিজমের জন্য দরকার, তার তফাত টানতে আমাদের হবে না?"

যে সমাজে হাজার হাজার বছর ধরে উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা চলে আসছে, সেখানে শোষকশ্রেণীগুলি তাদের শাসনের মধ্য দিয়ে সমস্ত ক্ষেত্রেই বিরাট শক্তি স্থাপন করেছে। তাদের সুদীর্ঘ শাসন থেকে মানবসমাজে উদ্ভূত হয়েছে অনগ্রসরতা, অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা, পারস্পরিক সন্দেহ ও প্রবঞ্চনা। যুগ যুগ ধরে এই ব্যবস্থা চলে আসছে। এর বিষাক্ত প্রভাব বিস্তার করেছে শোষিত জনগণের এবং সমাজের অন্যান্য অংশের উপর। এ হচ্ছে শোষকশ্রেণীগুলির নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণীশাসন বজায় রাখার প্রচেষ্টার অনিবার্য ফল। শোষকশ্রেণীগুলির প্রভাব যে কেবল বিপ্লব জয়ী হবার পূর্ব পর্যন্ত থাকে তা নয়, শোষকশ্রেণীগুলি ক্ষমতার আসন থেকে উৎখাত হবার পরও সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত এই প্রভাব টিকে থাকে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির কর্তব্য হলো,

এই প্রভাবের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম পরিচালনা করা। এই সংগ্রাম সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। প্রলেতারীয় অর্থাৎ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শে বিশ্বাসী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের অবশ্যই এক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। আর এই সংগ্রাম পরিচালনার ভিত্তি হবে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। মার্কসবাদের দর্শন—বস্তুবাদ। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো বনিয়াদ—তার উপরেই রাজনৈতিক উপরিকাঠামো দণ্ডায়মান। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা যেখানে দেখেন দ্রব্যের সঙ্গ দ্রব্যের সম্পর্ক (এক পণ্যের সঙ্গে অন্য পণ্যের বিনিময়), মার্কস সেখানে উদ্ঘাটিত করলেন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। লেনিনের ভাষায়—"সব কিছু নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক বচন, ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতির পিছনে কোনো না কোনো শ্রেণীর স্বার্থ আবিষ্কার করতে না শেখা পর্যন্ত লোকে রাজনীতির ক্ষেত্রে চিরকাল প্রতারণা ও আত্মপ্রতারণার নির্বোধ বলি হয়েছিল এবং চিরকাল থাকবে। পুরনো ব্যবস্থার রক্ষকদের কাছে সংস্কার ও উন্নয়নের প্রবক্তারা সর্বদাই বোকা বনবে, যদি না তারা একথা বোঝে যে, যত অসভ্য ও জরাজীর্ণ মনে হোক না কেন প্রত্যেকটি পুরনো প্রতিষ্ঠানই টিকে আছে কোনো না কোনো শাসকশ্রেণীর শক্তির জোরে এবং এই সব শ্রেণীর প্রতিরোধ চূর্ণ করার শুধু একটি উপায় আছে, যে শক্তি পুরনোর উচ্ছেদ ও নতুনকে সৃষ্টি করতে পারে—এবং নিজের সামাজিক অবস্থান হেতু যা তাকে করতে হবে—তেমন শক্তিকে আমাদের চারপাশের সমাজের মধ্যে থেকেই আবিষ্কার করে তাকে শিক্ষিত ও সংগ্রামের জন্য সংগঠিত করে তোলা। যে মানসিক দাসত্বের মধ্যে নিপীড়িত শ্রেণীগুলির সকলে এতদিন বাঁধা পড়েছিল, তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ প্রলেতারিয়েত পেয়েছে একমাত্র মার্কসের দার্শনিক বস্তুবাদ থেকে।"

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে এই লেনিনবাদী শিক্ষা আয়ত্ত করতে হবে এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ভিত্তিতেই সেই আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে।

ধনতান্ত্রিক সমাজে শিল্পসৃষ্টি পণ্য-উৎপাদনেরই মতো একটি উৎপাদন। এর নিজস্ব কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই, এর ব্যবহারিক মূল্য অনুভূত হয় একমাত্র বিনিময়ের মাধ্যমেই।

ধনতান্ত্রিক সমাজের এই মৌল নিয়মের সঙ্গে আরেকটি অমোঘ নিয়মও যুক্ত। সেই নিয়ম মার্কসের ভাষায়: "ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিয়মাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজের প্রতি একজন ব্যক্তির যে অনুরাগ তা হচ্ছে ঠিক সেই ব্যক্তির প্রতি সমাজের যে অনুরাগ তার বিপরীত অনুপাতে—ঠিক যেমন একজন অমিতব্যয়ী

ব্যক্তির প্রতি একজন সুদখোরের যে আকর্ষণ, তা অমিতব্যয়ীর আকর্ষণের সমরূপ নয়।" অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক অনুরাগ বিপরীত-অনুপাতে বিদ্যমান।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়। মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ড শ্রেণীনৈতিকতার উপর গড়ে উঠেছে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে এই শ্রেণীনৈতিকতার একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। লেনিন বলেছেন: "যে পুরাতন সমাজ বিরাজ করছে শোষণ ও নির্যাতনের ভিত্তিতে, তাকে ধ্বংস করাই শ্রমিকশ্রেণীর আশু দায়িত্ব। যে-নৈতিকতা পুরাতন সমাজকে ধ্বংস এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়তা করে, তাই হবে সর্বহারা-শ্রেণীর নৈতিকতা।" তিনি আরো বলেছেন, 'কমিউনিস্ট নৈতিকতা হবে সেই নৈতিকতা, যা পুরাতন সমাজকে ধ্বংস করতে সাহায্য করে এবং যে সর্বহারা শ্রেণী নতুন কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তুলেছে, তার চার পাশে সমগ্র শ্রমজীবী জনগণকে সমবেত করতে সহায়তা করে।'

"কমিউনিস্ট নৈতিকতা হচ্ছে তাই, যা সমস্ত শোষণ ও যে-কোনো ধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে ও সংগ্রাম পরিচালনা করে।"

বুর্জোয়া নৈতিকতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বুর্জোয়া নৈতিকতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে। ব্যক্তিগত মেধা, যোগ্যতা, সুযোগ ইত্যাদির উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বুর্জোয়া সমাজে সৃষ্টি করে প্রচণ্ড আত্ম-অহমিকা, নিজের স্বার্থ সম্পর্কে অতি সচেতনতা এবং অপরের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীনতা বা এমন কি বিরোধিতা।

বুর্জোয়া সমাজের অতিরিক্ত আত্মসচেতনতা ও স্বার্থান্ধতা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বহারার শ্রেণী-সংগ্রামেও প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে কলুষিত করে। অর্থনৈতিক সংগ্রাম শ্রেণী-সংগ্রামে উন্নীত হলে সেই সংগ্রাম সামগ্রিক শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থকেই রক্ষা করে।

প্রলেতারীয় নৈতিকতা এই স্বার্থান্ধতার বিরোধী। সর্বহারা বিপ্লব শুধু সর্বহারার মুক্তির স্বার্থেই পরিচালিত নয়, সমগ্র মানবসমাজের মুক্তির উদ্দেশ্যেই পরিচালিত। তাই বুর্জোয়া নৈতিকতার আদর্শে যে-বুর্জোয়া সংস্কৃতির সৃষ্টি প্রলেতারীয় সংস্কৃতি তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। প্রলেতারীয় সংস্কৃতির রূপান্তর এমনভাবে ঘটে যে, সেই সংস্কৃতি শুধু শ্রমিকশ্রেণীর নয় সমগ্র মানবজাতির অগ্রগমনেই সহায়ক হয়। বুর্জোয়া সংস্কৃতির সঙ্গে প্রলেতারীয় সংস্কৃতির পার্থক্য

এখানেই। প্রলেতারীয় সংস্কৃতিও শ্রেণীসংস্কৃতি। যদিও এই সংস্কৃতি শুধু প্রলেতারিয়েত নয়, পরিণামে সমগ্র মানব-সমাজের সংস্কৃতিকেই উন্নত করে। সেই মানবসমাজ শোষণ থেকে মুক্ত মানবসমাজ। সেই সমাজ এমন সমাজ যেখানে শ্রেণীশোষণ নেই। উৎপাদন, বণ্টন ও অপরিসীম বুদ্ধিগত বিকাশের সেই সমাজে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠবে তার সৃষ্টিকর্তা হবে প্রতিটি মানুষ, কারণ মার্কসের মতে এখন প্রতিটি মানুষই হবে একজন শিল্পী।

মানুষের প্রতি মানুষের সম্পর্কের নিরিখেই বিচার করতে হবে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্দোলনকে।

বুর্জোয়া সমাজ থেকে প্রলেতারিয়েতের রাজনীতিতে উৎক্রমণ—এটা খুবই কঠিন উৎক্রমণ। এটা কঠিন এই জন্য যে, বুর্জোয়ারা তাদের প্রচার ও আন্দোলনের সমস্ত যন্ত্রটা দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত কুৎসা রটিয়ে চলে। এ কাজ আরো কঠিন এই জন্য যে, সামন্তবাদী এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের উপরি-কাঠামোগত কুসংস্কারগুলি জনজীবনের উপর প্রতিনিয়ত প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এই সমস্ত সংস্কার, অভ্যাস এবং ধ্যান ধারণা দূর করা একদিনের কাজ নয়। দীর্ঘদিন ধরে, এমন কি বিপ্লবের পরও এ সবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। বুর্জোয়াদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা দিন কাটাচ্ছি। সমাজজীবনের সামন্তবাদী-ধনবাদী সাংস্কৃতিক প্রভাবগুলি অনেক শক্তিশালী। কেন না, এই সমস্ত প্রভাব বহুদিন ধরে সমাজজীবনে শিকড় গেড়েছে। তাই সমাজ পরিবর্তনের জন্য যেমন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাতে হবে, তেমনি উপরি-কাঠামোগত বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম সংগঠিত করতে হবে। এই দায়িত্ব সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদেরই পালন করতে হবে। সাংস্কৃতিক ঘাঁটি থেকে শত্রুদের তাড়ানোর সংগ্রাম এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম।

বি. টি. রণদিভে

মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আন্দোলনের সঙ্গে, পার্টির কার্যকলাপের সঙ্গে কমিউনিস্টদের, মার্কসবাদীদের, পার্টি-সদস্য বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাহিত্য ক্ষেত্রের বা সংস্কৃতি ফ্রন্টের কর্মীদের, শিক্ষাবিদ প্রভৃতির কার্যকলাপ কী ভাবে সংযুক্ত? তাঁরা কি সাহিত্য, শিল্প কিংবা শিক্ষা ফ্রন্টে নিজস্ব ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে ও অনুরূপ স্বাধীনভাবে পার্টির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি সমর্থন বা সহানুভূতি জানাবেন? শিল্পী, লেখক, সমালোচকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? পার্টির সদস্যপদ কিংবা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি তাঁর আনুগত্যের পরিপ্রেক্ষিতে এর অর্থ কী?

যাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ করেন, যাঁরা পার্টির সদস্য, তাঁরা বিপ্লবের স্বার্থে যোদ্ধা, তাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা। তাঁদের কর্তব্য হলো, তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করা, বিপ্লবের স্বার্থকে এগিয়ে দেওয়া, সাহিত্য ও শিল্প ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক মূল্য ও মান প্রচার করা। তাঁদের কর্তব্য হলো, তাঁদের ফ্রন্টে তাঁদের করণীয় কাজগুলি সম্পাদন করা এবং তাঁদের ও পার্টির আশেপাশে সাহিত্য জগতের ক্রমবর্ধমান স্তরকে সমাবেশ করা, বিপ্লবের স্বার্থে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জন্যে, পার্টির জন্যে তাকে সুসজ্জিত করা।

কাজেই, তাঁদের কর্তব্য হলো, তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে বিপ্লবের শত্রু-শ্রেণী-

গুলির বিরুদ্ধের লড়াই করা, বর্তমান সমাজব্যবস্থা বিলোপের জন্যে সংগ্রামরত শ্রেণীগুলিকে সমর্থন করা। তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টি, তাঁদের সাংস্কৃতিক বিচার অবশ্যই এই সংগ্রামকে প্রতিফলিত করবে এবং সংগ্রামে নিযুক্ত শ্রমজীবী জনগণের সাহায্য ও অনুপ্রেরণার একটা উৎস হবে। সমাজের প্রধান শক্তিগুলিকে বুঝতে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রদের সংগ্রামের ন্যায্যতা বুঝতে তাঁরা অবশ্যই বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্যদের সাহায্য করবেন। তাঁরা শাসকশ্রেণীগুলির অপপ্রচারের অবশ্যই পাল্টা জবাব দেবেন এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থে নতুন সম্প্রদায়কে সপক্ষে আনবেন।

সংক্ষেপে, মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের সমগ্র সাহিত্যকর্ম ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে সংগ্রামের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে অবশ্যই গণ্য করতে হবে। শিল্প ও সাহিত্য ফ্রন্টে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পরিহার করে কেউ রাজনীতিতে, পার্টিতে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী থাকতে পারে না।

তার অর্থ কি এই যে, একটা নাটক, কবিতা, ফিল্ম যা-ই হোক না কেন, লেখা সম্পর্কে, কী লিখতে হবে সে সম্পর্কে, বিষয়বস্তু মাধ্যম ও উপস্থাপনের ভঙ্গি সম্পর্কে একটা পার্টি কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতে হবে? স্বভাবতই এটা অবাস্তব। —"এ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন নেই যে, সমস্ত বিষয়ের মধ্যে সাহিত্যই যান্ত্রিক বোঝাপড়া বা একীকরণ, সংখ্যালঘিষ্ঠের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের অধীন প্রায় নয় বললেই চলে। এ সম্পর্কেও কোনো প্রশ্ন নেই যে, এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ব্যক্তিগত প্রবণতা, চিন্তা ও কল্পনা, গঠনরীতি ও বিষয়বস্তুর জন্যে অধিকতর সুযোগ অবশ্যই নিঃসন্দেহে দিতে হবে। এসব অনস্বীকার্য। কিন্তু এসব শুধু দেখিয়ে দেয় যে, সর্বহারা পার্টি-স্বার্থের সাহিত্য-ক্ষেত্রটা তার অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে যান্ত্রিকভাবে একাকার হতে পারে না। যাই হোক, এটা এই প্রতিজ্ঞা বা বক্তব্যকে আদৌ খণ্ডন করছে না (বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাছে অচেনা ও বিস্ময়কর হলেও) যে, সাহিত্য সর্বতোভাবেই এবং আবশ্যিকভাবেই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কাজের একটা অঙ্গ, যা, অন্যান্য অংশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত।" —লেনিন, পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য, পৃঃ-৬৬, দশম খণ্ড, সংগৃহীত রচনাবলী।

বিষয়বস্তু নির্বাচন, উপস্থাপনাভঙ্গি প্রভৃতি লেখক ও সদস্যদের ব্যক্তিগত পছন্দের উপর ছাড়তে গিয়ে, পার্টি তাঁদের প্রতি এই নির্দেশ দেয় যে, তাঁদের উচিত সামাজিক বাস্তবতার উপর ভিত্তি করা, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে,

অতীতের দিকে তাকানো এবং তাঁদের শৈল্পিক উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দাসত্ব-মোচনকারী আন্দোলনের সহায়ক হওয়া। বিষয়বস্তু-নির্বাচন ইত্যাদি ব্যক্তিগত পছন্দের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়, কারণ কোন্ নির্দিষ্ট ঘটনা বা ক্রমাভিব্যক্তি একজন শিল্পী বা লেখকের সংবেদনশীল আবেগকে নাড়া দিতে পারে এবং শৈল্পিক সৃজনশীল কাজে তাঁকে অনুপ্রাণিত করতে পারে, তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তাঁদের সৃষ্টির জন্যে একটা বৈপ্লবিক বিষয়বস্তুর গ্যারান্টি দেবেন বলে আশা করা যায়।

বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বর্তমান ধনতান্ত্রিক বিশ্বে শ্রমের বিভাজন আছে, বুদ্ধিজীবীর কাজকর্ম একটা সংকীর্ণ এলাকার কেন্দ্রীভূত, মানবমনের অতীত ও বর্তমান সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশের অধিকার থেকে বিশাল জনসমষ্টি বঞ্চিত এবং বর্তমান সমাজব্যবস্থার সেবায় নিযুক্ত আছে বুদ্ধিজীবীদের একটা বিরাট অংশ। এই অবস্থায় মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের উপর রয়েছে একটা বিরাট দায়িত্ব এবং তা হলো জনগণের মধ্যে বিপ্লবী মান ও চেতনা প্রসারের জন্য তাঁদের সৃজনশীল ক্ষমতাকে ব্যবহার করা।

১৮৪৮ সালের জুন বিপ্লবে প্যারিসের শ্রমিক-সংস্থা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে মার্কস গণতান্ত্রিক প্রেসের কর্তব্য সম্পর্কে নিম্নোক্ত কথা বলেছিলেন:

"আমাদের জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, জনগণের ক্রোধের শিকারের জন্যে ন্যাশনাল গার্ড, রিপাবলিকান গার্ড ও লাইনের জন্যে কি আমরা একবিন্দু অশ্রু, একটা দীর্ঘশ্বাস, একটা কথাও খুঁজে পাই না?

"রাষ্ট্র তাদের বিধবাদের ও অনাথ শিশুদের প্রতি যত্ন নেবে, তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ডিক্রি জারি করা হবে!...

"কিন্তু সাধারণ মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর, সংবাদপত্রের দ্বারা তিরস্কৃত, চিকিৎসকদের দ্বারা পরিত্যক্ত, সম্মানিত সম্প্রদায় তাদের বলে চোর, পরগৃহে অগ্নিসংযোগকারী এবং গ্যালি স্লেভ, তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের অধিকতর দুর্দশায় ফেলা হয় এবং যারা বেঁচে আছে তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে ভালো, তাদের পাঠানো হয় বিদেশে। গণতান্ত্রিক সংবাদপত্রের অধিকার ও বিশেষ অধিকার হচ্ছে তাদের বিষাদক্লিষ্ট ভীতি-সঞ্চারকারী ভ্রূকে সম্মান করে মাল্যভূষিত করা। [পৃষ্ঠা ৪৯, মার্কস-এঙ্গেলস আরটিকলস ফ্রম নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুং, ১৮৪৮-৪৯]।

মার্কসবাদী লেখকদের জন্যে এটা একটা বিপ্লবী লক্ষ্যনির্দেশক বাক্য (রেভলিউশনারী মটো) হিসেবে ভালোভাবেই কাজ করতে পারে। বিপ্লবের

জন্যে, সাধারণ মানুষের জন্যে এই পক্ষপাতিত্ব, মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের সাহিত্য, সাহিত্য-বিষয়ক ও শৈল্পিক সৃষ্টির মধ্যে অবশ্যই প্রতিফলিত করতে হবে।

এটা কি অত্যধিক সংকীর্ণ বলে মনে হয় না? লেখকদের জীবনে যে বিচিত্র ধরনের আবেগময় বিষয়বস্তু সমুপস্থিত হয়, তা নিয়ে কাজ করার জন্যে তাঁদের প্রতিভা ও উদ্যোগ কাজে লাগানোর যথেষ্ট সুযোগ কি তা দেয়? তা কি তাঁদের বাধ্য করে কঠোর রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে, বর্তমান ক্রমবিকাশ নিয়ে কাজ করতে?

মোটেই না। এঙ্গেলস ১৮৮৮ সালের এপ্রিল মাসে, মার্গারেট হার্কনেসের লেখা উপন্যাস 'সিটি গার্ল'-এর প্রশংসা করে তাঁকে এক চিঠি লিখেছিলেন। সমগ্র বইটির ভিত্তি কি?—'মধ্য বয়স থেকে একটা পুরুষ কর্তৃক কুপথে পরিচালিত সর্বহারা মেয়ের পুরনো, সেই পুরনো কাহিনী।' এঙ্গেলস মন্তব্য করেন, আপনার গল্পে বাস্তব সত্য ছাড়াও যা আমাকে সর্বাধিক অভিভূত করে, তা হলো, এটা প্রকৃত শিল্পীর সাহস প্রদর্শন করে। আত্মসন্তুষ্ট অশিক্ষিত লোকদের স্যালভেশন আর্মি সম্পর্কিত ধ্যানধারণা তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করে আপনি স্যালভেশন আর্মি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এই আত্মসন্তুষ্ট অশিক্ষিত লোকেরা আপনার গল্প থেকে সম্ভবত এই প্রথম জানতে পারবে, কেন স্যালভেশন আর্মি জনগণের মধ্যে এরূপ সমর্থন পায়। শুধু তাই নয়, সর্বোপরি আপনি কালবিহীন-ভাবে সমগ্র বইটির মূলভিত্তি, মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটি লোক কর্তৃক কুপথে পরিচালিত সর্বহারা বালিকার পুরনো, সেই পুরনো কাহিনীটিকে পোশাকাচ্ছাদিত করেছেন। কিন্তু আপনি অনুভব করেছিলেন যে, আপনি একটা পুরনো গল্প বলতে পারেন, কারণ উপস্থাপনার সত্যতা দ্বারা আপনি তাকে একটা নতুন রূপ দিতে সক্ষম।...আপনার মিঃ গ্রান্ট একটা উৎকৃষ্ট রচনা"—তারপর এঙ্গেলস বলেন যে, গল্পটা যথেষ্ট বাস্তব নয়। "আমার মতে বাস্তবতা বলতে বিস্তৃত বর্ণনার সততা ছাড়াও বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ চরিত্রের প্রকৃত পুনঃস্থাপনও বোঝায়।" তিনি আরো বলেন যে, যদিও উপন্যাসের চরিত্রগুলো বিশেষ ধরনের, তথাপি তাদের ঘিরে রাখা ঘটনাগুলো এবং সেইসব ঘটনা থেকে উদ্ভূত তাদের কাজ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়নি। উপন্যাসে শ্রমিক-শ্রেণী উপস্থিত হয়েছে নিজেকে সাহায্য করতে, অক্ষম একটা নিষ্ক্রিয় জনসমষ্টি হিসেবে। এঙ্গেলস বলেন যে, "এটা হয়তো ১৮০০ সালে সত্য হতে পারতো, কিন্তু ১৮৮৭ সালে নয়, যখন শ্রমিকশ্রেণী পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে সংগ্রামে

রত রয়েছে।" এঙ্গেলস বলেন, "একটা বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক উপন্যাস না লেখার জন্যে, লেখকের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গৌরবান্বিত না করার জন্যে আমি আপনার দোষ ধরা থেকে দূরে আছি, আমি যা বলতে চাই এটা আদৌ তা নয়। লেখকের উদ্দেশ্য যত প্রচ্ছন্ন থাকবে, শিল্পকাজের পক্ষে তা তত ভালো। প্রসঙ্গত আমি যে বাস্তবতার কথা উল্লেখ করছি, তা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও হঠাৎ বেরিয়ে আসতে পারে। আমি একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি।"

দাবি হলো এই যে, গল্পের নকশা যা-ই হোক না কেন, প্রধান বাস্তবতাকে—পরিপ্রেক্ষিত, যে পরিস্থিতি থেকে গল্প বের হয় তা, এবং যে-পরিস্থিতি থেকে চরিত্রগুলির ক্রিয়াকলাপ বের হয় তা—লেখকের হারিয়ে ফেলা উচিত নয়। সেই সঙ্গে এঙ্গেলস বলেন যে, বাস্তবতার নামে তিনি সমাজতন্ত্রের উপর একটা বক্তৃতা চান না।

মিন্না কাউৎস্কির উপন্যাস 'ওল্ড অ্যাণ্ড নিউ' সম্পর্কে তাঁকে লেখা এক পত্রে এঙ্গেলস মন্তব্য করেন, "স্পষ্টত আপনি সমগ্র বিশ্বের সামনে আপনার দৃঢ় বিশ্বাসগুলোর নজির প্রকাশ্যে ঘোষণা করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। কিন্তু আমার মনে হয়, কোনো বিশেষ নিদর্শন ব্যতিরেকেই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো স্বয়ং পরিস্থিতি ও কাজ থেকে স্রোতোবেগে বেরোনো উচিত এবং সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত সামাজিক দ্বন্দ্ব সমূহের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক সমাধানগুলো পাঠকের উপর অযাচিতভাবে চাপিয়ে দিতে লেখক বাধ্য নয়। এবং বিশেষত আমাদের পরিস্থিতিতে, উপন্যাসটি বুর্জোয়া পরিবেশের পাঠকদের কাছে, সর্বাধিক হৃদয়-গ্রাহী, সেটা সরাসরি আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, এবং যেহেতু একটি সামাজিক পক্ষপাতিত্বমূলক উপন্যাস তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থক করে, আমার মতে, যদি সচেতনভাবে প্রকৃত পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা ক'রে তাদের সম্পর্কে সুবিধাজনক মোহ ভেঙে দিয়ে এটা বুর্জোয়া জগতের মঙ্গলবাদকে চূর্ণ করে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার চিরন্তন চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ জাগায়। যদিও লেখক কোনো নির্দিষ্ট সমাধান দেন না, এমন কি কোনো বিশেষ পক্ষে প্রকাশ্যে দাঁড়ান না। [এঙ্গেলস—মিন্না কাউৎস্কির কাছে লেখা পত্র, পৃ ৪৬। সাহিত্য ও শিল্প—কার্ল মার্কস ও ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস, আন্তর্জাতিক প্রকাশক]

সুতরাং মার্কসবাদী লেখকদের কাছে দাবি হলো: সামাজিক বাস্তবতার প্রতি, বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকতে হবে। প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলো, সম্পদ ও দারিদ্র্য, ব্যক্তিগত প্রেম ও ঘৃণা, পরিবার, শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত সমস্যাবিশিষ্ট সমগ্র সমাজটিই হলো

গল্প-প্রবন্ধ ও সাহিত্যসৃষ্টির জন্যে একটা বিশাল ক্ষেত্র। সামাজিক আন্দোলনকে এগিয়ে দিতে সাহায্য করার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহারের জন্যে শিল্পীকেই পরিস্থিতি, আবেগ, গ্রুপ এবং ব্যক্তিবিশেষকে পছন্দ করে নিতে হবে।

প্রাপ্য সমস্ত স্বাধীনতা নিয়ে, মার্কসবাদী লেখক-বুদ্ধিজীবীকে তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পার্টি-পরিচালিত শ্রেণী-সংগ্রামকে অবশ্যই সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেটা অবশ্যই হবে তাঁর কাজের বিষয়বস্তু।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম জনগণের দুঃখদুর্দশা তাঁদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগ বর্ণনা করা ছাড়াও বুদ্ধিজীবী, লেখক ও শিল্পীদের আরেকটা দায়িত্ব পালন করেতে হবে এবং সেই দায়িত্বটাই হলো—যে মতাদর্শগত বহির্গঠন সমাজকে ঘিরে আছে এবং বুদ্ধিজীবীর দাসত্বের মধ্যে তাকে ধরে আছে, তাকে আঘাত করা। সমাজকে অধীনতায় রাখার জন্য শাসকশ্রেণীর মতাদর্শের ফাঁদ হলো সেই সমাজের ধর্ম, দর্শনশাস্ত্র, আইন, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্প, সংস্কৃতি ও শিক্ষা। শ্রমের বিভাজনবশত তারা সর্বাধিক সুবিধাজনক অবস্থায় আসীন থাকা সত্ত্বেও মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব হলো উপন্যাস, কবিতা, নাটক, ফিল্ম কিংবা প্রত্যক্ষ দর্শক-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রভৃতির মাধ্যমে শাসকশ্রেণীর উপর সর্বাঙ্গীন আক্রমণ করা।

সমাজতন্ত্রের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনে মতাদর্শগত বহির্গঠনের উপর আক্রমণের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শাসকশ্রেণীর মতাদর্শ কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া বুদ্ধিজীবী-দাসত্ব থেকে সর্বহারার মন যদি মুক্ত না থাকে, তাহলে তাঁরা বিপ্লবী কার্যকলাপের পূর্ণতা দিতে পারেন না। পার্টি তার বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে শাসকশ্রেণীর মতাদর্শের হতবুদ্ধিকারী প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন বলে সঠিকভাবেই আশা করা যায়।

পার্টির বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কে এই মূল সত্যগুলোই ভারতের বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হবে। অবশ্য, আমাদের পার্টির প্রতিটি সদস্যই তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট ইউনিটে কাজ করেন এবং যথাযোগ্য করণীয় কাজ চালিয়ে যান। এর মধ্যে আছে তাঁর নির্দিষ্ট ফ্রন্টের করণীয় কাজ।

ভারতের বাস্তব পরিস্থিতিটা কী? জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্যে আমরা সংগ্রাম করছি। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, একচেটিয়া-বিরোধী এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন বুর্জোয়া-ভূস্বামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত। এই শ্রেণীগুলোর বিরুদ্ধে কৃষি বিপ্লবের জন্যে, রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্যে আমরা সংগ্রাম করছি। আমরা সমাজতান্ত্রিক

শিবির ও আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করি। আমরা সাম্রাজ্যবাদ এবং আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি। সুতরাং আমাদের মিত্র ও শত্রুদের মধ্যে পরিষ্কার ভাগ করা আছে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব আমাদের সংগ্রামী শ্রেণীগুলোর, কৃষক সমাজের, দুর্দশাগ্রস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর, কর্মচারীদের-পেশাধারীদের সমস্যাগুলো, শত্রু শ্রেণীগুলোর মুখোস উন্মোচন—এইগুলো আমাদের লেখায় প্রাধান্য পাওয়া উচিত। এই সমস্যাগুলো ব্যক্তিবিশেষের জীবন কাহিনীর মধ্য দিয়ে, তাদের ভালোবাসা ও দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে কিংবা জনগণের প্রত্যক্ষ চলন-বলন-রীতির মধ্য দিয়ে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে চিত্রিত করা যায় কি-না, তা সম্পূর্ণরূপে শিল্পীর ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে যেতে কাউকেই কখনও অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

সুতরাং এখানে আসছে সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রেণী-সংগ্রামকে সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা সুনির্দিষ্ট প্রণালী। তদনুযায়ী যেহেতু এর বক্তব্য সমাজের এই বা সেই স্তর, এই বা সেই অংশের প্রতি, সুতরাং তার উপস্থাপন পদ্ধতি পৃথক হতে পারে। কিন্তু বক্তব্য থাকবে অবশ্যই পরিষ্কার। আর সেই বক্তব্য সর্বদাই 'সত্যমেব জয়তে'-র মধ্যে পরিসমাপ্ত করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু বক্তব্য অবশ্যই বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করবে—প্রতিফলিত করবে মারাত্মক অবিচার, পরাজয়, পশ্চাদপসরণ, জনগণের দুর্বলতা ও শক্তি এবং সর্বোপরি সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার ক্রমবর্ধমান সংগ্রাম। বিষয়বস্তু সংগ্রাম কিংবা জনসমষ্টি না-ও হতে পারে। সেটা হতে পারে সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি-বিশেষের অর্থনৈতিক ধ্বংসের, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রীতি ধ্বংসের একটা সঠিক কাহিনী: এমনও হতে পারে বিষয়বস্তু, যা বুর্জোয়া জগতের মঙ্গলবাদকে চূর্ণ করে মন্ত্র।

যে-লেখক বাস্তবতাকে সূক্ষ্মভাবে অনুশীলন করেন তিনি বিভিন্ন অংশকে, বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি-বিশেষকে চিত্রিত করেন সেই পদ্ধতিতে, যে-পদ্ধতিতে আমাদের পার্টি কর্মসূচী বর্ণনা করে—কয়েকজন থাকেন দৃঢ়, কয়েকজন থাকেন দোদুল্যমান, কয়েকজন থাকেন মূল্যভিত্তিক ইত্যাদি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মার্কসবাদীরা ও পার্টির বুদ্ধিজীবীরা জনগণের উপর প্রত্যক্ষ দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন এবং আমাদের দেশে তা যে বর্বর স্তরে পৌঁছে গেছে, তার মুখোশ খুলে ধরবেন।

সেই সঙ্গে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হলো, শাসক-শ্রেণীগুলির ধ্যান-ধারণার মুখোশ খুলে ধরা, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। শাসকশ্রেণীগুলির যে মতাদর্শ জনগণকে

কবলিত করে, তাঁদের চেতনাকে বিকৃত করে, তার মুখোশ খুলে ধরা এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

আমাদের সমাজের মতাদর্শগত বহির্গঠন প্রধানত অতীতের সামন্ততন্ত্রের মধ্যে বদ্ধমূল। ধর্মীয় গোঁড়ামি, সম্প্রদায়-দমন, অলৌকিকে বিশ্বাস, আধা-সামন্ততান্ত্রিক অসম অবস্থা মেনে নেওয়া—এসব গণতান্ত্রিক ও শ্রেণী-ঐক্যের প্রক্রিয়াকে বাধা দেয় এবং আমাদের জনগণের চেতনার উপর এসবের একটা শক্তিশালী প্রভাব আছে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মূল্যের পাতলা আবরণ যা তাদের উপর ছড়ানো হয়, তথাকথিত সাংবিধানিক গ্যারাণ্টি এবং আইনের চোখে সমতা ভিতরের ভয়ংকরতাকেই উন্মোচন করে মাত্র। ধর্মীয় বিভাজন, কুসংস্কার, সম্প্রদায় দমন, অস্পৃশ্যদের বিরুদ্ধে নৃশংসতা—এই সব বিষ দিয়ে বিশাল অংশের জনগণকে সূচীবিদ্ধ করা হয় এবং এমন অদ্ভুত দৃশ্যও দেখা যায় যে, কোনো একটা স্থানে বীরত্বপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ শ্রেণীসংগ্রামের পর সেখানে সাম্প্রদায়িক কিংবা সম্প্রদায়গত অত্যাচারের ভিত্তিতে ভ্রাতৃঘাতী কলহ হয়েছে।

এটা আকস্মিক নয়। পুঁজিবাদী রাস্তার আপোষকারী নীতিগুলি সব সময় সামন্ততান্ত্রিক মতাদর্শগুলির সঙ্গে আপোষ করে চলেছে, সেগুলিকে সংরক্ষণ করেছে, এবং, এমন কি সময় সময় সেগুলোকে সচেতনভাবে ব্যবহার করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মালয়ালম ভাষায় নেহরুর জীবনী থেকে মুসলীম লীগ সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা বাদ দেওয়া কিংবা সারা ভারতে গো-হত্যা কার্যত নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে কংগ্রেসের চুক্তি লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিক্রিয়াশীল পার্টিগুলো এবং শাসক পার্টি জনগণের অসন্তোষকে ভিন্নমুখী করার জন্যে এবং তাদের দ্বিধাবিভক্ত করার জন্যে এইসব পুরনো অত্যাচার উৎপীড়ন ব্যবহার করে। সেই সঙ্গে শাসক-শ্রেণীগুলো জনগণকে বোকা বানাবার জন্যে পুনরুজ্জীবনবাদের অস্ত্রটি সুচিন্তিতভাবে ব্যবহার করছে। বিনা সমালোচনায় অতীতকে পূজা করা, অতীত সমাজের অসাম্য ও নৃশংসতাকে ঢেকে রাখা, যে-সব প্রতিক্রিয়াশীল ও বিশ্বাসঘাতক বৃটিশের বুট লেহন করত তাদের সম্মানিত করা—এইসব কিছুই কাজে লাগানো হয়।

মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের প্রতিটি মাধ্যম, প্রতিটি গঠনাবয়ব ব্যবহার করে এই সমগ্র মতাদর্শগত বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। অর্থনৈতিক দুর্দশা, দারিদ্র্য, রাজনৈতিক অত্যাচার প্রভৃতির মুখোশ উন্মোচনই যথেষ্ট নয়। ব্যক্তি বিশেষের দুঃখ কষ্ট তুলে ধরা, তাঁদের সীমাবদ্ধ আনন্দ ও সুখের চিত্রাঙ্কন করাই যথেষ্ট নয়। ধর্মীয় গোঁড়ামির, জাতি-বর্ণ নির্যাতনের, ধর্মীয় তমসাচ্ছন্নতার,

কুসংস্কারের এবং পুনরুজ্জীবনবাদের এই বিষাক্ত মেঘকে সবেগে বিদীর্ণ করা অধিকতর অপরিহার্য। কারণ এই বিষাক্ত মেঘ শ্রমিক-কৃষকদের চেতনাকে শৈশবকাল থেকেই কলুষিত করে। শুধু শ্রমিক কৃষকরাই নন, শিক্ষিত মানুষ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, অধ্যাপক, আইনজীবী—এঁরা সকলেই এই জাল মতাদর্শের শিকার। এর মধ্য দিয়ে, বিশেষত পুনরুজ্জীবনবাদের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সংহতির সমস্ত ধ্যান-ধারণাকে খাটো করার জন্যে অন্ধ দেশহিতৈষিতা জাতীয়তাবাদী মনোভাব সৃষ্টি করা হয়।

এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে, শাসক শ্রেণীগুলোর বুজরুকি—ধর্ম-নিরপেক্ষতা, জাতি-সম্প্রদায়বিহীন সমাজ সম্পর্কে সন্তুষ্ট থাকা ঠিক নয়। ধর্মীয় পূজা অর্চনার স্বাধীনতার অধিকার, ধর্ম থেকে রাষ্ট্রকে পৃথকীকরণ সমর্থন করে, অন্যদিকে শাসক পার্টির ধর্মনিরপেক্ষতার দাবির মুখোশ খুলে ধরতে হবে। এগুলোর মুখোশ খুলে ধরতে গিয়ে, ধর্ম, জাতি, বর্ণ ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা অবশ্যই জনগণের মধ্যে প্রচার করবেন। ধর্ম হলো জনগণের আফিম, শোষণ ও বিভাজনের একটা হাতিয়ার—এই সত্যটা আধুনিক বিজ্ঞান থেকে নেওয়া দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণসহকারে প্রচার করতে হবে।

এই মতাদর্শগত বহির্গঠন শুধু অতীতের মধ্যেই গভীরভাবে বদ্ধমূল নয়। জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস তাকে পবিত্রময় করেছে এবং জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির অঙ্গ হিসেবে তাকে শক্তিশালী করেছে। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ হলেও কঠিন।

"ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করার করণীয় কাজ ঐতিহাসিকভাবে বিপ্লবী বুর্জোয়াদের করণীয় কাজ এবং পাশ্চাত্যে এই করণীয় কাজটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র তার বিপ্লবের যুগে কিংবা সামন্ততন্ত্র ও মধ্যযুগীয়তন্ত্রের উপর তার আক্রমণের যুগে বহুলাংশে সম্পন্ন করেছিল (বা মোকাবিলা করেছিল)। উভয়ত ফরাসী দেশে ও জার্মানীতে ধর্মের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া যুদ্ধের একটা ঐতিহ্য আছে এবং সেটা শুরু হয়েছিল সমাজতন্ত্রের বহু আগে। (দি এনসাইক্লোপেডিস্টস, ফয়েরবাখ)। রাশিয়াতে আমাদের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিস্থিতিবশত এই করণীয় কাজটিও প্রায় সামগ্রিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে এসে পড়ে।" [লেনিনের সংগৃহীত রচনাবলী, ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ৪১০]।

একই পরিস্থিতি ভারতে। ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের প্রতি একটা আপোষকামী নীতি অনুসরণ করে এবং কৃষি বিপ্লবের বিরোধিতা করে,

ধর্মসহ সামন্ততান্ত্রিক ও মধ্যযুগীয় মতাদর্শের বিরুদ্ধে একটা বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালানোর প্রয়োজন বোধ করে নি। পক্ষান্তরে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, তারা নিজেদের পুনরুজ্জীবনবাদের উপর ভিত্তি করেছিল এবং পুরনো ধর্মকে গৌরবময় করেছিল। গান্ধী – যাঁকে জাতির জনক বলে বর্ণনা করা হয় – ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু। একজন জাতীয় নেতাও গান্ধীর কর্মপ্রণালী, তাঁর রামধুন ও প্রার্থনাসভার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করেন নি; আর এইগুলো দিয়েই তিনি প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনে ধর্মের কাজকে শক্তিশালী করতে চেষ্টা করেছিলেন। ধর্মকে জাতীয়তাবাদ দিয়ে ঠেকা দেওয়া হলো। মুসলিম লীগের নেতারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় সংগ্রামে ভীত ছিলেন, কারণ তাঁরা জমিদারদের কাছে আরো দৃঢ়ভাবে বাঁধা ছিলেন, এবং তাঁরা অভিন্ন সংগ্রামকে বিভক্ত করে ভারত-বিভক্তিকরণ অর্জনের জন্যে মুসলিম জনগণকে ইসলামের নামে সমবেত হওয়ার আবেদন জানাতেন।

এসব করণীয় কাজগুলো করতে গিয়ে, মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের স্বভাবতই অমার্কসবাদী ও গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মৈত্রী ও বোঝাপড়া করতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি বর্তমান শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক ও বিরোধী সমস্ত শ্রেণী ও গোষ্ঠীর একটা ফ্রন্ট গঠন করতে চেষ্টা করছে। যে সব বাম ও গণতান্ত্রিক পার্টি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আছে এবং যারা প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি এবং সাম্প্রদায়িক ও জাতি-প্রতিক্রিয়ার প্রবক্তাদের সঙ্গে আপোষ করবে না, তাদের আমাদের পার্টি এখনই একত্রে সমাবেশ করছে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির লেখকদের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্যে এটা একটা ভিত্তি করে দেয়। কমিউনিস্টরা এককভাবে সাহিত্য ও বুদ্ধিজীবী ফ্রন্টে সংগ্রাম চালাতে পারে না। যে-সব পার্টি, শ্রেণী ও গোষ্ঠীকে আমাদের পার্টি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমাবেশ করছে, তাদের পরিষ্কারভাবে প্রতিনিধিত্ব করে এমন অ-কমিউনিস্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা বিরাট। শাসক শ্রেণীগুলো ও তাদের মতবাদের প্রবক্তাদের থেকে সামন্ততন্ত্র ও তমসাচ্ছন্নতার লজ্জিত রক্ষক ও আপোষকামীদের বিচ্ছিন্ন করার জন্যে এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর জন্যে সেই সব অ-কমিউনিস্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সাহিত্য ফ্রন্টে আমাদের সমাবেশ করতে হবে।

স্পষ্টত, তাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ করেন না। সাহিত্য, কলাবিদ্যা, মতবাদের শ্রেণী-উৎস সম্পর্কে আমরা যা বলি, তা তাঁরা গ্রহণ করেন না। তাঁদের অনেকে অতীত সম্পর্কে পুনরুজ্জীবন-ধারণাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন।

তবু, তাঁদের অনেকে তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে একটা না-একটা স্তরে বর্তমান

ব্যবস্থাকে, তাঁর মতবাদকে আক্রমণ করেন এবং বাস্তব দিক দিয়ে একটা প্রগতিশীল ভূমিকা নেন। একটা দৃঢ় শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় তাঁরা তাঁদের কাজে একটা চূড়ান্ত অবস্থা থেকে অন্য একটা চূড়ান্ত অবস্থার মধ্যে দোল খেতে সক্ষম।

এই ফ্রন্টে আমাদের অন্যতম করণীয় হলো, এই লোকেদের একটা দৃঢ় গণতান্ত্রিক ভূমিকা গ্রহণ করতে প্রণোদিত করা, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পক্ষে টেনে আনার চেষ্টা করা। এটা হচ্ছে, এখানে যুক্তফ্রন্ট লাইনের বাস্তব প্রয়োগ।

একথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, এসব লেখকদের অনেকে পেটি-বুর্জোয়া র‍্যাডিক্যালবাদের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাঁরা প্রায়ই একটা বা দুটো রচনার মধ্যে ফুরিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে একটা বিরাট অংশের আছে অভুক্তদের প্রতি একটা সমবেদনা, কিন্তু তাঁরা সেটাকে একটা সঠিক শ্রেণী-আকারে পোশাক-আচ্ছাদিত করতে অক্ষম। তাই তাঁরা শ্রেণী-শান্তির ওকালতি করতে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁদের লেখার আসল বিষয়বস্তুকে তাঁদের বক্তব্য থেকে আলাদা করতে হবে যাতে তাঁদের সম্পর্কে একটা সঠিক ও সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাব গড়ে ওঠে।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, ভূস্বামী-বিরোধী, একচেটিয়া ও বৃহৎ পুঁজির বিরোধী মানদণ্ড—এই সমস্ত মানদণ্ড একত্রে প্রয়োগ করে তাঁদের বিচার করা নিরর্থক হবে। তার অর্থ হবে এমন দাবি করা যে, তাঁরা আমাদের মতো অবশ্যই দৃঢ় হবেন।

একটা বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। সাহিত্য রচনায় যত র‍্যাডিক্যাল বলেই মনে হোক না কেন, এই সব লেখকদের প্রায় সকলেই বর্তমান সমাজের মতবাদগত বহিঃকাঠামো, ধর্ম, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতার নিপীড়নের মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রেও চূড়ান্তভাবে দুর্বল। তাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট যাঁরা, তাঁরা বুর্জোয়া বুজরুকির বাইরে যান না। সম্ভবত তাঁদের মধ্যে একজনও আমাদের মতো ধর্মের বিরুদ্ধে দ্বিধাহীন ভূমিকা গ্রহণ করবেন না কিংবা জাতিভেদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম শুরু করবেন না। তাঁদের অধিকাংশই ব্যক্তিগত জীবনে কোনো না কোনো ধর্মের অনুসরণকারী এবং জাতিভেদ সম্পূর্ণ বর্জন করবেন না। অবশ্য, মানবিক দিক থেকে তাঁরা সমতার পক্ষে দাঁড়ান, অর্থাৎ তাঁদের ভূমিকা হলো বুর্জোয়া আপোষকামীদের ভূমিকা।

মতবাদগত বিষ-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা তাঁদের গণতান্ত্রিক কর্তব্য—এই কথাটা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমাদের বিশেষ অধিকার হওয়া উচিত।

যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকতার প্রবক্তা—জনসংঘ—যারা উগ্রহিন্দু

জাতীয়তাবাদের কাছে আবেদন করে, তাদের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে সংগ্রাম চালাতে হবে। সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতার প্রবক্তাদের সম্পর্কেও একই কথা। তাদের ক্ষেত্রে একথা স্বীকার করতে হবে যে, সংখ্যালঘুদের অধিকারগুলো দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে এটা করা যেতে পারে।

এটা বোঝা উচিত যে, আমাদের দেশে সরাসরি পদদলিতদের হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসছে সাহিত্যের চমৎকার নমুনা (উদাহরণ—ডঃ আম্বেদকরের অনুসরণকারীদের রচনাসমূহ—মহারাষ্ট্রে রিপাবলিকান পার্টি) এবং এটাকে অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে।

সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো, দর্শনের ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কাজ। এই ক্ষেত্রে বর্তমান ব্যবস্থার পচা ভাববাদ এবং তার বিরক্তিকর চরম পর্যায় ধর্মের বিরুদ্ধে আমাদের দৃঢ়ভাবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কথা বলতে হবে। এই সম্পর্কে লেনিন কমিউনিস্টদের পরামর্শ দিয়েছেন, অন্যান্য বস্তুবাদী ও প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিত্রতা করতে।

পার্টির বহির্ভূত বস্তুবাদীদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টি বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো, উন্নত বস্তুবাদী ধারণাগুলো সম্পর্কে জনগণকে শিক্ষিত করার জন্যে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এবং এই উদ্দেশ্যে সহজপ্রাপ্য সমস্ত সাহিত্যকে কাজে লাগাবে। পরিপূর্ণ মার্কসবাদী সাহিত্যের উপাদানের জন্যে অপেক্ষা করা, অ-মার্কসবাদী বস্তুবাদী সাহিত্যকে কাজে লাগাতে অস্বীকার করা, যদিও সেগুলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেনি—লেনিন এসব দৃষ্টিভঙ্গি ভুল ও ক্ষতিকারক বলে মনে করতেন—"মার্কসবাদীদের পক্ষে এরূপ ভাবা সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক দুঃখজনক ভুল হবে যে, কোটি কোটি মানুষ বিশেষত কৃষক ও কারিগর যাঁরা গোটা আধুনিক সমাজ দ্বারা অন্ধকার, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন, তাঁরা বিশুদ্ধ মার্কসবাদী শিক্ষার সরল রেখা ধরে এই অন্ধকার থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারবেন। এই জনসমষ্টিকে সর্বাধিক বৈচিত্র্যময় নিরীশ্বরবাদী প্রচার সামগ্রী সরবরাহ করা উচিত, জীবনের সর্বাধিক বহুরূপী ক্ষেত্র থেকে নেওয়া ঘটনাবলীর সঙ্গে তাদের পরিচিত করানো উচিত, প্রতিটি সম্ভাব্য পথে তাঁদের নিকটবর্তী হওয়া উচিত, যাতে তাদের আগ্রহ হয়, ধর্মীয় অজ্ঞানাবস্থা থেকে জাগানো যায়, যাতে সর্বাধিক বৈচিত্র্যময় দিক থেকে এবং সর্বাধিক বৈচিত্র্যময় কৌশল ইত্যাদিতে তাদের নাড়া দেওয়া যায়।" —(জঙ্গী বস্তুবাদের তাৎপর্য পৃঃ ২৩০)।

বর্তমান ভারতে জনগণের ক্রমবর্ধমান অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক লেখক

কলুষিত হয়ে যাচ্ছে এবং সর্বোচ্চ নিলাম-ক্রেতার কাছে নিজের বিবেক ও কলম বিক্রি করছে। যাদের কোনো প্রতিষ্ঠান কিনে নিয়েছে তারা ছাড়াও, এমন কিছু ব্যক্তি আছে যাদের কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্র বিভিন্ন উপায়ে প্রচুর ঘুষ দেয়। বিশেষত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার সেবায় নিযুক্ত করে একদল লেখককে পোষণ করছে। এই দুর্নীতি ও তা থেকে উদ্ভূত কলুষকারী লেখার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লড়াই করতে হবে।

বুদ্ধিজীবীদের করণীয় কাজ হলো, শাসকশ্রেণীগুলোর মতবাদগত দাসত্ব থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্যে সর্বহারাদের সাহায্য করা। এই করণীয় কাজটি নাটক, কবিতা, ফিল্ম, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রত্যেকটির মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। তাঁদের করণীয় কাজ হলো, শাসকশ্রেণীগুলোর সমাজ ও মতবাদের বিরুদ্ধে প্রকৃত যুদ্ধ চালানো। সফল হতে হলে, তাঁদের অবশ্যই প্রথমেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অধিকারী হতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দৃঢ়ভাবে বোঝা ব্যতিরেকে তাঁরা তাঁদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে, যথাযথভাবে মিত্র ও শত্রু বিচার করতে এবং তাঁদের ফ্রন্টের কাজকর্মের ফলাফল মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন না। করণীয় কাজগুলো সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করতে হলে, তাঁদের একই সঙ্গে প্রকাশরীতি, গঠনাবয়ব ও মাধ্যমের কৌশল অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে। অন্যথায় রচনার শৈল্পিক ও আবেগময় উপস্থাপনা, রচনার বিষয়বস্তু বিপ্লবাত্মক হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা জনগণের কাছে বার্তা বহন করে নিয়ে যেতে অক্ষম হবেন। রাজনৈতিক পুস্তক প্রণয়ন—নাটক, কবিতা বা ফিল্মের প্রয়োজনের স্থান পূরণ করতে পারে না। সেজন্যেই আমাদের বুদ্ধিজীবীরা যদি শৈল্পিক গঠনাবয়ব, রুচি-বিজ্ঞান, সৌন্দর্যের নিয়ম-গুলো আয়ত্ত করতে না পারেন, তাহলে তাঁদের সামনে তুলে ধরা করণীয় কাজগুলোর প্রতি তাঁরা পূর্ণ সুবিচার করতে সক্ষম হবেন না।

সংস্কৃতি কর্মী ও সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের রাজনৈতিক কর্তব্য

যেকোনো বড় ধরনের, বিশেষত মৌলিক চরিত্রের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনের পেছনে সবসময়েই সাহিত্য-সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। ইউরোপে যদি রেনেসাঁ বা সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন না ঘটতো, তা'হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদের আবির্ভাব এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রসার সম্ভবত ঘটতো না। ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লব কখনই সফল হতো না, যদি না ভলতেয়ার-রুশো প্রমুখ দর্শন ও সাহিত্যের জগতে তার পূর্বপ্রস্তুতি সেরে রাখতেন। ম্যাক্সিম গোর্কি ছাড়া ১৯১৭'র রুশ বিপ্লব বা লু-সুন ছাড়া ১৯৪৯-এর চীন বিপ্লবের কথা আমরা আজ কল্পনাও করতে পারি না। এমন কি আমাদের দেশের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে শেষ পর্যন্ত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আপোষহীন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সশস্ত্র মুক্তি যুদ্ধে পরিণত হয়েছিল, তার আয়োজন তথা সমিধ্ সংগ্রহ কিন্তু চলেছে গোটা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-দীনবন্ধু-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথেরা মানুষের চিত্তভূমিতে দেশপ্রেমের যে বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে, তারই পূর্ণ পরিণত রূপ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই ধরণের উদাহরণের তালিকা আর বাড়িয়ে লাভ নেই, কেননা পৃথিবীর প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রেই এধরনের নজির ভূরি-ভূরি পাওয়া যাবে শুধু নয়, বরং তার বিপরীত ব্যতিক্রমটুকুও খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও।

যদিও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে শিল্প সংস্কৃতিকে উপরি-কাঠামো বা সুপার স্ট্রাকচার হিসেবেই দেখা হয়ে থাকে, তবুও সমাজের কাঠামো পরিবর্তনের সংগ্রামে এই উপরি-কাঠামোর ভূমিকা কিন্তু মোটেই নগণ্য নয়। বরং কখনো কখনো, ইতিহাসের কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে সাংস্কৃতিক আন্দোলন অগ্রণী ভূমিকাও পালন করে থাকে। অবশ্য সাধারণভাবে আমরা সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কাজকে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিপূরক কাজ হিসাবেই দেখতে অভ্যস্ত। অর্থাৎ সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়ে থাকেন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মীরা, সাংস্কৃতিক কর্মীদের কাজ সেখানে অনেকটাই পরোক্ষ সহায়তাকারীর তথা পরিপূরক ভূমিকা। সাধারণভাবে একথা অবশ্য সত্য, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বিপ্লবী সংগ্রামে সাংস্কৃতিক কর্মীরা নেহাতই পেছনের সারির সৈনিক। বরং কখনও কখনও সাংস্কৃতিক আন্দোলন বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগ্রামের জননী এবং ধাত্রীর ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হয়। আমরা অন্তত একটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নাম করতে পারি, সাংস্কৃতিক আন্দোলন যে পার্টির জন্ম দিয়েছে— দেশটির নাম চীন। ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে-র সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরাই ১৯২১ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সাধারণ সম্পাদক চেন-তু-শিউ শুধু রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না, ছিলেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতাও। তিনিই চীনে রবীন্দ্র রচনার প্রথম অনুবাদক।

আসলে কোনো রাজনৈতিক সংগ্রাম বিকাশের পূর্বে শিল্পসাহিত্য তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে থাকে। শিল্প-সাহিত্যের কাজ মানুষের মনকে নিয়ে। একটা রাজনৈতিক বক্তৃতা মানুষের চেতনার উপরিতলে বড় জোর তাৎক্ষণিক আবেগের সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু একটা শিল্পকর্মের প্রভাব হয় আরো সুদূরপ্রসারী, অবচেতনার তলদেশের আলো আঁধারে পর্যন্ত সে ঢুকে পড়তে পারে অনায়াসে। তাই শিল্প সাহিত্যের প্রভাব স্থায়িত্বের মাপকাঠিতে অনেক গুণ বেশী। মানুষের হৃদয়ে ইতিবাচক সংগ্রামী চেতনার বীজ ছড়িয়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে থাকে শিল্পসাহিত্য। এখানে তার ভূমিকা পথিকৃতের ভূমিকা, অগ্রণীর ভূমিকা, নিছক পরিপূরক ভূমিকা নয়। আর যখন রাজনৈতিক সংগ্রাম বিকশিত হয়ে উঠেছে, তখন শিল্পসাহিত্যের কাজ সেই সংগ্রামের মর্মবাণীকে দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে দেওয়া, সংগ্রামকে উচ্চতর স্তরে পৌঁছুতে সাহায্য করা। এই কাজ অবশ্য পরিপূরক সহায়তাকারীর কাজ। এমন কি যখন বিপ্লবী সংগ্রাম তুঙ্গে ওঠে, সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ড প্রবল হয়ে ওঠে, সশস্ত্র শ্রেণীযুদ্ধ চলে, বিপ্লবী অভ্যুত্থান

ঘটে, তখনও শিল্পসাহিত্যের ভূমিকা বিন্দুমাত্র কমে না। বরং উত্তপ্ত রণক্ষেত্রের শ্বাসরুদ্ধ বারুদের গন্ধেও শিল্পসাহিত্যের দীপশিখা থাকে অনির্বাণ। নেতাজী সুভাষের আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন রণাঙ্গনে শত্রুর মুখোমুখি চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত, তখনও আই, এন, এ'র কালচারাল স্কোয়াড তার কাজ করে গেছে দৃপ্ত পরাক্রমে, অসীম দুঃসাহসে। চীনে বা ভিয়েৎনামে যখন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী যুদ্ধ চলেছে, তখনও গণ-ফৌজের সাংস্কৃতিক শাখা জনগণের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা ছড়িয়ে দিয়েছে গান ও নাটকের মাধ্যমে। এথেকেই বোঝা যায়—রাজনীতিক সংগ্রামের প্রাথমিক পর্বেই হোক বা চূড়ান্ত পর্বেই হোক, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের গুরুত্ব কখনও কমে না। আর সেই জন্যেই তো বলা হয়েছে—বিপ্লবী সংস্কৃতি ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব।

যখন শ্বেতসন্ত্রাস গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ বন্ধ ক'রে দেয়, শাসক শ্রেণী-গুলির বল্গাহীন অত্যাচার প্রকাশ্য রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে প্রায় নিষিদ্ধ ক'রে দেয়, তখন শিল্প-সাহিত্যের তথা সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের গুরুত্ব অনেক বেশী বেড়ে যায়। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মীরা তখন প্রকাশ্যে যে প্রচার-আন্দোলনের কাজ করতে পারেন না, সেই কাজ তখন সাংস্কৃতিক কর্মীরা চালিয়ে যেতে পারেন। কেননা, শিল্প-সাহিত্যের একটি মৌলিক সুবিধার দিক আছে, নিছক রাজনৈতিক লেখা বা বক্তৃতার তা নেই। রাজনৈতিক বক্তৃতা সাধারণত সরাসরি ও প্রত্যক্ষ চরিত্রের হয়, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলার সুযোগ এখানে নিতান্ত কম। কিন্তু শিল্প রচনা করে মোহিনী আড়াল, শিল্পের চোখ-ধাঁধানো চাকচিক্য জন্ম দিতে পারে তির্যক বাক্‌ভঙ্গীর, ফলে শিল্প-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অনেক বৈপ্লবিক বক্তব্যই নিতান্ত দুঃসময়েও বলা যায় প্রকাশ্যে শাসক শ্রেণীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে। ১৯২৭ সাল থেকে চীনে যখন চিয়াং কাইশেকের শ্বেত সন্ত্রাস শুরু হলো, যখন বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের ছিন্ন মুণ্ড প্রকাশ্য রাজপথে গড়াগড়ি যেতো, প্রকাশ্য গণতন্ত্রিক আন্দোলনের যখন বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই, তখনও চীনের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী লেখক লু-সুন শ্বেত এলাকাতে বাস করেও অসংখ্য বিপ্লবী রচনার জন্ম দিয়েছেন। এটা তিনি পেরেছিলেন শিল্পকলার নিজস্ব বিশেষত্বের জন্যই। ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল হিটলার শাসিত জার্মানী ও মুসোলিনী শাসিত ইতালীতেও। সেখানেও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছিল স্তব্ধ, কিন্তু মানুষের প্রতিবাদ সেখানে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল শিল্প সাহিত্যের মাধ্যমে। আমাদের দেশেও সাম্প্রতিককালে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। জরুরী অবস্থার সময় সারা দেশ যখন সেন্সারশিপের শৃঙ্খলে বাঁধা, রাজনৈতিক কর্মীরা হয় নিহত, নয়তো কারান্তরালে,

প্রকাশ্য আন্দোলন নিষিদ্ধ, তখন আমরা বামপন্থী দলগুলি যে কথা প্রকাশ্যে বলতে পারতাম না, সেই কথাগুলিই দেখেছি প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকেরা তাঁদের সাহিত্য-শিল্পের মাধ্যমে বলে বেড়াচ্ছেন। কত ছোটো ছোটো নাটকের দল, গানের স্কোয়াড, ছোটো ছোটো সাহিত্য পত্রিকা (লিটল ম্যাগাজিন), ইন্দিরাশাহীর সেন্সারশিপকে কৌশলে এড়িয়ে প্রতিবাদী বক্তব্য প্রচার করেছে। আমাদের না বলা কথাগুলি সেদিন প্রয়াত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়, মহাশ্বেতা দেবীর গল্প-উপন্যাসে, উৎপল দত্তের এবং আমাদের আমলের নাটকে বারবার প্রকাশ পেয়েছে। আর এইভাবেই সেদিন সাংস্কৃতিক কর্মীরা রাজনৈতিক প্রচারকের ভূমিকাতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রাজনীতি ও সংস্কৃতির বেড়া সেদিন ভেঙে গিয়েছিল।

বস্তুতঃ এটাই স্বাভাবিক। যদিও বুর্জোয়া সাহিত্যতত্ত্বের প্রচারকেরা শিল্প-সাহিত্যের জগতে রাজনীতির প্রবেশ-নিষেধের কথা বলে থাকেন এবং রাজনীতি-বর্জিত এক ধরণের তথাকথিত নিরপেক্ষ সাহিত্যশিল্পের গুণগত উৎকর্ষের ওকালতি করে থাকেন, তথাপি, একথা সত্য যে রাজনীতি এবং সংস্কৃতির মধ্যে কোনো "চীনের প্রাচীর" নেই। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সমস্ত সাহিত্য এবং সব শিল্পকলাই (সে তারা যতই নিরপেক্ষতার ধ্বজা ওড়াক না কেন!) কোনো না কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী। এখানে কেউই নিরপেক্ষ নয়। যে সমাজে মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থান্বেষীর দল প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের বুকের রুধির শোষণ ক'রে মুনাফার পাহাড় বানাচ্ছে, মজুরী-দাসত্বের শৃঙ্খলে যেখানে হাজার হাজার শ্রমিক আবদ্ধ এবং দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতি-দের বল্গাহীন লোভের যূপকাষ্ঠে প্রতি মুহূর্তে আত্মবলি দিচ্ছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন কৃষক জোতদার মহাজনের অত্যাচারে প্রতিদিন জমি থেকে উৎখাত হচ্ছে সেখানে পরম নিরপেক্ষতার ধ্বজা তুলে যারা শিল্প-সাহিত্যকে রাজনীতিবর্জিত রাখতে চায়, নিঃসন্দেহে তারা শাসক ও শোষকশ্রেণীর সেবাদাস। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রতি মুহূর্তে সচেতনভাবেই হোক, অথবা অচেতনভাবেই হোক, শ্রেণী-সংগ্রাম চলছে। এই শ্রেণীদ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের আবর্তে প্রতিটি মানুষকেই অবস্থান বেছে নিতে হচ্ছে, সে কি শোষক শ্রেণীগুলির পক্ষে, নাকি নির্যাতিত জনগণের পক্ষে? শিল্পী সাহিত্যিকরাও তো মানুষ, সামাজিক মানুষ, তাঁরা তো সমাজ-বিচ্যুত গুহানিবাসী বায়ুভূক কোনো অলীক প্রাণী নন। তাঁদেরও তো গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে অনেক সময়ে কলে-কারখানায় বা অফিস-কাছারীতে চাকরী করতে হয়, বাজার হাট করতে হয়, স্বল্প ও অনন্ত অভাবের দ্বন্দ্বে সবসময়েই

বিচলিত হতে হয়; তাদের অফিস-কাছারীতে যখন মজুরীবৃদ্ধির জন্যে ট্রেড-ইউনিয়ন লড়াই করে, তখনও তো তাঁকে পক্ষ বেছে নিতে হয়—মালিকের দালালী করবেন, না শ্রমিকের পাশে দাঁড়াবেন—এই প্রশ্নে দৃঢ় অবস্থান নিতে হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে তিনি কি ক্ষুব্ধ হয়ে কখনও ব্যবসায়ীদের, কখনও বা সরকারকেই গাল পাড়েন না? তবে? বাস্তবজীবনে যিনি সর্বদা কোনো না কোনো পক্ষে যাচ্ছেন তিনি সাহিত্যের জগতে নিরপেক্ষ থাকবেন কি করে? না, কারুর পক্ষেই তা' সম্ভব নয়। যাঁরা রাজনীতিবর্জিত নিরপেক্ষ শিল্প-সাহিত্যের পক্ষে কথা বলেন, আসলে তাঁরা জনগণের পক্ষে কথা বলতে চান না। আর শ্রেণীবিভক্ত সমাজে জনগণের পক্ষে কথা না বলার অর্থই হোলো—কার্যতঃ জনগণের শত্রুদের পক্ষে কথা বলা।

অবশ্য তার মানে এই নয় যে, কোনো শিল্পী-সাহিত্যিকই বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে বা মানবিক প্রেম সম্পর্কে কোনো লেখা লিখতে পারবেন না। বা তাঁদের সব লেখাতেই জোর ক'রে শ্রেণীসংগ্রাম আর শ্রমিক দরদ দেখাতেই হবে। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের চিরন্তন সম্পর্ক বা মানবিক মূল্যবোধ ও মানবিক সম্পর্কগুলি অবশ্যই শিল্পসাহিত্যের বিষয় হতে পারে এবং হওয়া উচিতও। কিন্তু প্রশ্ন হলো— কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এগুলি লেখা হচ্ছে? আসলে রাজনীতি মানে নিছক মিছিল-মিটিং-পোষ্টার ও পার্টিবাজী নয়। এগুলি রাজনীতির বাহ্য উপকরণ মাত্র। গভীর অর্থে রাজনীতি হলো—একটি বিশ্বদৃষ্টি, একটি দর্শন। বুর্জোয়া রাজনীতি মানে বুর্জোয়া দর্শনের ঘনীভূত রূপ, অন্য পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতির অর্থ শ্রমিক শ্রেণীর দর্শন। তাই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নটি সবচেয়ে জরুরী। আমরা কখনই মনে করি না প্রকৃতি বা নারী পুরুষের সম্পর্কের মতো আপাত অরাজনৈতিক কোনো বিষয়ের ওপর লেখা হলেই তা প্রতিক্রিয়াশীল হবে। আসলে দেখতে হবে—লেখক কোন দৃষ্টভঙ্গীতে এই বিষয়গুলিকে দেখছেন। তিনি কি এই লেখায় জীবন সম্পর্কে হতাশা, তিক্ততা ও বিষাদ ছড়াচ্ছেন? নাকি তিনি এই জাতীয় লেখাতেও প্রচণ্ড আশাবাদ এবং সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করার অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছেন? যারা মানুষকে হতাশ করে, তারা মানুষের শত্রু, শাসক-শোষকদের স্বার্থ সিদ্ধিকারী, আর যাঁরা তাঁদের সব লেখাতেই দৃপ্ত আশাবাদ ও সভ্যতার উজ্জ্বল ভবিষ্যতে আস্থা স্থাপন করেন, তাঁরা তাঁদের সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত গণসংগ্রামের সহযাত্রী। এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত সৃষ্টি—তাঁর প্রেম ও প্রকৃতিবিষয়ক অসংখ্য লেখাগুলি সহ—জনগণেরই সম্পদ, কেননা মনুষত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে

কখনই চরম ব'লে জানেন নি তিনি, সব লেখাতেই আছে মানবতার জয়গান। তিনি তাই আজও প্রতি মুহূর্তেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন। একদা অবশ্য বামপন্থীদের মধ্যে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে জনগণের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, এখনও হয়তো কেউ কেউ করে থাকেন। কিন্তু এগুলি হচ্ছে রাজনীতি সম্পর্কে তাঁদের যান্ত্রিক, ফর্মুলানির্ভর ও একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর ফল। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ কিন্তু অন্য কথাই শেখায়। তাই আপাত-অরাজনৈতিক বিষয়ে যাঁরা লিখেছেন, এক কথায় তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল ব'লে নাকচ করা অর্থহীন। কেননা আপাত-অরাজনৈতিক বিষয়গুলিও শেষ বিচারে রাজনৈতিক। যেহেতু কোনো না কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ, কোনো না কোনো বিশ্বদৃষ্টি এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আমাদের বিচার্য বিষয়—এই দৃষ্টিভঙ্গীটি কার দৃষ্টিভঙ্গী। তার দ্বারাই নির্ণীত হবে এগুলির চরিত্র।

তাই 'সংস্কৃতি কর্মী ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের রাজনৈতিক কর্তব্য' কথাটি শুনে মোটেই আঁতকে ওঠার কিছু নেই। বুর্জোয়া শিল্পতাত্ত্বিকেরা অবশ্য সারস্বত সাধনার কমলবনে রাজনীতির মত্তহস্তীর অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ ব'লে ফতোয়া দিয়ে থাকেন, কিন্তু আমরা জানি—এটিও রাজনৈতিক মতলবেই করা হয়। আসলে সব রকমের রাজনীতিকে তাঁরা নিষিদ্ধ করার নামে বামপন্থী রাজনীতিকেই আক্রমণ করে থাকেন। অবশ্য এজাতীয় আক্রমণে আজকাল আর আমরা বিচলিত হই না। কেননা, ওদের চরিত্র জনগণ ধরে ফেলেছেন, 'শিল্পের জন্যে শিল্প'তত্ত্ব এত বাসী হয়ে গেছে যে, বুর্জোয়া নন্দনতাত্ত্বিকেরাও তা উচ্চারণ করতে লজ্জা পান। বস্তুত সংস্কৃতি কর্মী ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পর্কিত ধারণাগুলি আজ স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠেছে, জনগণও রাজনৈতিক শিল্পকলাকে সাদরে গ্রহণ করছেন, কেননা—এই জাতীয় শিল্প-সাহিত্য তাঁদের চলমান জীবন সংগ্রামের সঙ্গেই যুক্ত।

কিন্তু এই ক্ষেত্রেও একটি সতর্কবাণী উচ্চারণের প্রয়োজন আছে। আগেই বলেছি—আমাদের বামপন্থীদের মধ্যেই বহু বিষয়ে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করে থাকে। শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ব্যাধিটি আরো প্রবল। সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি এবং মতান্ধতা আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে গেছে। অথচ আমরা ভুলে যাই—মতান্ধতা বা গোঁড়ামি কখনো কখনো সাময়িক সাফল্যলাভ করলেও শেষ পর্যন্ত সভ্যতার ইতিহাসে তারা ঠাঁই পায় না, সভ্যতার ইতিহাস শেষ পর্যন্ত মুক্ত-বুদ্ধির বিজয়ের ইতিহাস। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনও তার সাক্ষী। কিন্তু এই গোঁড়ামীমুক্ত মনের আজ বড়ই অভাব। তাই দলীয়

সাহিত্য ও দলীয় সংস্কৃতিকেই গণসাহিত্য ও গণসংস্কৃতি হিসেবে চালাতে চান আমাদেরই কেউ কেউ। সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে তাঁরা যান্ত্রিকভাবেই দলীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে চান। তাঁরা সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলিকে সম্পূর্ণভাবে দলীয় সংগঠনে পরিণত করেন। তাঁদের মতে সংস্কৃতি কর্মীদের দলীয় কর্মী হতেই হবে এবং যে শিল্পী বা সাহিত্যিক দলীয় কর্মী নন, তাঁরা সকলেই প্রতিক্রিয়াশীল এবং শত্রু শিবিরের লোক। অবশ্যই এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী শুধু ভ্রান্তই নয়, বিপজ্জনকও বটে। এই জাতীয় চিন্তা গোটা সাংস্কৃতিক আন্দোলনকেই বদ্ধ জলায় পরিণত করে এবং মূলেই কুঠারাঘাত করে। হ্যাঁ, সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের দলীয়কর্মী হতেই পারেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সবাইকেই তাই হতে হবে এবং না হ'লেই তাঁরা আমাদের শত্রু। বস্তুতঃ ইতিহাস এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অসারতাই প্রমাণ করে। রুশ বিপ্লবের সাংস্কৃতিক সেনানায়ক ম্যাক্সিম গোর্কি বিপ্লবের সময়েও বলশেভিক পার্টির লোক ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন লেনিনের তীব্র সমালোচক। বিপ্লবের পর তিনি অভিজাত শ্রেণীর লোকজনদের মতো সাময়িকভাবে দেশ ছেড়েও চলে যান। কিন্তু লেনিন বা বলশেভিক পার্টি তাঁকে ভুল বোঝেন নি, "মাদার" উপন্যাসের স্রষ্টাকে তাঁরা যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশে ফিরিয়ে এনেছিলেন। লু-সুনও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাংগঠনিক যোগসূত্রে কোনোদিন আবদ্ধ ছিলেন না, তবু চীনের নতুন সংস্কৃতির জনক হিসেবে চীনা কমিউনিস্টরা তাঁকেই মেনে নিয়েছে। এই জাতীয় উদারতা অবশ্য আমাদের বামপন্থী আন্দোলনে আমরা সর্বদা দেখাতে পারিনা, দলীয় ও উপদলীয় সংকীর্ণতায় আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন থাকে।

আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও অবশ্য মাঝে মাঝে এই জাতীয় সংকীর্ণতা দেখা দিয়েছে। রুশ বিপ্লবের পর তথাকথিত প্রলেটকাল্ট আন্দোলনে এবং সাম্প্রতিককালে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কোনো কোনো সময়ে উগ্রসংকীর্ণতাবাদ শিল্প-সাহিত্যের মূল ভিত্তিকেই আক্রমণ করেছে। সুখের বিষয়, পরবর্তীকালে এই ভুলগুলি জনগণ কর্তৃক ধিকৃত ও বর্জিত হয়েছে। যান্ত্রিক দলীয় নিয়ন্ত্রণ সবসময়েই শিল্পী-সাহিত্যিকদের সৃজন-শীলতাকে নষ্ট করে। আমরা অবশ্যই বুর্জোয়া নন্দনতাত্ত্বিকদের মতো শিল্পীর চরম স্বাধীনতা তথা যথেচ্ছাচারের পক্ষে নই। কিন্তু আমরা এটাও মনে করিনা যে, দলীয় আনুগত্যের শৃঙ্খলে না বাঁধলে প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্য হয়না। আমরা একটা কথা ভুলে যাই—রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক নেতা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু

শিল্পী-সাহিত্যিক তৈরী হন মানবচেতনার গভীর গোপন জটিল এবং এখনো অনেকাংশে অজ্ঞাত একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কোনো রাজনৈতিক দলই রবীন্দ্রনাথের জন্ম দেয়নি। গোর্কিকেও বলশেভিক পার্টি তৈরী করেনি, লু-সুনও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির উৎপাদিত পণ্য নন, বের্টোল্ট ব্রেখ্‌টও জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি'র ফসল নন, পিকাসোর অনন্যসাধারণ সৃজনীশক্তিও ফ্রান্সের কমিউনিস্টদের কীর্তি নয়। অথচ এঁরা সবাই প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্যের জগতে এসেছেন নিজেদের বিবেকবুদ্ধির তাড়নায়। এঁদের বাদ দিয়ে কি কখনো গণসাংস্কৃতিক আন্দোলন পৃথিবীব্যাপী প্রভাব বিস্তার করতে পারতো কেবলমাত্র পার্টির হুকুমবরদার ক্রীতদাসদের নিয়ে? স্তালিন আমলে পার্টির হুকুমে 'বহু সাহিত্য সৃষ্টি' হয়েছে, তার মধ্যে কি একটাও কালের বিচারে টিকে আছে? শলোকভের ধীরে বহে ডনের মতো কালজয়ী রচনা কোনো হুকুমের ফল নয়, তা স্রষ্টার নিজস্ব নৈপুণ্যের ফসল, অবশ্য এই নৈপুণ্যের শিকড় সমকালীন বাস্তবতার গভীরেই লুকিয়ে ছিল।

তাই আমরা মনে করি—সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের রাজনৈতিক কর্তব্য মানে নিছক দলীয় কর্তব্য নয় কিংবা দলীয় অনুশাসনের নিগড়ে তাকে বাঁধাও যায় না। শিল্পী সাহিত্যিকেরা স্বভাবতঃই সংবেদনশীল চরিত্রের মানুষ। সংবেদনশীলতা ছাড়া শিল্প-সাহিত্যের জন্মই সম্ভব নয়। তাই সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট সবসময়েই উদারতার পক্ষপাতী। আমরা কখনই চাই না সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট দলীয় মঞ্চে পরিণত হোক। আমাদের প্রিয়তম নেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্রও আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন। সকলেই জানেন, সুভাষচন্দ্র নিছক রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন শিল্প-সাহিত্যের যথার্থ রসিক মানুষও। তাঁর সমকালের প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠিত শিল্পী-সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর ছিল হৃদয়ের যোগ। রবীন্দ্রনাথের তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহভাজন। নজরুল ইসলাম ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতার সীমা ছিল না। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্য-নৈপুণ্যের তিনি ছিলেন ভীষণ অনুরাগী। তাঁকে ঘিরে সেকালের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের ভিড় লেগেই থাকতো। অথচ তিনি এঁদের কাউকেই তাঁর দলভুক্ত বা গোষ্ঠীভুক্ত করানোর জন্যে চেষ্টা করেন নি। এমন কি তিনি যখন তাঁর দলীয় মুখপত্র "ফরওয়ার্ড ব্লক" প্রকাশ করলেন, তখনও তিনি এই পত্রিকায় গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু, সুধী প্রধান প্রমুখের মতো ভিন্ন মতাবলম্বী তরুণ বুদ্ধিজীবীদের সাদরে ঠাঁই দিয়েছেন। এই উদারতা তাঁর ছিল বলেই তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। জোর ক'রে তিনি কাউকে

দলে টানেননি ব'লেই সুভাষ-অনুরাগীদের শিবিরে শেষ পর্যন্ত অনেকই চলে আসেন। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী-সুভাষ বিতর্কে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন ও তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা "তাসের দেশ" সুভাষচন্দ্রকেই উৎসর্গ করেন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সেই ঐতিহাসিক সমাবেশে নজরুল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গান গাইতে আসেন। যে শিশির ভাদুড়ী জীবনে প্রত্যক্ষ রাজনীতি করেন নি, সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের পর তাঁর চরিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টকে ফরওয়ার্ড ব্লক কালা দিবস হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। সম্ভবত সেই ডাকে সাড়া দিয়েই শিশির ভাদুড়ী যতদিন তাঁর হাতে শ্রীরঙ্গম ছিল, ততদিন ঐ পনের আগস্টে নাটকের আগে বক্তৃতা দিতেন—এই স্বাধীনতা ভুয়া স্বাধীনতা, কেননা এই স্বাধীনতা সুভাষচন্দ্র আনেননি, সুভাষচন্দ্র থাকলে দেশ ভাগ হতো না, ইত্যাদি। অর্থাৎ এখানেই বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের সার্থকতা। যান্ত্রিক দলীয় অনুশাসনের নিগড়ে সাংস্কৃতিক কর্মীদের না বেঁধে, তাঁদের চেতনার অভ্যন্তরে মতাদর্শগত স্থায়ী প্রভাব ফেলা। উদারতাই একাজ করতে পারে, সংকীর্ণতা নয়। শুধু রাজনৈতিক নেতা হিসেবেই আমরা নেতাজীর কাছ থেকে শিক্ষা নেবো না, সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীটিকেও আমাদের বুঝতে হবে। আর সেই জন্যেই আমরা সাংস্কৃতিক ফ্রন্টকে দলীয় মঞ্চ বানাতে চাই না, বরং আমরা চাই দলমতনির্বিশেষে প্রতিটি প্রগতিশীল চেতনা-সম্পন্ন শিল্পী-সাহিত্যিকের ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ হিসেবে গড়ে উঠুক আমাদের সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট। কে আমাদের দলের লোক, কে আমাদের নয়, এবিচার আমরা করবো না। বরং আমরা চাই, সংগঠন তার নিজস্ব স্বাধীন সত্তা বজায় রেখেই বামপন্থী আন্দোলনের বা আমাদের দলের সহযাত্রী হোক। সহযাত্রী শব্দটিই আমি ব্যবহার করছি, কর্মী শব্দটি নয়।

তাই আবারও বলছি—সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের রাজনৈতিক কর্তব্য বলতে আমি কখনই নিছক দলীয় কর্তব্যের কথা বলছি না, বরং আমি বলতে চাই শ্রেণীগত কর্তব্যের কথা। যে সমস্ত সাংস্কৃতিক কর্মী, আমাদের দলের সভ্য বা সমর্থক, তাঁরা আমাদের দলীয় রাজনীতিকেই শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচার করবেন—এটাই স্বাভাবিক, তাঁরা তা করুন। কিন্তু আমরা কখনই আমাদের দলীয় রাজনীতির প্রচারকেই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের বা সমগ্র সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্তব্য ব'লে মনে করি না।

আমরা মনে করি, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের তথা আন্দোলনের রাজনৈতিক কর্তব্য আরো ব্যাপক। বামপন্থী আন্দোলন শোষণভিত্তিক এই সমাজব্যবস্থার আমূল

পরিবর্তন চায়। আমরা এও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীদের রাজনৈতিক কর্তব্য মূলতঃ একটিই, ভবিষ্যৎ বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। জনমানসে শিল্পসাহিত্যের মাধ্যমে বিপ্লবী উদ্দীপনা ছড়িয়ে দেওয়া এবং বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করাই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সাধারণ কর্তব্য। এর পাশাপাশি ভবিষ্যতের চূড়ান্ত লড়াই গড়ে ওঠার আগে যে-সমস্ত গণসংগ্রামগুলি বিকশিত হচ্ছে, শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক সমাজের যে-সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে, তার সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করাও সাংস্কৃতিক কর্মীদের অন্যতম কর্তব্য। কারখানার গেটে, শ্রমিক বস্তিতে, গ্রামাঞ্চলে কৃষকের কুটিরের সামনে তাঁদের ছড়িয়ে পড়তে হবে এবং ব্যাপক জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে। ব্যাপক নিরক্ষরতায় ভরা এই দেশে লিখিত সাহিত্যের চেয়ে অডিওভিস্যুয়াল বা দৃশ্য ও শ্রাব্য শিল্প মাধ্যমগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। লিখিত সাহিত্য তথা গল্প-কবিতা-উপন্যাসকে অবহেলা না ক'রেও আমাদের বেশী জোর দিতে হবে গান ও নাটকের ওপর। আমি নিজে দেখেছি—আমাদের রাজনৈতিক বক্তৃতার সময় যে লোক উঠে যাচ্ছে, সেই আবার নাটকের সময় ফিরে আসছে, শুধু নিজে নয়, সদলবলে। এছাড়াও গ্রামাঞ্চলে গণসংস্কৃতি প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের লোকায়ত সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলিকে অর্থাৎ folk cultural media-কে গ্রহণ করতে হবে। যাত্রা, তর্জা, পাঁচালী, কবিগান, গম্ভীরা, ঝুমুর, ছৌনাচ, টুসু-ভাদু প্রভৃতি লোকমাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করতে হবে বেশী বেশী ক'রে। তবেই প্রকৃত অর্থে গণসংস্কৃতি গড়ে উঠবে, গণসংস্কৃতির নামে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি নয়। অবশ্য মধ্যবিত্তের কাছে সাংস্কৃতিক প্রচারের প্রয়োজন নেই—একথা আমি বলছি না, তবে আমাদের বেশী জোর দিতে হবে কৃষক ও শ্রমিকের ওপর।

রাজনৈতিক দল বাস্তব অবস্থার প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন সময়ে তারা বিভিন্ন জোটও গড়ে তোলে, মূল শ্রেণীগত শত্রুদের সঙ্গেও কখনো কখনো কৌশলগত কারণে ঐক্যবদ্ধ হয়। আমরা কখনোই মনে করি না সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট রাজনৈতিক দলগুলির বিভিন্ন অবস্থানের লেজুড়বৃত্তি করবে। যেমন ধরুন—বাস্তব অবস্থার চাপে আমরা বামপন্থীরা আজ এই বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করছি ও বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যেই কোথাও কোথাও সরকারও চালাচ্ছি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট এই বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থার গুণগান করবে। বরং তার উচিত—এই

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের লোক ঠকানো মুখোশটিকে খুলে দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করা। এইটাই তার প্রকৃত শ্রেণীগত কর্তব্য। ধরুন, আজকে আমরা কৌশলগত কারণে ভি পি সিংয়ের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি। তার মানে এই নয় যে, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টকে ভি পি সিংয়ের মাহাত্ম্য-কীর্তন করতে হবে। রাজনৈতিক কৌশলের বা Tactics-এর চেয়েও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কাছে গুরুত্বপূর্ণ রণনীতি বা strategy। সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট রণনীতির প্রচারক, রণকৌশলের নয়। কেউ কেউ আছেন, যাঁরা শুধু নির্বাচনী সংগ্রামের মধ্যেই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টকে বেঁধে রাখতে চান, যেন ভোটের সময় তাঁদের পক্ষে নাটক করলেই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের দায়িত্ব শেষ। আমরা তা মনে করি না। নির্বাচন একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম, অবশ্যই আমরা সেখানে সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাহায্য চাই। কিন্তু সেটাই সব নয়। ভবিষ্যৎ বিপ্লবের অনিবার্যতার কথা ঘোষণা করাই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের মূল রাজনৈতিক কর্তব্য।

রাজনৈতিক আন্দোলন, সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ফ্রণ্ট

রথীন চক্রবর্তী

রাজনীতির সঙ্গে শিল্প-সংস্কৃতির, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সম্পর্ক কি বা কেমন হওয়া উচিত সে-ব্যাপারে সংকলনভুক্ত ইতিপূর্বের নিবন্ধগুলি যদি সুস্পষ্ট কোনো জায়গায় সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক কর্মীদের পৌছে দিতে পারে, তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, এদেশের পরিপ্রেক্ষিতে গত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের এক স্থায়ী সমস্যার অবসান ঘটেছে, কাটিয়ে ওঠা গেছে এক সুদীর্ঘ তাত্ত্বিক সঙ্কট। এবং এক মসৃন ভবিষ্যত এখন আমাদের অপেক্ষায়। কিন্তু আমরা জানি সমস্যার মধ্যে থেকেই উৎসারিত হয় সমাধান রেখা, এবং সেই সমাধান পদ্ধতি থেকেই দেখা দেয় নতুনতর দ্বন্দ্ব, নতুনতর বিরোধ। সমাধান রেখা যদি হয় তাত্ত্বিক চিন্তার সূত্র এবং তার প্রায়োগিক প্রকাশে যদি চিহ্নিত হয় সমাধান পদ্ধতি, তাহলে আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌছতে বোধহয় খুব একটা আপত্তি থাকতে পারে না যে, গণনাট্যের কাল থেকে আমরা যা বলেছি এবং যে-কাজ করে এসেছি তার মধ্যে যে-অসঙ্গতি ছিল, প্রায় পাঁচ দশক পরেও তার চেহারার কোনো পরিবর্তন হয় নি। কণ্ঠস্বর বা উপরিকাঠামোতে হয়ত কিছু প্রলেপ পড়তে পারে। কিন্তু সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গুরুত্ব আজও আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিকাঠামোয় উপযুক্তভাবে স্বীকৃত হয় নি। সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট

আজও সুনিবদ্ধ কোনো কর্মসূচীতে পৌঁছোতে পারেনি রাজনৈতিক শিবিরের একান্ত উদাসীনতার জন্যই। এবং তার থেকেও বড়ো কথা, রাজনৈতিক শিবির এখনও সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্বের হাত গুটিয়ে নিতে পারেনি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আঙিনা থেকে, গড়ে তুলতে পারেনি সেই সম্পর্ক যা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ব্যাপকতা উপহার দিতে পারে, তাকে বিপ্লবী আন্দোলনে পরিণত করতে পারে।

সংকলন-ভুক্ত নিবন্ধগুলিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নানান আলোচনার মধ্যে দিয়ে মোটামুটিভাবে যে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, তা হলো: (১) সাংস্কৃতিক জীবন রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, (২) রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কিত, (৩) রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অবশ্যই সুনির্দিষ্ট কিছু দায় থেকে যায়, এবং (৪) সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রাজনৈতিক অনুগামিতা শুধু প্রত্যাশিতই নয়, দায়বদ্ধতাও বটে। এই অনুসিদ্ধান্তগুলি নিয়ে বিতর্কের অবকাশ সম্ভবত খুবই কম। এবং তা দুটি কারণে। প্রথমত, বিশের দশক থেকেই এই প্রশ্নগুলি ক্রমশ আলোচনার বৃত্তকে দখল করতে থাকে, চল্লিশের দশকের মহামারী, মন্বন্তর এবং বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন এক হয়ে গিয়ে এই সব প্রশ্ন বা যুক্তির হাতকে অনেক শক্তিশালী করে দেয় এবং ষাটের দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি মানুষকে বাধ্য করে দেহ থেকে নামাবলী ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেদের গায়ের চামড়ার রঙকে দেখাতে। এবং দ্বিতীয়ত, দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক শিবিরও আজ এই অনুভব থেকে কোনোরকম দূরত্বই রক্ষা করতে পারছে না যে রাজনীতি-বিবর্জিত শিল্পসাহিত্যের ধোঁয়া তুলে বামপন্থী আক্রমণকে আর প্রতিহত করা সম্ভব নয়। বরং শিল্প-সাহিত্যকেই অন্যতম অস্ত্র করে নেওয়া যাক, রাজনৈতিক লক্ষ্য নয়, রাজনৈতিক মতলবকে সফল করার ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য।

সুতরাং, রাজনৈতিক আন্দোলনে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের ভূমিকা বা সম্পর্ক ইত্যাদি তাত্ত্বিক সূত্র নিয়ে বিরোধের অবস্থান নয়, বরং প্রতিস্পর্ধী সম্পর্ক রচিত হয়েছে এর প্রায়োগিক দিকটিকে নিয়ে। তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটেছে কতটা বিশ্বস্ততায় সেটাই মূল প্রশ্ন।

যেমন আমরা জানি, অন্ততঃপক্ষে আজ একথা খুবই পরিষ্কার যে, চল্লিশের গণনাট্য আন্দোলনে প্রথম যে-বিরোধ দেখা দিয়েছিল তার মূল কারণ হিসেবে

কখনই নবান্ন নাটকে ঘূর্ণায়মান মঞ্চব্যবহার করার জন্য শম্ভু মিত্রের একগুঁয়েমিকে দায়ী করা চলে না। বিভিন্ন প্রযোজনার পক্ষে ও বিপক্ষের মত নিয়ে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, যেমন ব্যালে স্কোয়াডের প্রযোজনা, সেখানেও শিল্পরুচি-অরুচির প্রশ্নটাই বিরোধের নির্ধারক শক্তি ছিল না। মূল কারণ ছিল এটাই, রাজনৈতিক শিবির যদি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তদারকির জন্য বা সাংস্কৃতিক ফ্রন্টকে পরিচালনার জন্য ওপর থেকে কাউকে চাপিয়ে দেয় তাহলে সাংস্কৃতিক বাহিনী তা মেনে নেবে কি-না। বিশেষ করে সেই ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ব্যক্তির যদি সংস্কৃতি-বোধের অভাব থেকে যায়। গণনাট্য সঙ্ঘে বিপর্যয় ঘটলো অনেকটাই এই কারণে যে সংগঠনের সমসত্ত্ব চরিত্র যথেষ্ট ছিল না, কিন্তু রাজনৈতিক শিবির নিজস্ব সংগঠনের বনিয়াদকে মানদণ্ড ধরে নিয়ে ওই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের ওপর এমন কিছু নির্দেশিকা আরোপ করতে চেয়েছিল যা সাংস্কৃতিক কর্মীদের পক্ষে শুধু আপত্তিকরই নয়, যথেষ্ট অবিবেচনাপ্রসূতও বলে মনে হয়েছিল। কারণ মনে রাখতে হবে, গণনাট্য সঙ্ঘ ভেঙে শুধু বহুরূপীই হয় নি ; উত্তরসারথী, অশনিচক্রেরও জন্ম হয় যার সঙ্গে গণনাট্য সঙ্ঘের স্থপতিদের এক বড়ো অংশও চলে যায়।

যেমন আমরা জানি, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বামপন্থী সাহিত্যিক হঠাতই বিতর্কের এক কেন্দ্রবিন্দুতে এসে দাঁড়ালেন পঞ্চাশের দশকে তাঁর কিছু রচনার জন্য, রাজনৈতিক শিবিরের মতে যা প্রগতিশীল সমাজবাদী আদর্শের অনুসারী হয়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বামপন্থী মহলে প্রায়-নিষিদ্ধ হলেন। সুযোগ নিল দক্ষিণপন্থীরা। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার ভিন্নতর বিশ্লেষণ শুরু হলো। এটাও একটা ভাঙন। মাণিক থামেন নি, সাধারণ মানুষ থেকে দূরেও সরেননি। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষতা যথেষ্ট শিথিল হয়েছিল। একথা মানতেই হবে। এরকম দৃষ্টান্ত খোঁজ করলে অনেকই পাওয়া যাবে। এবং স্বীকার করতেই হবে যে অতি পরিচিত বহু শিল্পী ও সাহিত্যিকের প্রাথমিক অবস্থান থেকে বিচ্যুতির দায়িত্ব বামপন্থী রাজনৈতিক শিবির কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারে না।

অন্যদিকে, আমরা জানি, শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে রাজনৈতিক মহলের সম্পর্কের প্রশ্নে লেনিনের সঙ্গে ম্যাকিসম গোর্কির বিরোধ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিয়ে ঢাকা দেওয়া যায়নি। লেনিন মেনে নিয়েছিলেন গোর্কির যুক্তি, এবং গোর্কিও অনুভব করেছিলেন লেনিনের কথার গুরুত্ব। সোভিয়েত লেখক সমিতিও অন্য চেহারা নেয়। এবং এটাও

ঠিক, মায়কোভস্কির কবিতাকে লেনিন সবসময় মেনে নিতে পারেননি, বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্যেই তিনি শিল্প-সৌকর্যের প্রশ্নে বক্তব্য রেখেছেন পুশকিনের পক্ষে। এবং তা শুধু এই কারণেই নয় যে জনসাধারণকে নিজের রাজনৈতিক মতের পক্ষে রাখার জন্য তাদের প্রিয়তম শিল্পী বা সাহিত্যিকের পক্ষে সাফাই গাওয়া দরকার। এবং কারণটা বোধহয় এটাই ছিল যে লেনিন জানতেন, রাজনৈতিক শিবিরের পদতলে শিল্পী-সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের নির্বোধ আত্ম-সমর্পণ কখনই প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনকে সাহায্য করতে পারেনা, বরং ক্ষতিই করবে।

এবং আমরা আরও জানি, যখন তলস্তইয়ের 'পাওয়ার অব ডার্কনেস' নিয়ে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে সমালোচনার ছড়াছড়ি; তলস্তইয়ের ওই রচনা অভিনীত হতে চলেছে এবং তার ফলে দেশের ভয়াবহ ক্ষতি হবে, এই যুক্তিতে লেনিন এবং অপরাপর কমিউনিস্ট নেতাদের কানভারী করার চেষ্টা চলছে তখন লেনিন নিজেই ওই প্রযোজনা দেখার সিদ্ধান্ত নেন। অভিনয় শেষে ওই নাটক নিষিদ্ধ ঘোষণার প্রত্যাশায় যখন অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা অধীর, তখন লেনিন এক ঐতিহাসিক আঘাত হানেন সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের প্রতি রাজনৈতিক শিবিরের চিরকালীন এক উদাসীনতা এবং কর্তব্যকে লক্ষ্য করে। লেনিন বলেন, আজ মনে হচ্ছে নবজাত সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পূর্ণ নিরাপদ। পৃথিবীতে কোনো শক্তিই নেই যে তার ক্ষতি করতে পারে। কারণ তলস্তইয়ের মতো মানুষ আজ আমাদের সঙ্গে আছেন।

আর একথা উল্লেখ করাও বোধহয় খুব একটা অসঙ্গত হবে না যে হিটলারের শাসনকালে নাৎজী বাহিনীর আক্রমণে যখন জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি পর্যুদস্ত, অধিকাংশ কমিউনিস্ট নেতাই দেশ ছেড়ে পলাতক তখন পৌরাণিক এবং হাস্য-রসের নাটক দিয়ে নাট্যশালাকে জমিয়ে রেখে সরাসরি জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিল সাংস্কৃতিক কর্মীরাই, রাজনৈতিক ফ্রণ্ট নয়। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, এক একটি নাট্যশালা পরিণত হয়েছিল রাজনৈতিক সংগঠনের এক একটি ইউনিটে।

এই দৃষ্টান্তগুলির উল্লেখ সম্ভবত একেবারে অসঙ্গতিময় নয়, অন্তুতপক্ষে এই যুক্তিতে যে একই সঙ্গে বিরুদ্ধ দুই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সন্নিবেশ-চিত্র আমাদের কাছে উঠে আসছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গর্ভ থেকে—এই ইতিহাসগত নজির একাধিক রূপে আমাদের স্মরণে উঁকি দিয়ে গেলেও, মাঝে মধ্যেই আমরা এই সত্য বিস্মৃত হই

যে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের একটা নিজস্ব শাসন অধিকার আছে, নিজস্ব বোধবুদ্ধিও আছে, সর্বোপরি সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের মোটামুটি পরিদৃশ্যমান সংগঠিত চরিত্র গড়ে ওঠে অবশ্যই সুনিবদ্ধ এক রাজনৈতিক উপলব্ধি ও রাজনৈতিক অবতরণের মধ্যে দিয়েই।

আর সেই কারণেই, এই বিস্মৃতির সূত্র ধরে ক্রমশ বেরিয়ে আসে রাজনৈতিক শিবিরের স্পর্ধিত তর্জনী, নির্দেশনামা, কখনও বা নির্বাচন ইত্যাদির প্রচারের জন্য শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতি ডাক। সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট কিছুটা নড়ে-চড়ে বসে, নাটক অভিনীত হয়, কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হয় সঙ্গীত, নির্বাচন-অন্তে বিস্তীর্ণ আঙিনা জুড়ে নামে নৈঃশব্দের ছায়া। ঘটনাটা যেন এই, রাজনৈতিক শিবির বা রাজনৈতিক আন্দোলনের কাছে যে-টুকু দায়বদ্ধতা ছিল সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের তা শেষ। এবার অপেক্ষা পরবর্তী ডাকের জন্য। ভাড়াটিয়া ঢাকীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্যই যেন আর টানা যায় না। এবং এজন্য রাজনৈতিক শিবির থেকে কোনোরকম অনুতাপের সুরও আমরা উঠতে দেখিনা। যদি দেখতাম তাহলে অবশ্যই স্বাধীনতা-উত্তর কালে গণনাট্য আন্দোলন এক সম্পূর্ণ অন্য চেহারা নিত, গণনাট্য আন্দোলন কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না এবং চল্লিশের দশকের গণনাট্য আন্দোলন যেমন জন্ম দিয়েছিল বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের তেমনি আরও কিছু ব্যক্তিত্বের আলোকে আমরা উদ্ভাসিত হতে পারতাম। সর্বোপরি একটি সংগঠিত সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট গড়ে তোলা যেতে পারত যা আজ বিস্তীর্ণ ভারতভূমির কোথাও নেই। অর্থাৎ সহজ কথায়, গত পঞ্চাশ বছর আমাদের কোনো শিক্ষাই দিতে পারেনি। সমাধান সূত্রের উল্লেখ আমরা কয়েক লক্ষ বার করেছি, কিন্তু সমাধান পদ্ধতিতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই তা হারিয়ে গেছে। একথা সত্যি, সামন্ততন্ত্র এদেশ থেকে পুরোপুরি হারিয়ে যায় নি।

জ্যোতি বসু বা বি টি রণদিভে যখন শিল্পী সাহিত্যিকদের কর্তব্য বা মার্ক্সবাদী-বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিয়ে বলার সময় সঙ্গতভাবেই পরিস্থিতিগত তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করেন, তখন, সমমুহূর্তেই তা যুক্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে চিত্ত বসু বা অশোক ঘোষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের দায়িত্বের উচ্চারণে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সম্ভবত একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। বারবার বোধ হয় আমরা শুধু একথাই বলছি যে রাজনৈতিক ফ্রন্টের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে হবে, কারণ এমন অনেক সময় আসে যখন রাজনৈতিক ফ্রন্টকে মানুষের কাছে সুকৌশলে পৌঁছে দেয় সাংস্কৃতিক ফ্রন্টই। বারবার বোধ হয় আমরা

একথাই বলছি যে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের বিপুল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা রয়েছে এবং এই তত্ত্বকে মহীয়ান করছি এই বলে যে ইতিহাসে দেখা গেছে অনেক সাংস্কৃতিক আন্দোলনই বপন করেছে রাজনৈতিক আন্দোলনের বীজ এবং একাদিক্রমে শতাব্দী ধরে আমরা বারবার সাংস্কৃতিক কর্মীদের মনে করিয়ে দিয়েছি তাদের কর্তব্যের কথা। কিন্তু আমরা কখনই উচ্চারণ করি নি যে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের প্রতি রাজনৈতিক ফ্রন্টেরও কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্য থেকে যায়। আমরা কখনই বলিনি যে, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টই যে বারবার রাজনৈতিক ফ্রন্টের অনুগামী হবে তা নয়, রাজনৈতিক ফ্রন্টকেও অনুসারী হতে হবে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের। সমাধান সূত্র এবং সমাধান পদ্ধতির মধ্যে ফারাক ছিল বা আছে এখানেই যে, আমরা কখনই কোনোবারের জন্যই ভাবিনি যে দুই ফ্রন্টের মধ্যে সম্পর্ক হওয়া উচিত সহযোদ্ধার, নেতা এবং কর্মীর নয়। রাজনৈতিক ফ্রন্ট কোনো কোনো কঠিন মুহূর্তে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টকে নিশ্চয়ই সহায়িকা-বার্তা পাঠাতে পারে, এমনকি নির্দেশও, কিন্তু তাকে সুগ্রথিত করে উপযুক্তভাবে কার্যকর করার দায়িত্ব একান্তভাবেই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের। দৈনন্দিনের তদারকি রাজনৈতিক ফ্রন্টের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে কিভাবে রাজনৈতিক ফ্রন্টকে শক্তিশালী করবে তা নিশ্চয়ই একাধিকবার আলোচনাযোগ্য, কিন্তু রাজনৈতিক ফ্রন্ট কিভাবে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টকে সাহায্য করবে বা সাহায্য করতে পারে তাও লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার। তা না হলে সমাধান সূত্রের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব নয়।

যেমন, উল্লেখ করা যেতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, দক্ষিণপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে নির্বাচনী লড়াইয়ে সাংস্কৃতিক কর্মীরা বামপন্থী রাজনৈতিক মহলের ঘনিষ্ঠ হয়েছে। নির্বাচনে তাঁরা নাটক করেছেন, গান গেয়েছেন, নির্বাচনী লড়াইয়ের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। নির্বাচন হয়ে যাবার পর তাঁরা ফিরে এসেছেন নিজস্ব কুঠুরিতে, কলকাতার নির্বাচিত প্রেক্ষাগৃহে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠান হলো যে বাম-রাজনৈতিক শক্তি তাদের সঙ্গে কিছু মৌখিক এবং স্বার্থভিত্তিক অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো যোগাযোগই রইল না। রাজনৈতিক শিবিরের আপাতত ভ্রূক্ষেপ নেই। আবার দেখা গেছে, সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট যখন নাটকের ওপর কর প্রত্যাহার বা নাটকের ওপর পুলিসি জুলুমের প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছে, রক্তাক্ত হয়েছে রাজপথ, রাজনৈতিক শিবির বিবৃতিতে তখন মুখর হয়েছে, মিছিলও করেছে কিছু, কিন্তু সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ওই বীজ থেকে কোনো রাজনৈতিক

মহীরুহকে টেনে আনার চেষ্টা করেনি। অথচ সেই মুহূর্তে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের প্রতি রাজনৈতিক ফ্রন্টের পরিপোষণার প্রয়োজন ছিল সব থেকে বেশি। ফলে একটা জায়গায় গিয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হয়, হাত বাড়িয়েও সে রাজনৈতিক শিবিরের সাহায্যের সন্ধান পায় না। সমাধান পদ্ধতির অপপ্রয়োগ ব্যর্থতায় পৌঁছে দেয় সামাজিক প্রবাহকে।

অর্থাৎ বিভ্রান্তি বোধ হয় বারবার একটা জায়গাতেই আবর্তিত হচ্ছে। সম্পূর্ণ এক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আশ্রয় যদি আমরা নিই তাহলে রেখাচিত্রটি সম্ভবত এই ভাবেই ফুটে উঠতে পারে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের উপাদান যেহেতু জনগণ, এবং তা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যথেষ্টই অসমসত্ত্ব এবং মূলত ইস্যুভিত্তিক তাই তার উন্মেষ, সংগঠন, জাগরণ এবং বিস্ফোরণ এই পর্যায়গুলি একটি নিয়মের অন্তর্ভুক্ত এবং সর্বোচ্চ সীমাও নির্ধারিত, পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই। একটি নির্দিষ্ট কারণে সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলন অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতে পারে না। আন্দোলনের যে মূল উৎস, জনরোষ বা গণ-প্রতিবাদ, তা সরে যায় এক বৃত্ত থেকে আরেক বৃত্তে। কৃষক আন্দোলন থেকে শ্রমিক বিক্ষোভে, আবার তারই সংলগ্নতায় ছাত্র-বিক্ষোভ। এবং এই প্রতিসরণে কাজ করে রাজনৈতিক শিবির। রাজনৈতিক আন্দোলন তাই কখনও কখনও থামে, আবার গড়ে ওঠে, এবং এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে একটি বিপ্লবী আন্দোলনে রূপান্তরিত হওয়ার কাল পর্যন্ত। কিন্তু সাংস্কৃতিক আন্দোলন থামে না। কারণ তার উপাদান মূলত সমসত্ত্ব এবং উৎস নিছকই ইস্যু-ভিত্তিক নয়। এক ব্যাপক বিপ্লব-সম্ভাবনার স্বপ্নে সে প্রতিনিয়তই বার্তা বহন করে চলে এবং তা শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সকলের কাছেই একই ভাষায় পৌঁছে যায়। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এই যতিহীন প্রবহমানতা যদি রাজনৈতিক ফ্রন্ট ও রাজনৈতিক আন্দোলনের অনুবন্ধে পড়ে, গতি মন্থর হয় তবে বুঝতে হবে তখনই সৃষ্টি হচ্ছে এমন এক সঙ্কট যা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে তুলে দেবে অফুরন্ত সুযোগ। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এই প্রবহমানতা একই সঙ্গে সৃষ্টি ও নান্দনিক অনুভবের সঙ্গে এমন ভাবে যুক্ত যে রাজনৈতিক ফ্রন্টের ছক-হীন অনুশাসন তাকে শক্তিহীন করে তুলতে পারে, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের মধ্যেই গড়ে তুলতে পারে বিরুদ্ধ-তত্ত্ব বা অ্যান্টি-থিসিস।

বিষয়টাকে আরও কিছুটা স্পষ্ট করা যেতে পারে। সমাজতত্ত্বের ভাষায় সোস্যাল-ইনটারঅ্যাকশন যাকে বলা হয়, তা একটি ধ্রুব। কিন্তু বিভিন্ন ক্যাটালিস্ট বা অনুঘটককের মাধ্যমে সোস্যাল-ইনটারঅ্যাকশনের সঙ্গে রাজনৈতিক চিন্তা বা ইচ্ছার যখনই সংযোগ ঘটে তখনই গড়ে ওঠে পলিটিক্যাল মুভমেণ্ট। অনুঘটক

হিসেবে বিভিন্ন ঘটনা, যা কাজ করে থাকে, তা চূড়ান্ত বিচারে উপলক্ষ্যমাত্র। যেমন খাদ্যের দাবি বা পুলিসের গুলিচালনা ইত্যাদি অনুঘটকগুলি শেষপর্যন্ত নিজস্বতা হারিয়ে ফেলে। রাজনৈতিক আন্দোলন ধাবিত হয় মূলত সরকারের পদত্যাগের দাবিতে। পলিটিক্যাল মুভমেণ্টের সঙ্গে সোস্যাল-ইনটারঅ্যাকশনের পার্থক্য তাই যথেষ্ট স্পষ্ট। পলিটিক্যাল মুভমেণ্ট যদি হয় আগুন, সোস্যাল ইনটারঅ্যাকশন সুপ্ত বারুদ। পলিটিক্যাল মুভমেণ্ট কাল-নির্ভর। সোস্যাল-ইনটারঅ্যাকশন ক্রম-প্রবহমান। তার জন্ম নেই, লয়ও নেই। নিদ্রা বা জাগরণ কোনো কিছু দিয়েই তার চরিত্রকে নির্দিষ্ট করা যায় না।

এই সোস্যাল-ইনটারঅ্যাকশনের একটা বড়ো অংশই সংস্কৃতি-নির্ভর। কারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের যে বীজ থেকে গঠিত হয় সমাজ তা মূলত ইতিবাচক এক ভঙ্গী এবং অবশ্যই সুরুচি-প্রাণ। এই ভঙ্গী থেকেই উৎসারিত হয় যে-ব্যবহারিক ও আচারগত কার্যক্রম তা সংস্কৃতিরই পুষ্পদল। প্রথমে সহযোগ, তারপর সহযোগিতা এবং তারপর সহযুদ্ধ—এই গঠন থেকেই সংস্কৃতি যখন উঠে এল তখন দৈনন্দিনের কাজ, দৈনন্দিনের লড়াইয়ের সঙ্গে তার আর কোনো পার্থক্যই থাকল না। এইভাবেই জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি একীভূত হয়ে পড়ে এবং সোস্যাল-ইনটারঅ্যাকশনের আড়ালে প্রবাহিত হয় এক কনস্ট্যাণ্ট কালচারাল অ্যাকশন বা ধ্রুব সাংস্কৃতিক আন্তঃক্রিয়া। রাজনৈতিক উত্থান-পতন ব্যতিরেকেই তার নিরন্তর যাত্রা। অন্য পরিধিতে বিভিন্ন সূত্রতায় সারি দিয়ে রাখা আছে যে-মশাল তা এখান থেকেই, এই বারুদের স্তূপ থেকেই তুলে নিতে পারে প্রয়োজনীয় স্ফুলিঙ্গ, নিজেকে বিদ্রোহ ও বিক্ষোভে পরিণত করার জন্য।

গণনাট্য আন্দোলনের মাধ্যমে এই চিরন্তন প্রবহমানতাকেই তৎকালীন রাজনৈতিক শিবির এক প্রতিবাদী সংগ্রামের রূপ দিয়েছিল। মাতৃভাষা পাই-হুয়া'র স্বীকৃতির দাবিকে সামনে রেখেএই সাংস্কৃতিক প্রবহমানতাকে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের রূপ দিয়েছিল চীনের সেই সময়ের বামপন্থী রাজনৈতিক শিবির। বাংলাদেশেও সেই ঘটনা ঘটেছে, যদিও দক্ষিণপন্থীদের নেতৃত্বে, কিন্তু চীনের শিক্ষাকে মূলধন করেই। এবং কিছু আগেই এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ট্রান দিনই ভন-এর লেখা থেকেই আমরা জানতে পেরেছি কিভাবে এই সাংস্কৃতিক ধারাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রণক্ষেত্রে, প্রতিটি ট্রেঞ্চে, যেখানে কার্যত একটি রাইফেল এবং একটি সঙ্গীত, একটি নাটক এবং একটি যুদ্ধবিজয় কাহিনীর মধ্যে কোনো পার্থক্যই আর থাকে না। এবং এখান থেকে এইরকম একটি ধারণাতে পৌঁছে যাওয়াও বোধ হয় খুব একটা বিভ্রান্তিকর হবে না যে, যে

মুহূর্তে ওই সাংস্কৃতিক প্রবহমানতার সঙ্গে রাজনৈতিক ইপ্সার মতান্তর, মনান্তর বা এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছিল, ঠিক তখন থেকেই গণনাট্য আন্দোলনের ভাঙনও দীর্ঘ ছায়া ফেলে রাজনৈতিক শিবিরের ওপর। ছেচল্লিশ থেকে প্রায় পঞ্চাশ পর্যন্ত এদেশের বামপন্থী আন্দোলনে যে-সঙ্কট দেখা দেয় সেটা শুধু মাত্রই তাত্ত্বিক কারণে এধারণা করা ভুল। রাজনৈতিক সঙ্কটের মূল কারণ বিচ্ছিন্নতা। সে-বিচ্ছিন্নতা মানুষের সঙ্গে, তত্ত্বের সঙ্গে, প্রয়োগের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে হতে পারে। এমন কি সংস্কৃতির সঙ্গেও।

সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলন, সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট—এই আলোচনার পেছনে যখন দাঁড়িয়ে থাকে শতাব্দির বহু বিতর্ক, তখন বোধহয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অমোদের একটু সংযমী হওয়া দরকার। দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে একটু একটু করে বোঝা দরকার যে উপযুক্ত রাজনৈতিক শিবিরের পরিপোষণ ছাড়া সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট যেমন বেঁচে থাকতে পারে না, তেমনি সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সাহচর্য ছাড়া রাজনৈতিক ফ্রন্টেরও বেশিদূর যাওয়া সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক বা বিপ্লবী আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের (শুধু মার্কসবাদী নয়, উদার ও বুর্জোয়া-গণতন্ত্র প্রিয়দের ক্ষেত্রেও) ভূমিকা কতখানি বা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কালে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টই একমাত্র বাঁচিয়ে রাখতে পারে যে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্রমসূত্রকে।

অতএব, সম্পর্ক হোক সহযোদ্ধার। রাজনৈতিক আন্দোলনের স্বার্থেই বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গতিশীলতাকে। এবং সাংস্কৃতিক ফ্রন্টেরও প্রয়োজন দু-কদম এগিয়ে এসে সেই স্রোতকে তুলে নেবার যেখানে রাজনৈতিক ফ্রন্ট হঠাতই কোনো কারণে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রাজনৈতিক মহল থেকে নির্দেশ আসুক, কিন্তু কখনই হুকুম নয়। আর সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট থেকে উঠুক প্রস্তাব, কিন্তু কখনই তা যেন অনুকম্পা ভিক্ষা না করে।

প্রাসঙ্গিক টীকা ইত্যাদি

এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধগুলি সংগৃহীত হয়েছে নানাভাবে, নানা জায়গা থেকে। যেমন :

হাইনরিখ হাইনের 'লুটেশিয়ার মুখবন্ধ' নিবন্ধটি সংগৃহীত হয়েছে পরিচয় পত্রিকা থেকে। এটি অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্র মজুমদার। পরিচয় পত্রিকা থেকেই সংগৃহীত হয়েছে আরও দুটি রচনা : সিদ্ধেশ্বর সেনের 'শিল্পীর স্বাধীনতা ও দায়' এবং নারায়ণ চৌধুরীর 'লেখকের শ্রেণীবিচার'। নিবন্ধ তিনটি সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অনুমতি দেবার জন্য অমিতাভ দাশগুপ্তর কাছে কৃতজ্ঞ।

ভি আই লেনিনের 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য' নেওয়া হয়েছে সোভিয়েত সমীক্ষার একটি সংখ্যা থেকে। তাঁরাও অনুমতি দিয়ে সাহায্য করেছেন।

মাও ৎসে-তুং-এর 'রাজনৈতিক আন্দোলন ও শিল্প সাহিত্য' বস্তুতপক্ষে ইয়েনান বক্তৃতার একটি অংশ। নবজাতক প্রকাশন যে-মাও রচনাবলী প্রকাশ করেন বাংলায় সেখান থেকেই এটি উদ্ধৃত।

প্রায় বছর কুড়ি আগে, ৬৮-৬৯ সাল নাগাদ নন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আরউইন সিলবারের 'অবক্ষয়ী সংস্কৃতি ও বিপ্লবী শিল্পকলা'এবং ট্রান দিন্‌হ ভন-এর 'বিপ্লব ও সাংস্কৃতিক জীবন'। এছাড়া নন্দন পত্রিকা থেকেই সংগৃহীত হয়েছে সরোজ মুখোপাধ্যায়ের 'শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি', বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর 'পুঁজিবাদী সমাজের সাংস্কৃতিক ভাবনা,' নৃপেন চক্রবর্তীর 'প্রগতিশীল লেখকের দায়িত্ব' জ্যোতি বসুর 'বর্তমান পরিস্থিতি ও শিল্পী সাহিত্যিকদের কর্তব্য' প্রমোদ দাশগুপ্তের 'শিল্প-সাহিত্যের জগতে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম' এবং বি টি রণদিভের 'মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা'। নিবন্ধগুলি সংকলিত করার ব্যাপারে অনুমতি দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য নন্দন কর্তৃপক্ষকে এবং অনুনয় চট্টোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানাই।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার একটি রাজ্য সম্মেলন স্মারক পুস্তিকায় প্রকাশিত হয় ই. এম. এস নাম্বুদিরিপাদ-এর মার্ক্সবাদ ও সাহিত্য এবং মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল-এর জনগণতন্ত্রের সংস্কৃতি। শান্তিময় গুহের অনুমতি না পেলে এ দুটি রচনা এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা যেত না। কৃতজ্ঞতা তাঁর কাছেও।

চিত্ত বসু, নির্মল বসু ও অশোক ঘোষ-এর নিবন্ধ তিনটি প্রকাশিত হয়েছিল লোকমত শারদীয় সংখ্যায়। এখানে তা পুনর্গৃহীত।